# KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : মীর্জা এহসান |
| Title চতুরঙ্গ | Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৫৫/১<br>৫৫/2<br>৫৫/৩<br>৫৫/৪ | Year of Publication : শ্রাবণ ১৪০১<br>কার্তিক ১৪০১<br>মাঘ ১৪০১<br>বৈশাখ ১৪০2 |
| | Condition : Brittle : Good |
| Editor : আব্দুর রউফ | Remarks : |

| |
|---|
| I.D. Roll No. KLMLGK |

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০২

সম্প্রতি কোপেনহাগেনে অনুষ্ঠিত সমাজ-শীর্ষ সম্মেলন প্রসঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার হালচাল এবং উন্নয়নের মাপকাঠি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা — 'দূরের ডায়েরি' — লিখেছেন অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য।

বাজারসর্বস্ব অর্থনীতি এবং সামাজিক ন্যায়— এই দুই ধারণার মিথস্ক্রিয়া নিয়ে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রাঞ্জল বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ — 'বাজার স্বর্গ, বাজার ধর্ম, বাজারই... ?'।

ঐতিহাসিক বিনয় চৌধুরীর গবেষণামূলক আলোচনার দ্বিতীয় কিস্তি— 'ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক'।

বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্রমবিবর্তন এবং ফজলুল হক থেকে জ্যোতি বসু — বঙ্গরাজনীতির পটপরিবর্তন প্রসঙ্গে দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যথাক্রমে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ড. অতীন্দ্রমোহন গুণ।

উত্তর রবীন্দ্রপর্বের দশজন কবি প্রসঙ্গে একটি গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

সম্প্রতি প্রয়াত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যুবোধ নিয়ে ড. সুমিতা চক্রবর্তীর আলোচনা।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান মানস নিয়ে আলোচনা।

সাহিত্যিক কিন্নর রায়ের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি বিশ্লেষণ।

বাংলার কারিগরি শিল্পের অবক্ষয়ের একটি অধ্যায় নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষাসমৃদ্ধ প্রতিবেদন।

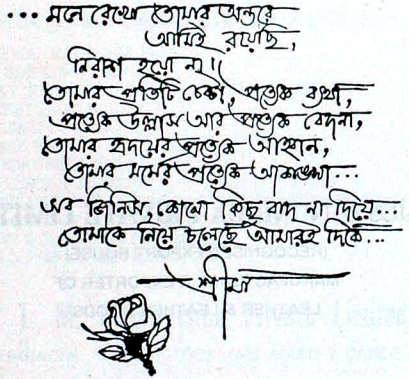


বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ৪
জ্যৈষ্ঠ ১৪০২

সমাজ-শীর্ষ সম্মেলন : দূরের ডায়েরি সৌরীন ভট্টাচার্য ২৩৭
বাজার স্বর্গ, বাজার ধর্ম, বাজারই...? দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ২৫৪
ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিনয় চৌধুরী ২৬৫

## কবিতা

ঘাস রঙের আলো আলোক সরকার ২৪৬
একলা উজানে বাসুদেব দেব ২৪৭
তিনটি কবিতা সৈয়দ সমিদুল আলম ২৪৮
বজ্রচমক ঈশিতা ভাদুড়ী ২৪৯
আগরতলার ছবি দেবী রায় ২৫০
ক্ষুধিত পাষাণ বিপ্লব মাজী ২৫১
পদক্ষেপ চিরপ্রশান্ত বাগদী ২৫২
শুকনো পাতা শুভংকর পাত্র ২৫৩

## গল্প

অপহরণ রামকুমার মুখোপাধ্যায় ২৬০

## গ্রন্থ সমালোচনা

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৪ অতীন্দ্রমোহন গুণ ২৮০ পুলক নারায়ণ ধর ২৮৪ শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮৫ আনন্দ ঘোষ হাজরা ২৮৭ হাসির মল্লিক ২৮৮ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ২৯০

## সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানমানস প্রসঙ্গে একটি আলোচনা তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৩
সাহিত্যিক কিন্নর রায়ের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা মেঘ মুখোপাধ্যায় ২৯৯
বাংলার কারিগরি শিল্পের অবক্ষয়ের একটি অধ্যায় : দুটি গ্রামের কারিগরদের কথা অচিন্ত্য কুমার দত্ত ৩০৩

## স্মরণে

কেন ছেড়ে যাবে ? সুমিতা চক্রবর্তী ৩১১
এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা কেউ নও ৩১৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্ত প্রেস, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত

অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩
শিল্প পরিকল্পনা রণেন আয়ন দত্ত

দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

## SAHITYA AKADEMI'S CHILDREN'S LITERATURE

**The Cosmic Explosion** (English)
by Jayant V. Narlikar
tr. Sujata Godbole — Rs. 30

**The Forest Nymph** (English)
by 'Kalvi' Gopalakrishnan
tr. Indira Ananthakrishnan — Rs. 25

**Antariksh Mein Visphot** (Hindi)
by Jayant V. Narlikar
tr. Surekha Panandikar — Rs. 30

**Bulbul Ki Kitab** (Hindi)
by Upendrakishore Roychoudhury
tr. Swapna Dutta — Rs. 35

**Jungle Tapu** (Hindi)
by Jashir Bhullar
tr. Shanta Grover — Rs. 40

**Gotya** (Hindi)
by N.D. Tamhankar
tr. Surekha Panindikar — Rs. 25

**Billi Houseboat Par** (Hindi)
by Anita Desai
tr. Vimala Mohan — Rs. 25

**Suno Kahani** (Hindi)
by Vishnu Prabhakar — Rs. 25

**Bachchon ne Dabocha Chor** (Hindi)
by Gangadhar Gadgil
tr. H.S.Sane — Rs. 25

**Moron wala Bagh** (Hindi)
by Anita Desai
tr. Vimala Mohan — Rs. 30

**Acharaja Graha Ki Dantakatha** (Hindi)
by Tajima Shinji
tr. Harish Narang — Rs. 40

**Suno Kahani** (Urdu)
by Vishnu Prabhakar
tr. Tarunnam Riyaz — Rs. 20

**Houseboat par Billi** (Urdu)
by Anita Desai
tr. Tarannum Riaz — Rs. 20

**Antarikshe Bisforan** (Bengali)
by Jayanta Vishnu Narlikar
tr. Manabendra Bandyopadhyay — Rs. 35

SAHITYA AKADEMI

Rabindra Bhavan
35 Ferozeshah Road
New Delhi 110001

Jeevan Tara Bhavan
23A/44X, D.H.Road
Calcutta 700053
Phone: 478-1806


# সমাজ-শীর্ষ সম্মেলন : দূরের ডায়েরি

সৌরীন ভট্টাচার্য

আজ ৭ মার্চ ১৯৯৫। গতকাল শুরু হয়েছে সামাজিক সমস্যা নিয়ে এক শীর্ষ সম্মেলন। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন শহরে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বুত্রোস বুত্রোস ঘালি। হান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান আন্‌ডেরসেন ও নীল্‌স্ বোর-এর এই শহরে পৌঁছে তিনি সানন্দে ঘোষণা করেছেন যে এই সম্মেলন থেকেই দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করা যাবে। এবং এ ব্যাপারে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রনেতারা যে অনেকদূর পর্যন্ত সফল হবেন সে বিষয়েও মহাসচিব প্রায় নিশ্চিত। পুরো এক সপ্তাহ ধরে চলবে এই সম্মেলন। মোট ১৮৪টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন আলোচনায়। সংখ্যাটা নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। ১৮৬ টি দেশের কথাও বলা হয়েছে। দুটো একটা দেশ বেশি কি কম তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। পৃথিবীর প্রধান সব দেশই যে কোপেনহাগেনে এসে মিলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভারত বাংলাদেশ শ্রীলংকার রাষ্ট্রপ্রধানেরা স্বয়ং উপস্থিত থাকছেন। এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও সম্ভবত ১০ মার্চ কোপেনহাগেনে পৌঁছবেন। প্রতিনিধিদলের অন্যেরা আগেই সেখানে হাজির। নরসিংহ রাও নিজেই শিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন। পৃথিবীর ৯টি দরিদ্রতম দেশে সার্বিক শিক্ষাবিস্তারের প্রসঙ্গ সেখানে আলোচিত হবে। 'সকলের জন্য শিক্ষা' এই কর্মসূচির সাংকেতিক নামকরণ করা হয়েছে E F A (Education for all)।

শীর্ষ সম্মেলন ব্যাপারটা তো এমন কিছু নতুন নয়। এ আমাদের প্রায় গা সওয়া। কত রকমের সমস্যা ও সংকট নিয়েই তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হন। তার বিরাট আয়োজন, তার সমারোহ, তার আমোদপ্রমোদ ও ব্যয়বহুল বিলাসিতার কত কথাই তো আমরা খবরের কাগজে পড়ে থাকি। আর আমরা যারা দূরের মানুষ তা ছাড়া তাদের আর উপায় কী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যা বা সংকটের যা চেহারা তাতে কিন্তু আমাদের সবারই মাথাব্যথার কারণ থাকে। কিন্তু এই সব সম্মেলন তো শীর্ষ সম্মেলন, শীর্ষস্থানীয়দের জন্য, শীর্ষেতর মানুষদের সেখানে ঠাঁই হবার কথা নয়, হয়ও না। শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়পরিধিও বড় বিচিত্র। পারমাণবিক অস্ত্রসংবরণ, অর্থনৈতিক লড়াইয়ের অবসান, আঞ্চলিক যুদ্ধের শান্তিসম্ভাবনা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রীতিনীতি নির্ধারণ ইত্যাদি জরুরি সাময়িক সব সমস্যা নিয়ে সম্মেলনের রেওয়াজ তো চালু আছেই। গত কয়েক বছরে নতুন আর এক ধরনের শীর্ষ সম্মেলনের রেওয়াজ গড়ে উঠছে। এই সব নতুন ধরনের সম্মেলনের আলোচ্য সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই সংকটের চেহারায় পৌঁছে গেছে, তবে তাদের ব্যাপ্তি অনেক সুদূরপ্রসারী, মোটেই সাময়িক নয়। সে সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে তাও যেমন দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে প্রসারিত হয়েছে, তেমনই এই সব সমস্যার যা ক্ষয়ক্ষতি তারও দায় বহন করতে হবে অনেক দিন ধরে, অনেক প্রজন্মকে। তাই এসব সংকট মোটেই সাময়িক নয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে এরকম দুটো খুব উল্লেখযোগ্য শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেছে। একটা ওজোন-সম্মেলন, আর একটা বসুন্ধরা সম্মেলন। এ দুটোই পরিবেশ সংক্রান্ত। পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে ওজোনস্তরে বিপজ্জনক মাত্রার ছিদ্র দেখা দেবার ফলে এই গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বই বিপন্ন। এই সংকট তো সবার, তাই পৃথিবীর নানা দেশের মিলিত চেষ্টায় এর সমাধান উদ্ভাবনের জন্য ঐ ওজোন সম্মেলন। সমাধান সূত্র অবশ্য কতটা কী উদ্ভাবিত হতে পেরেছে সে অন্য প্রসঙ্গ। ব্রাজিলের রিও দে জেনেরিয়োতে যে বসুন্ধরা-সম্মেলন হয়ে গেল তার আলোচনার পরিধি ছিল আরও বিস্তৃত। মানুষ ও তার পরিবেশের ভারসাম্যের সমস্যা অনেক ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। এখানেও সাধু সংকল্পের ঘোষণার বেশি কতদূর এগোতে পারা গেছে সে প্রশ্ন আছেই। সমাধানের দিকে খুব বেশি এগোতে না পারলেও এ ধরনের আলাপ আলোচনার একটা তাৎপর্য থাকেই। সমস্যাগুলোর দিকে নজর পড়ে। মানুষ কতগুলো কথা ভাবতে শুরু করে। আজ যে গাছ কাটার ব্যাপারটা আগের মতো আর

হুড়মুড় করে সেরে ফেলা যায় না, দুবার ভাবতে হয়, প্রতিবাদ প্রতিরোধ সামলাতে হয় এর মধ্যে কিন্তু একটা পরিবর্তনের আভাস স্বীকৃতি ধরা পড়ে। একথা বলার কোনও মানে নেই যে সম্মেলন করে আর শীর্ষ আলোচনার সংকল্প ঘোষণা করেই এই পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। নানা ভাবে একটা পরিবর্তনের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে, আলোচনা সম্মেলন ইত্যাদি তারই অঙ্গ।

৮ মার্চ ১৯৯৫। বর্তমান সময়ে পরিবেশের মতো মেয়েদের সমস্যা নিয়েও আর একটা নতুন ধরনের কণ্ঠস্বর তৈরি হয়েছে। সমাজে মেয়েদের সমস্যা নিয়ে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার ইতিহাস অনেক পুরনো বটে, কিন্তু বর্তমান পর্বে তা রীতিমতো এক আন্দোলনের চেহারা নিয়ে গড়ে উঠেছে। এর সূত্রপাত বলা চলে ১৯৭৫-এ। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে ঘোষিত এই বছরটি ছিল আন্তর্জাতিক নারী দশকের শুরু। গোটা দশক জুড়েই নানা সভাসমিতি ও আলোচনাচক্রের মধ্যে দিয়ে নারী সমস্যার বিভিন্ন দিকে নজর ফেলা হয়। দশক শেষে নাইরোবিতে বড় রকমের এক আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়। রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের থেকে এর চরিত্র কিছু আলাদা বটে, কিন্তু এর পরিধি ছিল আরও ব্যাপক। আর ৮ মার্চ তারিখটি তো প্রত্যেক বছরই আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। শুধু সভা সমিতি আলাপ আলোচনা সাধুসংকল্প ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক কিছু কাজও যে একেবারে এগোয়নি তাও নয়। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে এক নারী কমিশন গঠিত হয়েছে। নারী কমিশন গঠিত হয়েছে আমাদের এই রাজ্যেও। এতেও নিশ্চয়ই সমস্যা মেটেনি। আর সমস্যা যে এইভাবেই মিটে যাবে তা নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু নজর কিচ্ছু ফেরে নি সেটা বললেও অন্যায্য বলা হবে। আজ আমাদের এখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে মানববিদ্যা তো বিদ্যাচর্চার এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসাবে স্বীকৃত। নারীবাদী আন্দোলন আর মানববিদ্যার চর্চা পাশাপাশি এগোতে এগোতে এক নতুন স্বাস্থ্যকর আবহ হয়ত কোনদিন গড়ে উঠবে। এসব ক্ষেত্রে এই মুহূর্তের সাফল্যই তো শেষ কথা নয়। আসলে ঐ অর্থে ঠিক সাফল্য এসব কাজের নিরিখ নয়। দুরাশ্রয়ী এই সব কাজ করে যেতে পারাই তো কাজ।

৯ মার্চ ১৯৯৫। প্রধানমন্ত্রী কোপেনহাগেন সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য রওনা হয়ে গেছেন। খবরে প্রকাশ কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিরাট বহুজাতিক সংস্থা সীমেন্স কোম্পানির কারখানা আছে সল্ট লেক অঞ্চলে। নিকটবর্তী মহিষবাথানের স্থানীয় লোকেরা নাকি কিছুদিন ধরেই সীমেন্স কোম্পানিতে চাকরি পাবার জন্য দাবিদাওয়া উত্থাপন করছিল। গতকাল নাকি কোম্পানির বাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই নেতৃস্থানীয় কিছু লোক সেখানে গিয়েছিলেন দেখা করে আলাপ আলোচনা করতে ও স্মারকপত্র দিয়ে আসতে। তাঁরা যখন গেট দিয়ে ঢুকছিলেন সেই সময় নাকি কিছু উটকো লোক, হয়ত বা চাকরির দাবিতেই, ঐ গেট দিয়ে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল। দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন এক কৌশলচালিত গেট ঠিক ঐ সময়ে উটকো লোকেদের মাথায় নেমে আসে। ফটক তো এক সময়ে বন্ধ করতেই হবে। যাকে তাকে তো আর ভেতরে ঢুকতে দেওয়া যায় না। ঐ উটকো লোকেদের একজন গেট চাপা পড়ে। তাকে হাসপাতালের নেবার চেষ্টা হয়েছিল। সে পথে মারা যায়।

নানা জায়গায় স্থানীয় লোকেরা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না। তাঁদের চাকরি না থাকলেই চাকরি নেই বলে চেঁচামেচি করছেন, চাকরির দাবি করছেন। কোনও নতুন কারখানা খোলার সম্ভাবনা দেখা দিলেই চাকরির আশায় দিন গুনছেন, চাকরি না পেলেই হতাশ হচ্ছেন, যখন তখন অযোযিতভাবে ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছেন। বুঝতে চাইছেন না যে এত লোককে চাকরি দিতে গেলে যারা কারখানা খোলে তাদের পোষাবে কেন। কারণ চাকরি দিলেই তো চলবে না, মাইনেও দিতে হবে যে। লোকজনের পেছনে এত খরচ করলে যন্ত্রপাতি কেনার বা জোগাড় করার পয়সা আসবে কোথা থেকে ? নতুন নতুন যন্ত্রপাতির দিকে না গেলে শিল্প আধুনিক হবে কীভাবে ? শিল্প আধুনিক না হলে সাবেক ধাঁচের উৎপাদন পদ্ধতিতে অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে কেমন করে ? আন্তর্জাতিক স্তরে তো তাহলে পিছিয়ে যেতে হবে। এসব তো আছেই, হয়ত বা আরও জটিল জটিল সব সমস্যা রয়েছে। সে সব তো বুঝতে হবে। হট করে চাকরি চাই বললেই তো চলবে না। কিন্তু মহিষবাথানের লোকেরা কথায় কথায় চাকরি চাইছে। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বুঝিয়ে বললেও বুঝতে চাইছেন না। ব্যাপারটা বোধ হয় খানিকটা বিপদ-সীমার কাছে এসে যাচ্ছে। শুধু মহিষবাথানে নয়, অন্য জায়গাতেও একই ধরনের ঝোঁক লক্ষ করা গেছে। সব জায়গাতেই হয়ত গেট চাপা পড়ে মারা যায়নি। কিন্তু মারা যেতে কতক্ষণ ? খুব বেশি লোক ঢুকে পড়তে চাইলে গেট তো টেনে নামাতেই হবে। আর তা হলে বিপদ হতেই পারে। বিদেশ থেকে যে সব শিল্পপতিরা এখনে কারখানা খোলবার কথা দিয়েছেন তাঁরা তো নিজেরা কোনও মুনাফা করবেন না এমন কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। তাঁরা তো দাতব্য শিল্পালয় খুলছেন না। এত চাকরি দিতে গেলে যে তাঁদের পোষাবে না এটা খুব স্বাভাবিক। বস্তুত যে সব দেশ থেকে আসছেন এই সব বিদেশি শিল্পপতিরা তাঁদের নিজেদের দেশেই চাকরি দেবার ব্যাপারে কোনও সুরাহা করতে পারেননি। খানিকটা হাল ছেড়ে দেওয়া



গোছের মনোভাব। 'জবলেস্ গ্রোথ' কথাটা কাগজপত্রে বেশ চালু হয়ে গেছে। আর্থিক বৃদ্ধি অব্যাহত, কিন্তু কর্মহীনতাও প্রকট। শিল্পোন্নত দেশে বেকারের হালফিল সংখ্যা নাকি সাড়ে তিন কোটি। ফলে দারিদ্র্যের একটা সমস্যা তো থেকেই যায়। তথাকথিত শিল্পোন্নত দেশেও তা রয়েছে, আর অন্য দেশগুলির কথা তো না তোলাই ভাল।

জুলাই ১৯৯০। হিউম্যান ডিভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯০-এই নামে এক নতুন প্রতিবেদন আমাদের হাতে এল। উন্নয়ন বিষয়ক আর এক প্রতিবেদন তো আমরা বেশ কয়েকবছর ধরে পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। বিশ্বব্যাঙ্ক এর তরফে তৈরি করা ওভার্ল্ড ডিভলপমেন্ট রিপোর্ট নামে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে পৃথিবীর নানা দেশের অর্থনৈতিক জীবনের খবরাখবর ও পরিসংখ্যান বেশ সহজে পাওয়া যায়। এসব নিয়ে যাঁরা খোঁজখবর রাখতে চান বা চর্চা করেন তাঁদের খুবই কাজে লাগে এই প্রতিবেদন। মানবিক উন্নয়ন বিষয়ক আর একটা নতুন প্রতিবেদনের প্রয়োজন দেখা দিল কেন ? দেখতে শুনতে প্রায় একই রকম দুটো বই, কিন্তু লক্ষ করলে বেশ তফাত চোখে পড়বে। মানবিক উন্নয়নের এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয় ইউনাইটেড নেশন্স্ ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এর তরফে। UNDP-র মুখ্য প্রশাসকের বিশেষ উপদেষ্টা পাকিস্তানের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মহবুব উল্ হক এই প্রতিবেদনের প্রধান পুরুষ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকজন গবেষকের পরিশ্রমে প্রণীত হয় এই প্রতিবেদন। আর গবেষণা উপদেষ্টা হিসাবে এঁদের সাহায্য করবার জন্য আছেন প্রখ্যাত উন্নয়ন বিশারদ ও অর্থনীতিবিদদের বেশ বড় একটি গোষ্ঠী। গুস্তাফ্ রানিস, অমর্ত্য সেন, কিথ্ গ্রিফিন্, মেঘনাদ দেশাই, পল স্ট্রিটেন প্রমুখ অনেকেই আছেন এই উপদেষ্টা গোষ্ঠীর মধ্যে। এখানেও পৃথিবীর নানা দেশের খবর পাওয়া যায়, বেশ বিস্তৃত পরিসংখ্যানও আছে।

দুই প্রতিবেদনের প্রধান তফাত আলোচনার ঝোঁকে। বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনের ঝোঁক 'উন্নয়ন' নিয়ে। এই উন্নয়নের মাপকাঠি মাথাপিছু জাতীয় আয়। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিই এখানে যেন উন্নয়নের সমার্থক। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোচনার কেন্দ্রে আছে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি, অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরমায়ু ইত্যাদি প্রসঙ্গ এখানে অনেক বড়। বস্তুত এই প্রতিবেদনের সূত্রপাতেই আছে এই স্বীকারোক্তি যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আর মানব উন্নয়ন সর্বদা সমার্থক নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির বিচারে বেশ পিছিয়ে পড়া দেশেও মানব উন্নয়নের সমৃহ বিকাশ সম্ভব। আবার এর বিপরীতও অসম্ভব নয়। উন্নয়নের ধারণাকে মূলত মানবকেন্দ্রিক করে তোলা এই নতুন প্রতিবেদনের ঘোষিত লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রথম বছরের প্রতিবেদনেই মানব উন্নয়ন সূচি (হিউম্যান ডিভেলপমেন্ট ইনডেক্স, HDI) নির্মাণের একটি সূত্র প্রস্তাব করা হয়েছে। এই সূচি অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্রমবিন্যাসে দেখা যাবে যে মাথা পিছু জাতীয় আয়ের হিসাবে সাজালে বিন্যাসের যে চেহারা পাওয়া যায়, মানব উন্নয়ন সূচির বিন্যাসের থেকে তা অনেক আলাদা।

এসব কথায় আমাদের উৎসাহিত হবার নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আরও খেয়াল করে তাকাতে গেলে একটু একটু আশঙ্কারও কারণ চোখে পড়বে। ১৯৯০-এর প্রথম প্রতিবেদনের মুখবন্ধে UNDP-র প্রশাসক উইলিয়াম ড্রেপার লিখছেন, ''আমরা এক আলোড়িত সময়ে বাস করছি। মানুষের স্বাধীনতার এক অপ্রতিরোধ্য ঢেউয়ে নানা দেশ আজ উত্তাল। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক শক্তি দীর্ঘদিন ধরে অবদমিত সেখানেও শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। এইসব দেশে জনসাধারণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ ক্রমে কমে আসছে। এসবের মধ্যে মানুষের চৈতন্যশক্তির জয়ই ধ্বনিত হচ্ছে।''

সময়ের সদিপাত বেশ লক্ষণীয়। ১৯৯০-এ মানবউন্নয়নের ধারণায় পৌঁছতে গিয়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতাহীনতার কথা থেকে। সব মানুষের নয়, কোনও কোনও দেশের মানুষের। কোন্ কোন্ দেশের তা এই প্রতিবেদনে নাম করে বলা নেই, তবে অনুমান করতে কোন অসুবিধা নেই। আশির দশকের শেষ দিক থেকে যেসব দেশে পরিবর্তন ও ভাঙনের চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠছিল তাদের কথা মাথায় নিয়েই মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন রচিত হচ্ছে। আশঙ্কার কথাটা এখানে। অবাস্তবভাবে যেটা বলা হল তা এই যে অন্যান্য দেশে মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ এবং সেই কারণে মানবউন্নয়নের দুর্ভাবনায় সে সব দেশ নিয়ে এখনই পীড়িত হবার কিছু নেই। আমাদের আশঙ্কা হয় যে শুরু থেকেই 'সমাজতন্ত্র', 'কমিউনিজম' ইত্যাদি ধারণাকে এক ধরনের প্রতিপক্ষ সাজিয়ে দাঁড় করানো হল। অতএব, তার বিপরীতে অবস্থিত যে ধারণা বা তন্ত্র, তার নাম পুঁজিবাদ বা যাই হোক না কেন তা-ই তবে এই প্রতিবেদনের প্রহ্লানভূমি। এই কথাটা মেনে নিলে দু-একটা বিপদ সম্বন্ধে সজাগ থাকতেই হবে। আমরা তো দেখছি স্বাধীনতা, মানবাধিকার, নারীমুক্তি, শিশুশ্রম নিবারণ ইত্যাদি আদর্শ কীভাবে প্রায় অস্ত্রের মতো ব্যবহার করা সম্ভব। এর প্রত্যেকটা আদর্শই যে কোনও সুস্থ সমাজে অবশ্যই গ্রাহ্য, সাধ্যমতো পালনীয়, এ নিয়ে তো কোনও সংশয় নেই। কিন্তু এ কথাও তো খেয়াল রাখতে হবে যে ইচ্ছে হলেই রাতারাতি সমস্ত

শিশুশ্রমিকের কাজ করা বন্ধ করা যায় না, নারীর বিরুদ্ধে লিঙ্গবৈষম্য একদিনে রোধ করা সম্ভব না, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সময় লাগে, আর স্বাধীনতার প্রশ্ন সে তো খুবই জটিল। আর তা ছাড়াও এই সব আদর্শ থেকে বিচ্যুতির নজির কি শুধুই দরিদ্র দেশে পাই? স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সমস্যা কি শুধুই 'সমাজতান্ত্রিক' দেশের সমস্যা? পৃথিবীর সবচেয়ে আগুয়ান শিল্পোন্নত সব দেশে এসব সমস্যার কোন অস্তিত্ব নেই? সে সব দেশে স্বাধীনতা ও মানবাধিকার জনসাধারণের সব অংশের মধ্যে সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত? ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গবৈষম্য সে সব দেশে নিশ্চিহ্ন? গণতান্ত্রিক স্বাধিকার সুরক্ষিত? তাই ভয় হয় এই প্রতিবেদনের মানব-সচেতনতা সত্ত্বেও প্রশ্নানভূমিতেই কিছুটা একপেশে ঝোঁক কাজ করছে।

এখান থেকেই আরও একটা সূক্ষ্ম বিপদের ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই। শুধু এই মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন নয়, এই ধরনের আন্তর্জাতিক আরও অন্যান্য প্রতিবেদনেও বেশ কিছুদিন ধরে ভাষার এবং বাচনের এক ধরনের কারিকুরি লক্ষ করা যাচ্ছে। সমাজ অর্থনীতির বিন্যাসের চলতি ধরন সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে যে ধরনের আপত্তি বা সমালোচনা উঠতে পারে তার প্রায় সবটুকুই আমরা এই সব প্রতিবেদনে পেয়ে যাই। পরিবেশের দৃষ্টিকোণ, নারীবাদের দৃষ্টিকোণ, আন্তর্জাতিক বৈষম্য ইত্যাদি সবই এই সব প্রতিবেদনের বাচনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে খুব স্বাভাবিক ভাবে। অথচ ঐ যে প্রশ্নানভূমির কথা বললাম, সেখানে যে সমাজ সংগঠন ও তার বিন্যাসের কথা থাকে সেটা কিন্তু চলতি বিন্যাসেরই সহগামী, অন্তত অনেকাংশে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যা দাঁড়াচ্ছে তা এই যে, যে সব সমালোচনার সুর ধ্বনিত হচ্ছে তা অধিকাংশ সময়ে উৎস পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। বিন্যাসের মূল চরিত্রে যেখানে আঘাত না করে কাঠামোগত কোনও পরিবর্তন কিছুতেই সুদূরপ্রসারী করা যাবে না, সেখানে ভাষার ও বাচনিকতার এই বিশেষ মুদ্রার জন্য চলতি বিশ্ববিন্যাসের এক প্রশ্রয় তৈরি হয়ে থাকছে। প্রায় যে-কোন রকম সমালোচনা ভাষা ও বাচনিকতার এই মুদ্রায় আত্মসৃ করে ফেলা যাচ্ছে। আসলে সমালোচনাত্মক ভঙ্গি ও তার প্রতিরোধের যে লড়াই, এই সব প্রতিবেদনের ভাষা-বাচনিকতায় সেই লড়াইয়েরই আর একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে উঠেছে। বিশ্বসংস্থানের বিন্যাস যে মূলত অক্ষত থাকবে তার ইঙ্গিত কিন্তু প্রশ্নানভূমিতেই নিহিত আছে। বিশ্ববিন্যাসের ইমারতে আপাতত যে খুব বড় ধাক্কা লাগছে তা মনে হয় না। ভাষা বাচনিকতার এই লড়াই যে অনেকদূর পর্যন্ত সে ধাক্কা সামলাবার কাজে লাগানো হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

জুলাই ১৯৯৪। মানবউন্নয়ন প্রতিবেদনের শেষ কিস্তি হাতে পাওয়া গেল। গত পাঁচ বছরের পাঁচটি প্রতিবেদনেই আমরা উন্নয়নশীল দেশের সমাজ অর্থনীতির বিকাশ সম্পর্কিত অনেক জরুরি তথ্য পেয়েছি। ঐ যে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছিলাম তার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। উন্নয়নশীল দেশ ও শিল্পোন্নত দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা দিক থেকে অনেক কথাই বলা হয়েছে কিন্তু প্রশ্নানভূমির খুব কিছু বদল লক্ষ করা যায়নি। এবারের প্রতিবেদনের কেন্দ্রীয় বিষয় ১৯৯৫-এর মার্চে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘের সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলন। রাষ্ট্রসংঘের তরফে ১৯৯৩ থেকেই এই শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছে। দলিল দস্তাবেজ ও আলোচ্য সূচি প্রণয়নের কাজ চলছে পুরোদমে। এই প্রতিবেদনেও আগামী সম্মেলনের জন্য নিজেদের মতো এক প্রেক্ষিত রচনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতের মূল কথা UNDP-র প্রশাসকের ভাষায় 'pro-people, pro-nature, pro-jobs and pro-women'। ভাষা-বাচনিকতার এই সেই খেলা। মানুষ, প্রকৃতি, কর্মসংস্থান, নারী এই সবই তো ছিল সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। তার সবই গৃহীত হয়ে গেল। বস্তুত, এই সব প্রত্যয় স্মরণ না করে আজ আর কে কথা বলে, আর বললেই সে কথায় কেই বা কান দেয়।

এগুলি ছাড়াও ১৯৯৪-এর প্রতিবেদনে আর একটি প্রত্যয়ের ওপরে বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। তা হল নিরাপত্তা। এতদিন নিরাপত্তার কথা বললেই আমরা প্রধানত আঞ্চলিক নিরাপত্তার কথা ভাবতাম। এক দেশের ওপর অন্য দেশের আক্রমণ, বিপন্ন স্বাধীনতা, এই ছিল নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। নিরাপত্তার এই ধারণা ও তার সংলগ্ন বিকারের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল অস্ত্রোৎপাদনের সমারোহ ও অবাধ অস্ত্রপ্রতিযোগিতা। ১৯৯০-এর পরবর্তী পৃথিবী তো ঠাণ্ডা লড়াই পেরিয়ে এসেছে। 'দুই সাম্রাজ্যের' পতন ঘটেছে। ফলে অস্ত্র প্রতিযোগিতার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। সামরিক উৎপাদন বজায় রাখবার জন্য এখন আঞ্চলিক লড়াইয়ের দিকে তাকাতে হবে। ইরাক, বসনিয়া, সোমালিয়া এই সব সংঘর্ষকেন্দ্রের দিকে নজর রাখতে হবে। ঐ সব লড়াইয়ে 'গণতন্ত্র' ও 'স্বাধীনতার' মিত্রপক্ষকে অস্ত্রসাহায্য করতে হবে, প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘের তরফে শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠাতে হবে। সম্প্রতি সোমালিয়া থেকে এরকম এক শান্তিরক্ষা বাহিনী তাদের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে কোনরকমে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে বেঁচেছে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পরে নিরাপত্তার ধারণায় বদল হতেই পারে। তাই এই প্রতিবেদনের নিরাপত্তার ধারণা অনেক বেশি মানব-কেন্দ্রিক। নিরাপত্তার অভাব শুধু যে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে আসে না এ কথার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে প্রতিবেদনে। নিরাপত্তার অভাব আসে দারিদ্র্য থেকে, কর্মহীনতা থেকে, দুর্ভিক্ষের থেকে,



আতঙ্কবাদ থেকে, মারাত্মক রোগ বীজাণু থেকে, বিষাক্ত ওষুধ ও তার নেশা থেকে, পরিবেশ দূষণ থেকে। আজকের পৃথিবীতে এর চেয়ে সত্যি ও জরুরি কথা আর কী হতে পারে। একথাও পরিষ্কার যে নিরাপত্তার অভাবের সমস্যা শুধু দরিদ্র দেশের সমস্যা নয়, ধনী দরিদ্র দেশের বাসিন্দা নির্বিশেষে পৃথিবীর বহু মানুষ আজ নিরাপত্তার অভাবে দীড়িয়ে। প্রতিবেদনের ভাষায় ক্ষুধা ও রোগ যদি হয় দরিদ্র দেশের নিরাপত্তার সমস্যা, তাহলে নেশা ভাং ও খুন রাহাজানি হল ধনী দেশের নিরাপত্তার সংকট। প্রতিবেদনে একথাও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত যে এসব যে সমস্যার কোনটাই শুধু জাতীয় সীমারেখায় আবদ্ধ নয়, সমস্যাগুলি সবই মূলত আন্তর্জাতিক। মানুষের নিরাপত্তার প্রতিটি সমস্যাই আজ তাই পৃথিবীর সব মানুষেরই মাথাব্যথার কারণ। এইড্স্ কিংবা অ্যাসিড বৃষ্টি, কিংবা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা ক্ষীয়মাণ ওজোন স্তরের সমস্যা কি কারও একলার সমস্যা? সমস্যাগুলোও পৃথিবীর সার্বিক সমস্যা, আর তার সমাধানের চেষ্টাও তাই হতে হবে সার্বিক সহযোগিতার পথে। আজকের বিশ্বায়িত পৃথিবীর এই হল মর্মকথা।

১৯৯৪-এর প্রতিবেদনের চিন্তাকাঠামোয় ১৯৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম পর্বে পৃথিবী এক নতুন বিশ্ববিন্যাসের সন্ধান করেছিল। ব্রেটন উড্স প্রতিষ্ঠানগুলি সমেত রাষ্ট্রসংঘই ছিল সেই বিন্যাসের প্রতিষ্ঠানিক আদল। আর আজ এই ১৯৯০-এর দশকে পৃথিবীকে আর একবার এক নতুন বিন্যাসের সন্ধান করতে হচ্ছে। ইরাক যুদ্ধের সময় থেকেই ধ্বনিত হচ্ছে এক আসন্ন নতুন বিশ্ববিন্যাসের কথা। এই প্রতিবেদনেও তার প্রতিধ্বনি। এই নতুন বিন্যাসের ভিত্তি যে শুধু উৎপাদননির্ভর অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নয় সে কথা বারবার বলা হয়েছে। মানুষের কথা, প্রকৃতির কথা, নারীর কথা, শ্রমের কথা, শিশুর কথাই যে এই নতুন বিন্যাসের মূল ভাবনা তাতেও সংগতভাবেই জোর দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কিছু সংশয়ের কারণ থেকে যায় আমাদের। এই প্রতিবেদনে প্রাতিষ্ঠানিক যে-আদলের ভাবনা বড় বেশি গুরুত্ব পায় তা হল রাষ্ট্রসংঘ ও তার আনুষঙ্গিক সংস্থা ও সংগঠন। এক অর্থে এ চিন্তা খুব স্বাভাবিক এবং প্রতিবেদনের মূল যুক্তিন্যায়ে প্রায় অনিবার্য। বিশ্বায়নের প্রত্যয় থেকে তো এই প্রতিবেদনের যাত্রা শুরু, আজকের পৃথিবী তো জাতিসর্বস্ব একলসেঁড়ের পৃথিবী নয়। বিশ্বমাত্রায় বাঁধা আজকের মানুষের ভাবনার আদল, অন্তত সেই রকমই তো হবার কথা। তাই আজকের কর্মসূচিকেও বিশ্বমাত্রায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সেই স্তরে একবার পৌঁছে গেলে আমাদের বিশ্বপ্রতিষ্ঠানসমূহ তো প্রস্তুত হয়েই আছে। রাষ্ট্রসংঘ আছে তার নানা সংস্থা সংগঠন ও বিশেষ উপদেষ্টা পর্যন্ত নিয়ে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক আছে। নতুন তৈরি হল বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, সেও আছে। প্রতিবেদনের চিন্তায় মানব-কেন্দ্রিক উন্নয়নসূচিকে রূপায়িত করতে হবে এইসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ছত্রচ্ছায়ায়। আশা করা হচ্ছে জাতিস্বার্থের সংঘাতে দীর্ণ চেহারার করুণ এতে করে অনেকখানি এড়ানো যাবে। এই সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জাতিস্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে মানবউন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া ও তদারকির দায়িত্ব পালন করতে পারবে। ঠিক এই জায়গায় একটু খটকা লাগবে। এইসব প্রতিষ্ঠানও জাতিস্বার্থের ঘোরপ্যাঁচে জড়িয়ে যাবে না তো? প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থশতাব্দীর জীবনচরিতের ভাষ্য থেকে এই আশঙ্কা দানা বাঁধে।

প্রতিবেদন আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের জন্য একটা ছয় দফা কর্মসূচির খসড়াও প্রণয়ন করেছে। এই সূচির মধ্যে আছে: এক নতুন বিশ্ব সামাজিক সনদ, ২০-২০ মানবউন্নয়ন চুক্তি, শান্তির আর্থিক সুফলের সদ্ব্যবহার, সার্বিক মানব নিরাপত্তা ভাণ্ডার, মানব উন্নয়নের লক্ষ্যসাধনে রাষ্ট্রসংঘের তদারকি ও রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পরিষদ। এই খসড়া সূচি সংক্ষেপে বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক।

এর প্রত্যেকটি হল ১৯৯৪ এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের তরফে প্রস্তাবিত এক একটি কর্মসূচি। প্রস্তাব এই যে ১৯৯৫-এর মার্চের শীর্ষ সম্মেলনে যেন এই সব সূচি গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাব হল বিশ্ব সামাজিক সনদ বিষয়ে। মানব উন্নয়ন, সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্ব যে আজ সারা পৃথিবীকেই একসঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে, এ কাজ যে আজ আর শুধুমাত্র জাতীয় স্তরে সম্পন্ন করার মতো কোনও কাজ নয়, প্রথম প্রস্তাব এই কথারই স্বীকৃতি। এ প্রসঙ্গে অবশ্য ইতিমধ্যে অন্তত দুটো এরকম প্রস্তাব আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত হয়ে আছে। এর একটা ১৯৭৬ থেকে কার্যকর হয়ে আছে — অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি। অন্যটা হল ১৯৯২-এর বসুন্ধরা সম্মেলনে গৃহীত ২১নং কার্যসূচি। অ্যাজেন্ডা ২১ নামে পরিচিত এই সূচিই এ পর্যন্ত এ বিষয়ে সবচেয়ে বিশদ ও ব্যাপক আন্তর্জাতিক চুক্তি। এগুলো বহাল থাকতেও আবার নতুন করে বিশ্ব সামাজিক সনদের প্রস্তাবের তাৎপর্য বোঝা শক্ত। কিন্তু প্রতিবেদনে এরকম এক সনদের প্রস্তাব শুধু আছে তাই না, সনদের পূর্ণ পাঠও প্রতিবেদনে সংযোজিত আছে। তিন-চতুর্থাংশ দরিদ্র ও এক-চতুর্থাংশ ধনীর এই বিশ্ববিন্যাস যে চলতে পারে না এ কথা স্পষ্ট করে এই সনদে ঘোষণা করা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে এ শপথও গ্রহণ করা হচ্ছে যে এই বৈষম্য দূর করা ও প্রাথমিক শিক্ষা স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার জন্য আমরা সবাই রাষ্ট্রসংঘের ছত্রছায়ায় সমবেত প্রচেষ্টায় মিলিত হব। তথাকথিত গণতন্ত্রের পক্ষে ও তথাকথিত কর্তৃত্ববাদের বিপক্ষেও এই সনদের

স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এই সব সাধুসংকল্পের ঘোষণায় কী লাভ সে প্রশ্ন তো তোলা যেতেই পারে, কিন্তু তা ছাড়াও এরকম আশঙ্কা থাকে যে 'গণতন্ত্র' 'কর্তৃত্ববাদ' ইত্যাদি ধারণা বড় অগভীরভাবে দেখা হচ্ছে। শুধুমাত্র নির্বাচিত সরকার থাকলেই কি সমাজে গণতন্ত্র সুরক্ষিত হয়? সমাজের চেহারা কতটা গণতান্ত্রিক সে তো আরও ভেতরে না গেলে বোঝা যাবে না। এই সব সনদের ভূমিকা ও প্রকৃত মতিগতি বিষয়ে তাই সন্দেহ থেকেই যায়।

২০-২০ মানবউন্নয়ন চুক্তির মধ্যে এই কয়েকটি প্রস্তাব প্রতিবেদনের মতে সর্বাগ্রগণ্য: বালক-বালিকা নির্বিশেষে সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক নিরক্ষরতার হার অর্ধেক কমিয়ে আনা এবং এ ব্যাপারে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা, সার্বিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা, তীব্র অপুষ্টি সম্পূর্ণভাবে দূর করা ও আংশিক অপুষ্টির হার অর্ধেক কমিয়ে আনা, সব ইচ্ছুক দম্পতির জন্য পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা, সকলের জন্য নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মলমূত্রাদি পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা এবং স্বনিযুক্তির সুযোগের জন্য সার্বিক ঋণের বন্দোবস্ত করা। বাড়তি খরচের আনুমানিক হিসাব ধরা হয়েছে আগামী দশ বছরের জন্য বার্ষিক ৩০ থেকে ৪০ বিলিয়ন ডলার। শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের বর্তমান বাজেট বরাদ্দের সুবিধামতো রদবদল করলেই এ খরচ মেটানো সম্ভব। বাজেটের গড়পড়তা ২০ শতাংশ যদি এই প্রস্তাবিত খাতে ব্যয় করা যায় তাহলেই প্রয়োজনীয় খরচ মেটানো সম্ভব হবে। এই হল প্রতিবেদনের হিসাব। মানবউন্নয়নের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতে দুই গোষ্ঠীর দেশগুলি তাদের বাজেট বরাদ্দের ২০ শতাংশ করে খরচ করুক এই হল প্রস্তাবের সারমর্ম আর তাই প্রস্তাবটির শিরোনাম '২০-২০ মানবউন্নয়ন চুক্তি'। এই চুক্তি তদারকির ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের দায়িত্বের উপর প্রতিবেদন বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রতিবেদনের ভাষায়, "Such a compact needs to be managed, monitored and coordinated internationally. The Social Summit should direct the United Nations system to design such a 20:20 compact and to identify institutions and procedures for its implementation." রাষ্ট্রসংঘকে এতটা খবরদারি করতে দিলে স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না তো? তা ছাড়া কেন্দ্রানুগ ধারণা কি খুব বেশি প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে না? ঐ কেন্দ্রে যদি কখনও ব্যভিচার জমা হয়? কোনও রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী যদি ঐ কেন্দ্রে কখনও ঘাঁটি গাড়তে পারে? প্রতিবেদন সম্ভবত এসব বিপদের জন্য খুব সজাগ নয়, নাকি এগুলো বিপদ বলেই গণ্য নয়?

শান্তির সুযোগের সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক চিন্তা ও সাধু প্রস্তাব। শান্তি সম্ভাবনার আর্থিক সুফলের একটা হিসাবও উপস্থিত করা হয়েছে। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪-এর মধ্যে সারা পৃথিবীতে বার্ষিক ৩.৬ শতাংশ হারে সামরিক ব্যয় কমেছে। এ খাতে এ পর্যন্ত সাশ্রয় হয়েছে ৯৩৫ বিলিয়ন ডলার, এর মধ্যে শিল্পোন্নত দেশের অংশ ৮১০ বিলিয়ন ডলার ও উন্নয়নশীল দেশের অংশ ১২৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু প্রতিবেদনে অকপট স্বীকারোক্তি রয়েছে যে এ টাকাটা কোথায় কীভাবে খরচ হল তার হদিশ পাওয়া খুব সহজ নয়। অন্তত মানব উন্নয়নের খাতে যে এই কারণে বাড়তি খরচ করা হয়েছে এরকম কোন লক্ষণ নেই। প্রতিবেদনের সরল প্রস্তাব তাই করা হোক। এবং আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘকে জোরালো আর্জি জানাবার কথা বলা হয়েছে।

শান্তিসম্ভাবনার সুফল থেকে স্বাভাবিকভাবে চলে আসে মানবনিরাপত্তা ভাণ্ডারের প্রস্তাব। আজকের পৃথিবীতে মানুষের নিরাপত্তার অভাব মূলত কোনও রাষ্ট্রীয় সমস্যা নয়। দুর্ভিক্ষ, দূষণ ও জাতিবৈর ইত্যাদি সমস্যার আন্তর্জাতিক মোকাবিলার প্রচেষ্টা অবশ্যই এক করণীয় কাজ। এই মোকাবিলার একটা ধাপ এক আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ভাণ্ডার স্থাপন করা। এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহের কিছু কিছু উৎস প্রতিবেদনে নির্দেশ করা আছে। শান্তিসম্ভাবনার সাশ্রয় এরকমই এক উৎস। অন্য সম্ভাব্য উৎসের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক ফাটকা মূলধনের আনাগোনার ওপর বসানো কর, দূষণের জন্য ধার্য কিছু দেয়, শক্তি ব্যবহারের ওপর নির্ধারিত কর। এ ছাড়াও আছে শিল্পোন্নত দেশের মোট জাতীয় আয়ের কোন এক নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যবাধক ভাবে মানব নিরাপত্তার খাতে ব্যয়ের দায়িত্বগ্রহণ। বর্তমানে শিল্পোন্নত দেশগুলির মোট জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ সরকারি উন্নয়ন সাহায্য হিসাবে ব্যয় করার একটা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে। এই খাতে প্রকৃত ব্যয় প্রায় সব দেশেই এই লক্ষ্যমাত্রার নিচে। প্রতিবেদনের একটা প্রস্তাব এই লক্ষ্যমাত্রার প্রথম ০.১ শতাংশ অর্থ দরিদ্র দেশের সামাজিক সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ করা। প্রতিবেদনের হিসাব অনুসারে এইসব উৎস থেকে সংগ্রহ হতে পারে ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বার্ষিক ২৫০ বিলিয়ন ডলার। মনে রাখতে হবে যে এই অঙ্ক পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের (GDP) মাত্র ১ শতাংশ। আর এই সেদিন পর্যন্তও পৃথিবীজোড়া সমরাস্ত্রের জন্য খরচের অঙ্ক ছিল এই মোট অভ্যন্তরীণ আয়ের ৪ শতাংশ। ফলে প্রতিবেদনের প্রস্তাবে অবাস্তবতা কিছু নেই, আমাদের সংশয় প্রস্তাবের প্রাতিষ্ঠানিক সংকীর্ণতা বিষয়ে। আজকের রাষ্ট্রসংঘের হাতে এত সব কাজের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক, নিরর্থক তো বটেই। রাষ্ট্রসংঘের প্রাতিষ্ঠানিকতায় এসব কাজ হতে পারলে ইতিমধ্যেই যে সব সনদ-শর্ত-চুক্তি ইত্যাদি আছে তার মধ্যেই তা হতে



পারত। তার জন্য নিতান্ত ব্যয়বহুল কোপেনহাগেন শীর্ষ সম্মেলনের প্রয়োজন দেখা দিত না।

গত পঞ্চাশ বছরে রাষ্ট্রসংঘ ও তার সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্ক প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন ও পৃথিবীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের খতিয়ান এবং এসব পরিবর্তন-বিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ভালভাবে না ঢুকলে আলোচনায় এক ধরনের অগভীরতা প্রায় অনিবার্য। মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিষ্ট প্রতিবেদনের প্রস্তাব ও বিভিন্ন সাধু সংকল্পের মধ্যে সেই অগভীরতা লক্ষ না করে উপায় নেই। সমস্যা বোধ হয় অগভীরতার চেয়েও কিছু বেশি। চলতি বিশ্ববিন্যাসের চালচলন, ধরনধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মূলত অপরিবর্তিত রেখে সংস্কারের সংকল্প খুব বেশিদূর পৌঁছতে পারার কথা নয়। এবং আখেরে সংস্কারের সংকল্পই খানিকটা পল্লবগ্রাহী হয়ে ওঠে। বিষয়টা একটু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে প্রতিবেদনের উচ্চারণে কী কী কথা পাওয়া গেল, আর কী কথাই বা উহ্য রইল তার একটু বিচার করা দরকার। উহ্য কথা উচ্চারণের চেয়েও অনেক সময়ে বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

সামান্য দু-একটা উদাহরণ একটু দেখা যাক, তাহলে ধরনটা বোঝা যাবে। বর্তমান দুনিয়ায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও মানবাধিকার ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই বেশ টানাপোড়েনে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদন সে সবের গভীরে বিশেষ যায়নি, সম্ভবত প্রতিবেদন প্রণেতাদের কিছু কিছু রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ঝোঁক খানিকটা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানবাধিকার সুরক্ষা করা নিশ্চয়ই খুব বড় পালনীয় আদর্শ, তবে স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বও খুব ফেলনা জিনিস কিছু নয়। প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়েই জীবনের প্রতি দাবির সর্বজনীনতার এক ধারণা বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ আছে। জীবনের প্রতি দাবি সর্বজনীন বলেই তো মানবাধিকার সুরক্ষা করার প্রশ্ন উঠছে। এই দার্শনিক মেজাজের আলোচনা অল্প এগোতেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে মানবাধিকারের সম্ভাব্য বিরোধের প্রশ্ন উঠে পড়ছে। এই বিরোধে প্রতিবেদনের অবস্থান এই যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের আদর্শ ততক্ষণই গ্রাহ্য যতক্ষণ তা মানবাধিকারের প্রতিকূল না হয়। অর্থাৎ সার্বভৌমত্বের কোনও পরম নিঃশর্ত আদর্শ এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য নয়। বলা হতেই পারে যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন রচনা করতে বসে মানবাধিকারের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেওয়াই তো স্বাভাবিক। খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু অসুবিধা এই যে সার্বভৌমত্ব একবার বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকলে মানবাধিকারের দায়দায়িত্বও হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। আর কাকে বলে মানবাধিকার? রাষ্ট্রের নিজের মানদণ্ডে তখন এ প্রশ্নের উত্তর অবান্তর হয়ে যেতে পারে। 'আন্তর্জাতিক' প্রাতিষ্ঠানিকতার চাপে অবান্তর অবাঞ্ছিত মানদণ্ডের নিরিখ চাপিয়ে দেওয়াও তখন অসম্ভব কিছু নয়। "...respecting national sovereignty but only as long as nation-states respect the human rights of their own people," প্রতিবেদনে যে সুরে এ কথাটা বলা হয় তাতে অনুচ্চারিত কথার জন্য আশঙ্কা হয়।

গণতন্ত্রের কথায় প্রতিবেদনের কথা হল সমাজের গণতন্ত্রের জন্য খুব বেশি ধনী হতে হয় না। খুব ন্যায্য কথা। প্রতিবেদন আরও স্পষ্ট করে জানায় যে কোন পরিবারের সব সদস্যের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিবারটিকে খুব বিত্তবান হতে হয় না। নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্থাপনের জন্য খুব বেশি মাত্রার জাতীয় আয়ের দরকার হয় না। আয়ের যে কোন স্তরেই মূল্যবান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব। কোনও জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঋদ্ধি সত্যিই তো শুধুমাত্র তার জাতীয় সম্পদের ওপর নির্ভর করে না। এত সব কথার মধ্যে যে-কথাটা উহ্য রইল তা এই যে সম্পদের উৎপাদনের এমন ছাঁদ সম্ভব যার জন্যই জীবনযাপনের মান খানিকটা অবনত হতে পারে। সাংস্কৃতিক ঋদ্ধি আর সম্পদের অনির্ভরতার প্রতিজ্ঞা মেনে নিলে তো এ দুয়ের সম্পর্ক অন্য রকমও দাঁড়াতে পারে। সম্পদে উন্নত না হয়েও যেমন সংস্কৃতিতে, জীবনের সুস্থ বিকাশে কিছুটা অন্তত সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব, তেমনি সম্পদে উন্নত হয়েও তো অন্য বিচারে হীনাবস্থা দেখা দিতে পারে। মাদক দ্রব্য থেকে শুরু করে এখন তো নানা রকম আঠা জাতীয় দ্রব্য থেকে নেশা করার প্রবণতা ধনী দেশের কিশোর কিশোরীর মধ্যে সংকটের চেহারা নিচ্ছে। জীবনের প্রতি দাবি তো সর্বজনীন; এ সব দিকেও না তাকালে কি চলে। না হলে বিত্তহীনের পিঠ চাপড়ানো প্রশ্রয় পেয়ে যায়। পার্থিব বিত্ত ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্পর্ক অনেক জটিল, সে বিষয়ে অত অগভীরে কথা বললে আলগা মানবিক উচ্চারণের বেশি ফললাভ হওয়া শক্ত। প্রতিবেদন থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এরকম আরও অনেক উদাহরণ বার করা সম্ভব। কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে কী লাভ।

১০ মার্চ ১৯৯৫। কোপেনহাগেনের শীর্ষ সম্মেলন দিন চারেক হয়ে গেল। খবরে প্রকাশ যে ২৮ বিলিয়ন ডলার খরচের এই শীর্ষ বৈঠকে রাষ্ট্রনেতারা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর তাঁদের মাথা ঘামাচ্ছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মহীনতার সমস্যা সমাধান ও সামাজিক বৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতার অবসান এই তিনটি হল বর্তমান সম্মেলনের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রাসঙ্গিক আরও অনেক কথাই আলোচনা হচ্ছে, হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের সাধুসংকল্পের অনেক কিছুই যে

ব্যর্থ হতে চলেছে তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই কিছু কিছু মিলছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই টাকা পয়সার ব্যাপারে রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে বিভেদ ও মতানৈক্য বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ খাতে খরচের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করার ব্যাপারে ১৩২টি অনুন্নত দেশের তরফে অনিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। আর জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ সামাজিক খাতে খরচ করার লক্ষ্য বিষয়ে অনেক সদস্যেরই আপত্তি প্রকট। ও ব্যাপারটা দ্বিতীয় দিনেই প্রায় বর্জিত। আনুষ্ঠানিকভাবে সরাসরি বর্জন না করে বলা হচ্ছে যেমন যেমন প্রয়োজন দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সে বিষয়ে চুক্তি করা সম্ভব। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের তদারকির বাইরে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে কিছু করা সম্ভব হলেও হতে পারে। দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনায় শক্তিশালী পক্ষের চাপ ঠেকানোর আর প্রায় কোন উপায় থাকে না। পশ্চিমী গণতন্ত্রের তরফে তাই প্রায় সব সময়ে বহুপাক্ষিকতার পক্ষে ওকালতি করা হয়। তবে দেখা যাচ্ছে সময়ে অসময়ে সেই বহুপাক্ষিকতার আদর্শকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা নেই। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে তৃতীয় দুনিয়ার ঋণ নিয়েও ঠেলাঠেলি কম হয়নি। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির বিপুল ঋণভার নাজাই করার দাবি মেনে নিতে বা সে সম্বন্ধে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করতে ধনী দেশ ও ব্যাঙ্কের তরফে যথেষ্ট দ্বিধা আছে। এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা বেশিদূর এগোবার আগেই আটকে যায়। দু-একদিন বাদে হয়ত আবার তোলা হবে।

যে কোনও বিষয়েই হোক, নির্দিষ্ট কর্মসূচি, বিশেষ করে খরচের লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশ করার প্রশ্ন উঠলে যে মতৈক্য চট করে হবে না এটা বুঝতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। বস্তুত এ ধরনের সম্মেলনে কাজের কাজ কতটা কী হয় এ নিয়ে দ্বিধা তো থাকেই। এই সব দ্বিধা থেকেই বিকল্প সম্মেলনের ভাবনা। শুধু নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারার অসুবিধাই নয়, এইসব সরকারি স্তরের শীর্ষ বৈঠকে এমন অনেক মতাদর্শগত ঝোঁক কাজ করে যে তাতে আপত্তি জানাতে হয়। এই ধরনের ভাবনা থেকে সরকারি সম্মেলনের পাশাপাশি বেসরকারি স্তরে আয়োজিত বিকল্প সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। সব সময়ে না হলেও কখনও কখনও। এবারেও কোপেনহাগেনে মূল সম্মেলনের বাইরে এক সমান্তরাল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংঘ ও সংগঠনের তরফে এখানে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছে। ভারত থেকেও বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি আছেন বিকল্প সম্মেলনে। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছে নরওয়েজিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডিভেলপমেন্ট (DAWN), গীতা মুখার্জী, দেবকী জৈন প্রমুখের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় গোষ্ঠী, ইউরোস্টেপ ও থার্ড ওআর্ল্ড নেটওঅর্ক। ভারতের থেকে অ্যাকশন্‌এউড্-এর অমিতাভ মুখার্জীও ঐ বিকল্প সম্মেলনে মুখ্য ভূমিকায় আছেন। সাউথ এশিয়া ককাসের তিনিই অধ্যক্ষ। এমনকি হিলারি ক্লিন্টনও এই বিকল্প সম্মেলনের মুক্ত সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন। বেসরকারি সংগঠনের ভূমিকার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ, বিশেষত মহম্মদ ইউনুস ও বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজকর্মে। বিকল্প সম্মেলন থেকেও এক বিকল্প ঘোষণা তৈরি হচ্ছে।

বিকল্প মঞ্চে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির গোষ্ঠীর তরফে বেশ জোরালো বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। অমিতাভ মুখার্জী এই গোষ্ঠীরই অধ্যক্ষ। এঁরা বাজারকেই অর্থনীতির চালিকাশক্তি করে তোলার ঘোর বিরোধী। এঁদের মতে যে সব সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলায় কোপেনহাগেনে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে হয়েছে তার অনেকগুলি, হয়ত অধিকাংশই বাজার নামক এক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। অতএব সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর। ঋণভার নাজাই করার ব্যাপারেও এঁদের বক্তব্য খুব স্বচ্ছ। অমিতাভবাবুর ভাষায়, "We don't want forgiveness but only want back everything which the rich countries have taken away form us."। বিকল্প মঞ্চে দক্ষিণ এশিয়ার বেসরকারি সংগঠনগুলির দাবি, কে কার কাছে কী কতটা পায় তার একটা অডিট করা হোক।

১১ মার্চ ১৯৯৫। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, 'প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি'। ধর্মকথা ততক্ষণই চলে যতক্ষণ আঁতে ঘা না লাগে। মানবাধিকার নিয়ে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমি দেশগুলির চেচাঁমেচি সুবিদিত। যদিও ঐ সব দেশে মানবাধিকারের হিসাবনিকাশ কে করে তার ঠিক নেই। মানবাধিকারের অজুহাতে যখন তখন বাণিজ্য প্রতিরোধের হুমকি দেওয়া হয়, কার্যকরও করা হয়। কিন্তু হিসাবে গোলমাল হলেই, অঙ্কে না মিললেই সুর বদল হয়।

খবরে প্রকাশ গতকাল ব্রিটেন শীর্ষ সম্মেলনে সবাইকে চমকে দিয়ে মানবাধিকার নিয়ে নাকি অন্য সুরে কথা বলেছে। সে দেশের বৈদেশিক সাহায্যবিষয়ক মন্ত্রী ব্যারনেস চকার অব্ ওয়ালাসি নাকি বলেছেন অবাধ বাণিজ্যই সার্বিক সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। মানবাধিকার খুব জরুরি, মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে সে কথা স্বীকৃত, মানবাধিকারের সর্বজনীনতাও নীতিগতভাবে গৃহীত, কিন্তু তাই বলে উন্নত দেশগুলির কি একমাত্র কাজ সামাজিক মানদণ্ডের বিচারে একে ওকে শাস্তি দিয়ে বেড়ানো? দেশে দেশে এমন শ্রম অবস্থা চালু থাকা খুবই সম্ভব যা উন্নত দেশের বিবেচনায় অগ্রাহ্য। কিন্তু চাইলেই কি রাতারাতি কোনও সরকার তার দেশের থেকে শিশু শ্রমিক



সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারে? আর না পারলেই বাণিজ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরোপ করতে হবে নাকি? ব্যারনেস একা নন। সম্মেলনের বাইরে সুদূর ওয়াশিংটনে মার্কিন সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের আন্তার সেক্রেটারি জেফ্রি গার্টেন প্রায় একই সুরে একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মানবাধিকার, পারমাণবিক অস্ত্রপ্রসার রোধ, পরিবেশ বা অন্যান্য কোন অজুহাতেই মার্কিন বাজারকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। বড় উঠতি বাজারে মার্কিন বিক্রেতাকে ভাগ বসাতেই হবে। নইলে তার কোন না কোন প্রতিযোগী ঐ বাজারে ঋামচা দেবে। মানবাধিকার প্রমুখ আদর্শের আন্দোলনকারীদের তিনি প্রকারান্তরে একটু সাবধান করে দিয়েছেন। বাজার বিস্তারে যেন বাধা দেওয়া না হয়। দশটি উঠতি বাজারের মধ্যে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়া যে মার্কিন স্বার্থের দিক থেকে বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে এ কথা বলতেও শ্রীযুক্ত গার্টেন ভুল করেননি।

১২ মার্চ ১৯৯৫। সম্মেলনের শেষ দিন। কোপেনহাগেন ঘোষণার দলিল প্রস্তুত। রাষ্ট্রনেতারা সইসাবুদ করবেন, আরও কিছু সাধুসংকল্পের ঘোষণা পাওয়া যাবে। ঘোষণার মূল পাঠ আমরা কবে হাতে পাব, বা আদৌ পাব কিনা জানি না, তবে নির্দিষ্ট কর্মসূচি কতটা সর্বজনস্বীকৃত ঘোষণাপত্রে থাকবে তা বলা শক্ত। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত অনেক কিছুই যে থাকবে না সে কথা ইতিমধ্যেই প্রায় পরিষ্কার। বস্তুত ঐ প্রতিবেদনের প্রধান রূপকার মহবুব উল্ হক স্পষ্ট ভাষায় তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নাকি ভরসা ছিল যে শান্তির আর্থিক সুফলের কিছুটা ভাগ দারিদ্র্য মোচনের জন্য মিলবে। তাঁর সে আশা ধূলিসাৎ, ও ব্যাপারে এখন আর তাঁর কোনও ভরসা নেই। সামরিক খরচখরচা কমাবার প্রসঙ্গটি কেউ নাকি সম্মেলনে ঠিকমতো বিবেচনা করার কোনও আগ্রহই দেখাননি। ঐ বিষয়ে কোনও ঘোষণার কথা দূরে থাক, সম্ভবত অস্ত্রব্যবসায়ীদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য প্রভাবে বিষয়টি সম্মেলনে তেমন আমলেই পায়নি। হক সাহেবের হতাশায় একটু অবাক লাগে। সাধুসংকল্পের প্রবর্তনায় যোগ্যতম মঞ্চ কি রাষ্ট্রসংঘ আয়োজিত সরকারি সম্মেলন? অবশ্যই এর মানে এই নয় যে বেসরকারি সম্মেলনেই এর পুরো সদুত্তর আছে। আসলে সভা সমিতি সম্মেলনের এই পরিধি বড় দূরে অপসৃত। অত দূরে একটা প্রতিসরণ ঘটে যায়। কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রোও শেষ দিনের ভাষণে তাঁর চাঁচাছোলা ভাষায় গোটা সম্মেলনটিকেই বলেছেন 'যাচ্ছেতাই'। মূল সমস্যার অনেক কিছুর নাকি কোনও উল্লেখই নেই ঘোষণাপত্রে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আপাতত সম্মেলন ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল।

# ঘাস রঙের আলো

## আলোক সরকার

দেখি
ঘরের এককোণে
নতুন এক ধরনের পোকা।

ওর ঘাস-রঙের চোখ
জ্বলছে নিভছে।
ওর শরীর

একেবারে স্থির।
অনেক অনেকক্ষণ পরেও
ওর শরীর

একেবারে স্থির। শুধু
ওই চোখ দুটো
ওদের কাজে

কোনো ফাঁক নেই—
ঘাস-রঙের একাগ্রতা
জ্বলছে নিভছে।

আমার
আর সময় নেই।
আমার অনেক কাজ।

রোদ্দুরেরও সময় নেই
সে জানলার
মাথার ওপর উঠেছে। যেমন

আকাশে তিন খণ্ড মেঘ
নিজেদের এক করলো।
আমি

কাজে মন দিই।
দিনের শেষে
কাজ এগোয় অনেক।

উঠে গিয়ে দেখি
ঘরের কোণে
ঘাস-রঙের আলো

জ্বলছে নিভছে।
শরীর
একবিন্দু সরেনি।

# একলা উজানে

## বাসুদেব দেব

হাওয়া ফিসফাস হাওয়া ফিসফাস
পুরোনো বাড়ির ভিতরে কে যাস
দরজা জানলা কত কথা বলে
পথ ঢেকে দেয় কুয়াশা উদাস
হাওয়া ফিসফাস...হাওয়া ফিসফাস

ছায়া ছায়া ঐ আলাদা জগৎ
ঘুমের ওপারে অপরা অসৎ
ঘোড়া নিমগাছ সিঁড়িভাঙা ঘাট
স্মৃতি শুধু আজ প্রিয় ক্রীতদাস
হাওয়া ফিসফাস হাওয়া ফিসফাস

ডুমুর পাতার ভিতরে পোকাটি
বিস্মৃতি বোনে কত পরিপাটি
কেমন মগ্ন মৃত্যুকে পায়
আবছা আড়ালে নীল কবিতায়
গোবরাট চেপে উঠে আসে ঘাস
হাওয়া ফিসফাস হাওয়া ফিসফাস

আধভাঙা ঐ ছায়ার চাতালে
অথবা মাদক ঘুমের পাতালে
মালিকানাহীন পুরোনো বাড়ির
ভিতরে বাইরে আগাছার ভিড়
না মেটা তৃষ্ণা কত ভাঙা গ্লাশ
হাওয়া ফিসফাস হাওয়া ফিসফাস

বাস্তুসাপের খয়েরি খোলসে
প্রতীকের মতো শীত এসে বসে
তারসে তামসে জীবন্ত যারা
তারা দিতে থাকে অলীক পাহারা
রক্তে ও বোধে মেশে অধ্যাস
হাওয়া ফিসফাস হাওয়া ফিসফাস

# তিনটি কবিতা

সৈয়দ সমিদুল আলম

## দূরত্ব

আমাকে চর্যাগান শোনানো হ'ল

আমি তার মুক্ত বিভায়
খুঁজে পেলুম
সময়ের স্তব্ধতা।

আসলে, দূরত্ব কোনো দূরত্বই নয়

অনন্ত অশ্রুর ভেতর আমাদের ভাষা শিশুচাঁদ হয়ে হাসে।

## জাগরণ

কোথায় বসে আছো, পাখি ?
দেখ'
অলস রোদের দিকে চেয়ে আছেন অমিত, নির্মল,অমর...
কি ভাবছেন ওঁরা
কি কি ভাবছেন ওঁরা
পাখি তুমি জানো ?

ধুলায় ধূসর এই মফঃস্বল শহর ধীরে, অতি ধীরে

জেগে উঠছে

## শূন্যতা

'সময় স্তব্ধ হলেই, গতিও স্তব্ধ হবে'
করুণা দত্ত বললেন, এবং
ফিরে গেলেন তাঁর—
'আমি ও আমার শূন্যে'
তখন সন্ধে
শূন্য আকাশের নিচে
নক্ষত্রের হিম আলোয়
দুলে উঠলো নৌকো

তখন সন্ধে
নিঃশব্দ গমন, জলসিঁড়ি আর ঘড়ির গোপন ডাকে
জেগে উঠলো
সময়ের শূন্যতা!

# বজ্রচমক

ঈশিতা ভাদুড়ী

ইচ্ছে ব্যাকুল  কাঁপছে শিরা  কানের লতি
এ যে কি ভীষণ আগুন!

মেঘ ডমরু  ঝড়ের রাত  বজ্রচমক
এ যে কি ভীষণ আগুন!

পলাশ লাল  রক্তে তুফান  ছদ্মম মন
এ যে কি ভীষণ আগুন!

# আগরতলার ছবি

দেবী রায়

শুধু পাতা ঝরার শব্দ আর পাখির ডাক
একটি ঘেয়ো কুকুর ধ্যান ভঙ্গীতে বসে
কী যে ভাবে!
নিস্তরঙ্গ দীঘি, পাড় বাঁধানো-ঈষৎ ভেঙ্গে
যাওয়া ঘাটের সিঁড়ি
নেমে গিয়েছে জলের বুকে!
অদূরে—গুটি কয় হাঁস
সপরিবারে ভেসে বেড়ায়
'জলে নেমেছি, জল মাখবো না' এ ভঙ্গিমায়
ছিলো রোদ!
রুদ্ধ বাতাস, এতোক্ষণ পরে কে তাকে
মুক্তি দিলো?
—জলে তার ঢেউ!
ঝকঝকে তকতকে নীল আকাশ ঢেউয়ে ঢেউয়ে
টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়
না কি, ভাসে?
দারুণ রৌদ্রে দীঘির জল রুপালি মাছের মতো
ঝিকিয়ে ওঠে
শুধু মন্ত্র নয়, তার কানে কানে ভেসে যাওয়ার—
সে মন্ত্রণা-ও দিতে জানে!

# ক্ষুধিত পাষাণ

বিপ্লব মাজী

কে যে কোথায় কি করে বসে ভূ-গোলকে বসে
একে একে দৃশ্য বদলে তোমার মৃত্যু সংবাদ, রটে যায়
সুদূর গাঁ-গঞ্জে, মফস্বলে

স্মৃতিতর্পণে
অনেকেই বাঁধিয়ে ফেলে ছবি ও কবিতা
ঝকঝকে ফ্রেমে, ফুরোয় না গল্পকথা আর
ফুরোয় না ভারতীয় কাহিনী বিস্তার, যেন সবকিছু আমরা
দেখছি টেলিসিরিয়ালে

এ-ভাবেই কথা থেকে কথা কল্পনার ফেভিকলে
কোলাজ শব্দগুলি ধীরে ধীরে লোকগাথা, গীতিকাব্যের
নায়ক যেন তুমি, তোমাকে কেন্দ্র করে ঘটছে যত অসম্ভব
উড়ছে যত দেবদূত ও পরী, এবং এ-ভাবেই
রূপকথার ভেতর প্রবেশ করেছি আমরা, জীবন্ত আগুনে তার
গা সেঁকেছি আর দৃশ্যগুলো বদলে গেছে চোখে টেনে রেখা

তুমি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে
একে একে তোমাকে পুজো দিতে চলেছে কবিরা
কিন্তু একজন তখনো করেনি বিশ্বাস তুমি মৃত আজ
সে তোমার শত্রুদলে, তবু ভালবেসে সামনে দাঁড়ায় এসে
উদ্ধত তরোয়ালে ছিঁড়ে ফেলে রূপকথার প্রাচীন প্রাকার
এবং ছুটিয়ে ঘোড়া চিৎকার করে বলে: ফুট হ্যায়, সব ফুট হ্যায়

তোমার মৃত্যু ঠিকরে পড়ে পাথরে পাথরে শীতের আর্তস্বরে
হৃৎপিণ্ড জ্বলে ওঠে চাঁদমালার মত বেদির ওপরে বড়ো একা
রূপকথা থেকে বেরিয়ে আমরা সবাই আসি অসুখী জীবনে
জীবনের গল্প এক তৈরি হয় তখন উপোসী মানুষের ঘরে ঘরে
অন্ধকার ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে তুমি খোঁজ নাও:
কোথায় সে ঘোড়সওয়ার? করেনি বিশ্বাস যে মৃত্যু ঘটে গেছে...

## পদক্ষেপ

চিরপ্রশান্ত বাগদী

দু-পা এগোলে পরে চার-পা পিছোতে হয়
অঙ্কের নিয়মে দাঁড়ায় এক থেকে শূন্য
শূন্য থেকে বিন্দুতে অবস্থান
বিন্দু অর্থে সূর্যালোকে প্রতিভাত এই জল
এই মাটি
এই ধুলো
সঞ্চরমান সমূহ অণু
এ-সব শ্রেয়কর ছিলো এইসব আগুনপ্রবাহ থেকে
শ্রেয়কর ছিলো এইসব শবদেহস্তূপ থেকে

মনস্বী ও পুরুষদের মতে, পরাজয় নিহিত
এই তত্ত্বের ভিতর
জীবন অর্থময়— যন্ত্রণায়, বিষপান, পেশীপ্রদর্শন,
আগুন কিংবা রক্তস্নানে
এবার চেষ্টিত আমি : চার-পা সামনে আর
দু-পা পিছনে...।

## শুকনো পাতা

শুভংকর পাত্র

আজ ভরা বসন্তের আকাশে আলো ফুটেছিলো সম্পূর্ণ অন্যরকম
—এরকম রহস্যময় নিবিড় আলোর স্ফুরণ আমি আগে কখনো দেখি নি

...দেখি নি ...না, দেখি নি ;
কীসের খোঁজে যেন...কীসের ? ...আমি আজ অতিশয় বিব্রত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে
এসে বসে ছিলাম নদীর ধারেই, বলা চলে যেন-বা জলেই,
একলা — কেন-যে আজ আমার এতো একলা মনে হলো !

জলের ধ্বনিতে, স্রোতের অভ্যন্তরে অসম্ভব মন-ভরানো গান ছিলো ;
আমি আমার সমস্ত অনুসন্ধানের কথা ভুলে গিয়ে
নিজের বিপজ্জনক অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে
ধুলোবালি ঝেড়ে একধরনের আনন্দেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম
—শুকনো পাতাগুলোই তবে আবার সব এমন গোলমাল করে দিলো ?

# বাজার স্বর্গ, বাজার ধর্ম, বাজারই... ?

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কথাটা হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র বলেছেন বলেই যে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত হয়ে ওঠার পর ইদানীং যিনি অস্বরীষ দাস নামে পরিচিত সেই আলফ্রেড ফোর্ড যখন তথাকথিত মুক্ত অর্থনীতির নিন্দা করেন, বলেন, ঐ নীতিই আমেরিকার ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশি, তখন একটু ভাবতে হয় বৈকি ? ভারতের আকাশ-বাতাস এখন মুক্ত অর্থনীতির জয়গানে মুখর, এই নীতির কল্যাণেই আমাদের সব মুশকিলের আসান হবে, এই বিশ্বাসই যখন ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তখন এমন বেসুরো কথাবার্তায় খটকা লাগতেই পারে।

খটকা অবশ্য কিছু দিন আগে থেকেই লাগতে শুরু করেছে। কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পরই প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বৈষয়িক নীতিই কি শাসক দলের এই ভরাডুবির কারণ ? অবশ্য এটা নিছকই প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। শাসক দলের নেতৃত্বের উপর রীতিমতো চাপ আসতে শুরু করেছে এই নীতি বদলের জন্য।

প্রায় একই সময়ে আমরা দেখলাম, দেশের তের জন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতির বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। এঁরা সাধারণভাবে বামপন্থী বলে পরিচিত, কিন্তু এই তালিকায় রয়েছে কে এন রাজ, অরুণ ঘোষ, অশোক মিত্র, প্রভাত পট্টনায়ক, সি টি কুরিয়েনের মতো বিশিষ্ট নাম।

এই সব ঘটনা থেকে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, নব্বই দশকের সূচনা থেকে আমাদের দেশে যে বৈষয়িক নীতি অনুসৃত হচ্ছে সে বিষয়ে সব বিতর্কের অবসান হয়নি, তা হলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। এর উত্তরে অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন, বিতর্ক আর কোথায় ? পশ্চিমবঙ্গে মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি যেমন, তেমনই কর্ণাটকে জনতা দল অথবা অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু দেশম তো এই নতুন নীতির সূত্র ধরেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চাইছে ? এই ধরনের মন্তব্যের মূলে যে সত্য রয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েও বলতেই হবে, নতুন নীতি নিয়ে সব প্রশ্নের অবসান হয়নি।

অর্থনীতির স্কুলপাঠ্য কেতাব যাঁরা পড়েছেন তাঁরাও জানেন, একটি দেশের সামনে বৈষয়িক উন্নয়নের সাধারণত দুটি পথ খোলা থাকে। একটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের পথ, যেখানে পরিকল্পনা রচনার থাকে বিশেষ ভূমিকা। আর দ্বিতীয়টি হলো বাজারনির্ভর উন্নয়নের পথ, যেখানে বাজারের চাহিদা যোগানই সব নীতির নির্ধারক, যেখানে রাষ্ট্র বা সরকার নামক 'বড় দাদার' খবরদারি নেই, যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মুখে লাগাম পরাবার প্রয়াসও নেই।

স্বাধীনতার পর আমরা যখন উন্নয়নের ছক তৈরি করতে বসলাম তখন প্রথমোক্ত পথটিই আমাদের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। উন্নয়নের সেই মডেল ''নেহরু মডেল'' নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনা রচনায় জওহরলাল নেহরুর গুরুত্বপূর্ণ দানের কথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হবে যে, এই মডেলের উপর এককভাবে নেহরু লেবেল লাগানো অনুচিত। স্বতন্ত্র পার্টির নেতাদের মতো কিছু লোকের কথা বাদ দিলে বলতে হবে, এই মডেল সাধারণভাবে সকলেরই অনুমোদন পেয়েছিল। এই মডেলের উৎস খুঁজতে আমাদের চলে যেতে হবে ১৯৩১ সালের করাচি কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব পর্যন্ত। সুভাষচন্দ্র বসুর স্বপ্নের ভারতেও যে মূলত এই ছকই অনুসৃত হতো তা তাঁর হরিপুরা কংগ্রেসের (১৯৩৮) সভাপতির ভাষণ ও অন্যান্য রচনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিকে বলা চলে পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বসূরী সেই কমিটি গঠন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলালকে কমিটির চেয়ারম্যানও করেছিলেন তিনিই।





বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার উদাহরণ যে আমাদের এই ছক অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

আশির দশক থেকে এই মডেলের যৌক্তিকতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। তার আগেও ওঠেনি তা নয়। কিন্তু ঐ সময় থেকে সরকারি নীতিতে শুরু হয় তার প্রতিফলন। ১৯৭৯ সালের শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে শুরু করে। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন এবং আরও স্পষ্ট করে নতুন পথে এগোতে শুরু করেন। রাজীবের অর্থমন্ত্রী হিসাবে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং প্রথম যে বাজেট পেশ করেন তা তথাকথিত মুক্ত দুনিয়ার যথেষ্ট প্রশংসা পায়। বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা ''ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'' এই প্রসঙ্গে যে সম্পাদকীয় লেখে তার শিরোনাম দেওয়া হয় ''রাজীব রেগন''। অস্যার্থ, রাজীব মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের আর্থিক নীতিই অনুসরণ করছেন এবং সেই জন্যই বাহবা তাঁর প্রাপ্য।

আশির দশক থেকে ভারতের নতুন পথের সন্ধানকে অবশ্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখা যায় না। এর একটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ছিল। ১৯৭৯ সালে ব্রিটেনে ক্ষমতায় এলেন কনজারভেটিভ দলের নেত্রী শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হন রিপাবলিকান দলের রোনাল্ড রেগন। এঁরা দু'জনে তাঁদের নিজ নিজ দেশে যে বৈষয়িক নীতি চালু করেন তার মূল কথা ছিল আরও বিনিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি ভূমিকা আরও খর্ব করা। মার্কিন মুলুকে অবশ্য কেউই কোনও দিন সমাজবাদ চালু করার চেষ্টা করেনি। এ দেশ যে বাজার-অর্থনীতির পীঠস্থান তা আমরা সকলেই জানি। তবু রিপাবলিকান দলের তুলনায় ডেমোক্র্যাটিক দল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারের বৃহত্তর ভূমিকার পক্ষপাতী। রেগন শুধু সেই ধারা উল্টে দিতেই চাননি, তিনি সরকারি ভূমিকাকে আরও খর্ব করেন, করের বোঝা কমিয়ে দিয়ে যে-নীতি চালু করেন তা পরিচিত হয় 'সাপ্লাই সাইড ইকনমিক্স' হিসাবে। রেগনের এই নীতির অন্য একটি নামও চালু হয় — রেগনোমিক্স্ অথবা রেগনবাদ।

ব্রিটেনে অবশ্য লেবার পার্টি রীতিমতো সমাজবাদে (যাকে তারা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলে থাকে) বিশ্বাসী ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশ কিছু দিন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তারা সেই নীতি প্রয়োগেরও চেষ্টা করে। শ্রীমতী থ্যাচার ক্ষমতায় এসে এই নীতির আমূল পরিবর্তন করে একেবারে উল্টো পথে চলতে শুরু করেন। শুধু বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করাই নয়, তাঁর নীতি অনুযায়ী শুরু হয়ে যায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ। শ্রীমতী থ্যাচারের নতুন পথেরও একটা নামকরণ হতে দেরি হয়নি, লোকমুখে এর পরিচিতি হয়ে যায় থ্যাচারিজম্ অথবা থ্যাচারবাদ। আতলান্তিক মহাসাগরের দুই পারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে একই সময়ে একই ধরনের নীতির প্রবর্তন এবং তার আপাত সাফল্য স্বাভাবিকভাবেই অন্যত্র প্রভাব ফেলতে শুরু করে।

প্রায় একই সময়ে চীনে সূচনা হয় নতুন বৈষয়িক নীতির। দেঙ জিয়াও পিঙের নেতৃত্বে শুরু হয় বিনিয়ন্ত্রণ এবং আমলাতন্ত্রের ফাঁস শিথিল করার উদ্যোগ। শুধু তাই নয়, দেশের কয়েকটি নির্বাচিত এলাকায় বিদেশি পুঁজির সাদর আবাহন। এই নতুন পথকে নাম দেওয়া হয় মার্কেট সোস্যালিজম্ অথবা বাজার নির্ভর সমাজবাদ। কেউ কেউ এই ব্যাপারটাকে সোনার পাথরবাটি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনার জায়গা এখানে নেই। আমরা শুধু লক্ষ করি যে চীন যখন এই নতুন পরীক্ষায় ধীরে ধীরে, পরিকল্পিত পথে এগোতে চেষ্টা করছে তখন আশির দশক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নেও বইতে শুরু করেছে নতুন অর্থনৈতিক হাওয়া, বিশেষত মিখাইল গর্বাচভের আবির্ভাবের পর থেকে। সেখানে চালু হয়ে গেছে গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকা প্রভৃতি শব্দ এবং সেগুলি শেষ পর্যন্ত নিছক শব্দ থাকেনি, বিশাল তরঙ্গের আকার ধারণ করে সমাজবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিত চুরমার করে দিয়ে গেছে। অন্য দিকে, পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে একের পর এক আমূল পরিবর্তন হয়ে উচ্ছেদ হয়েছে কমিউনিস্ট শাসনের। নাটকীয় ভাবে বার্লিনের প্রাচীর ভেঙে পড়ে কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানি মিশে গেছে পুঁজিবাদী পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে।

এই আলোড়িত আশির দশকের প্রভাব থেকে ভারত নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে, এমন আশা করা যায় না। বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজাত একটা বড় রকমের ধাক্কা হয়ে দেখা দেয়। এরই সঙ্গে ১৯৯১ সালের সূচনায় দেশে যে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয় তার ফলে নতুন ভাবনাচিন্তা জরুরি হয়ে পড়ে।

কিন্তু শুধুই আমরা নিজেরা আরও ভাবনাচিন্তা করেই যে এই নতুন পথে চলতে শুরু করি, এ-কথা বলা ঠিক হবে না। আরও কিছু আন্তর্জাতিক কারণ এর পিছনে ছিল। তার মধ্যে প্রধান অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আই এম এফ) এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপত্র। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বিশেষত বিদেশি মুদ্রার তীব্র সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য যেহেতু আমরা এই দুই প্রতিষ্ঠানের উপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল, তাই তাদের ব্যবস্থাপত্র মেনে চলা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না এবং সেই ব্যবস্থাপত্রের মূল কথা ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল এবং বেসরকারিকরণ।

অন্য একটি কথাও এখানে প্রাসঙ্গিক। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজবাদের প্রায়োগিক ব্যর্থতা যেমন আমাদের চোখের সামনে ছিল তেমনই উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশের সাফল্য, যারা বেসরকারি উদ্যোগের পথ ধরেই এই সাফল্য পেয়েছে। এই সাফল্যের প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণে আমরা আবার ফিরে আসব।

॥ দুই ॥

আমাদের দেশে আমরা স্বাধীনতার পর থেকে অর্থনৈতিক বিকাশের যে ধারা অনুসরণের চেষ্টা করেছি তাকে আর যাই হোক সমাজবাদ বলা যায় না। জওহরলাল নেহরুর আমলে আবাদি কংগ্রেসে যে-পথ গৃহীত হয় তার নাম ছিল 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ'। আমরা বেসরকারি উদ্যোগের বিলোপ মোটেই ঘটাইনি, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের পাশাপাশি তা রীতিমতো বজায় থেকেছে। আমরা পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ বেছে নিলেও ষাটের দশকে তৃতীয় পাঁচসালা যোজনার পর থেকে সেই ছক অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে যায় এবং বেশ কয়েক বছর যোজনা রচনাকে 'ছুটি'ও দেওয়া হয়। যোজনা এখনও কাগজে-কলমে রচিত হয়, যোজনা কমিশনও আছে, কিন্তু যোজনার গুরুত্ব ক্রমশই কমে এসেছে।

তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, দেশের বৈষয়িক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা কিছু ছিল না। রীতিমতোই ছিল এবং সেই ভূমিকা ছিল প্রধানত নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মাধ্যমে। এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার জন্যই প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন রাজনীতিক এবং আমলারা। এর ফলেই জন্ম হয় তথাকথিত লাইসেন্স-পারমিট ''রাজের'' এবং এই ''রাজের'' থেকেই জন্ম হয় এক বিশেষ ধরনের দুর্নীতির। এই ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করত তার মোটামুটি একটা বিবরণ পাওয়া যাবে এক বিদেশিক লেখকের বইয়ে। ''পোলিটিক্যাল ইকনমি অব ইন্ডিয়া'' গ্রন্থে আর্থার পি লিউইস সেই ছবি এঁকেছেন। গুন্নার মিরডালের ''এশিয়ান ড্রামা'' গ্রন্থেও এই প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

স্বাধীনতার পর থেকে আমরা যে অর্থনৈতিক পথের পথিক হতে সচেষ্ট হয়েছি তা আমাদের দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়নি, এ-কথা প্রমাণের জন্য এখানে খুব বেশি সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সরকারি নিয়ন্ত্রণ যেমন এক দিকে হয়ে ওঠে দুর্নীতির উর্বর উৎসভূমি, তেমনই রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে করে তোলে অপদার্থতার আড়ত। হয়ত কথাটা স্ববিরোধী শোনাবে, কিন্তু এই আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণই আবার বেসরকারি উদ্যোগকে এনে দেয় বেশ কিছু সুযোগ। যেমন, আমদানি এবং বিদেশি পুঁজি-র উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে যাওয়ায় শিল্পপতিরা দেশের বাজারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যান। ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতা অথবা পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির ব্যাপারটি নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে হয় নি (এদেশে তৈরি মোটর গাড়ি তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ)। দ্বিতীয়ত, অন্তত এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী শিল্পপতি তথাকথিত ''লাইসেন্স-পারমিট রাজের'' দীর্ঘায়ুই কামনা করেছেন। কারণ তাঁরা এই ''রাজকে'' কাজে লাগিয়ে কীভাবে আখের গুছোতে হয় সেই কৌশল রপ্ত করে ফেলেছেন। সুতরাং এই ''রাজের'' অবসান তাঁরা চাননি। তা ছাড়া অনেকে তো সরাসরি লাইসেন্স-পারমিট বিক্রি করেই প্রচুর মুনাফা ঘরে তুলেছেন। আরও একটি ক্ষেত্রে এই লাইসেন্স পারমিট রাজের অশুভ প্রভাব পড়েছে। সেটি হলো কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক। লাইসেন্স-পারমিট মঞ্জুরের প্রধান ক্ষমতা যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের তাই এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দিল্লির শাসকেরা অনেক সময়েই কোনও কোনও রাজ্যের বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছেন, এমন কি ক্ষতিও করতে চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ তার অন্যতম উদাহরণ। সামগ্রিকভাবে পূর্ব ভারতই এই বৈষম্যের বলি হয়েছে।

সুতরাং সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা অথবা ''লাইসেন্স-পারমিট রাজের'' নামে যা চলে আসছিল তার অবসানের জন্য উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল এবং আছে। নিজেদের এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকেই সেই উদ্যোগের সমর্থন মিলবে। প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্ন হলো, সরকারি অথবা রাষ্ট্রীয় বজ্রমুষ্টি শিথিল করতে গিয়ে আমরা কি একেবারে এক শ' আশি ডিগ্রি উল্টে গিয়ে অন্য পথে হাঁটতে শুরু করব ? রাষ্ট্র-নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে গিয়ে আমরা কি একেবারেই বাজার-নির্ভর হয়ে উঠব, বাজারই হয়ে উঠবে আমাদের স্বর্গ, আমাদের ধর্ম, আমাদের পরম তপস্যার বস্তু ? এ-বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কী বলে তা আমাদের কি ভেবে দেখতে হবে না ?

এই ধরনের প্রশ্ন ওঠার কারণ, দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ এ পর্যন্ত যে গতিতে চলছে তাতে অনেকেই সন্তুষ্ট নন, তাঁরা চাইছেন ব্যাপকতর সংস্কার, দ্রুততর সংস্কার। এই চাওয়ার অর্থ সরকার অথবা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খর্ব করে আরও বাজার-নির্ভর হয়ে ওঠা।

॥ তিন ॥

বাজারের উপর নির্ভর করে একটি দেশের বৈষয়িক ব্যবস্থাকে কতটা এবং কীভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। এখানে সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান নেই। ঐতিহাসিক নজির দিয়ে আলোচনা না করে আমরা সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার দিকে নজর দিয়ে দেখতে পারি, সম্পূর্ণ বাজার-নির্ভর হয়ে ওঠা আদৌ সম্ভব কিনা এবং তা হতে গেলে কী ফল পাওয়া যেতে পারে।



সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বাজার-নির্ভর অর্থনীতিই যদি সব মুশকিল আসান করতে পারে তবে যে-সব দেশ এই পথে চলছে সেখানে সব সঙ্কটের মীমাংসা হয়নি কেন, সমৃদ্ধি যদি এসে থাকে তবে তা সমাজের সব স্তরকে স্পর্শ করেনি কেন ? পঞ্চাশের দশকে কমিউনিজমের যখন বাড়বাড়ন্ত চলছে তখনই একদল বুদ্ধিজীবী রায় দিয়েছিলেন যে, মতবাদ অথবা দর্শন হিসাবে কমিউনিজম ব্যর্থ হয়েছে। কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁদের রায় ছিল : ''গড দ্যাট ফেইল্ড্''। শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচারের উদ্যোগে ব্রিটেনে যে নতুন দক্ষিণপন্থী নীতি চালু হয় সে বিষয়েও মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এর অধ্যাপক ডেভিড পিয়াসড নতুন নীতির ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে একটি নিবন্ধ লেখেন, তার শিরোনাম ছিল ''দা নিউ গড দ্যাট ফেইল্ড''। এই নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে মার্গারেট থ্যাচারের জমানায় দরিদ্রের সংখ্যা এবং দারিদ্র্য বেড়েছে ব্রিটেনে অথচ ঐ সময় দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ দ্রুততর হয়েছে। (এ-কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভারতে ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি যখন অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা হচ্ছে সেই সময়েই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়।)

হিসাবপত্র থেকেই এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীমতী থ্যাচারের নতুন নীতি চালু হওয়ার পর থেকে ব্রিটেনে যে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে তার অর্ধেকের বেশি হস্তগত হয়েছে সমাজের সবচেয়ে উপরের স্তরের ১৫ শতাংশ মানুষের। সবার নিচে যে দশ শতাংশের অবস্থান তারা হয়েছে আরও গরিব। আতলান্তিকের অপর পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাও কিছু অন্য রকম নয়। সমাজের সবচেয়ে উপরের সিকি ভাগ আরও ধনী হয়েছেন, তাঁদের হাতে রয়েছে দেশের মোট সম্পদের অর্ধেকের বেশি। তার পরের সিকি ভাগের হাতে রয়েছে ২৬ শতাংশ। বাকি যারা পড়ে রইল, অর্থাৎ দেশের অর্ধেক মানুষের ভাগে পড়ছে মাত্র সাড়ে বাইশ শতাংশ। (ইকনমিক টাইমস, ২২ জানুয়ারি ১৯৯৫)

খোলা বাজারের অর্থনীতির যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা অবশ্য এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, সামগ্রিকভাবে দেশের যদি উন্নয়ন ঘটে তবে তার সুফল নিচের তলাতেও এসে পৌঁছবে ; বিশেষ করে নিচের তলার মানুষের জন্য সরকার বা রাষ্ট্রের কিছু করার প্রয়োজন নেই। অথচ বাস্তবে যে তা ঘটে না আমরা উপরের হিসাব থেকেই বুঝতে পারছি। এই নীতির যাঁরা সমালোচক তাঁদের মধ্যে আছেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গলব্রেথ। তিনি এই প্রসঙ্গে একটা মজার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ যেন অনেকটা ঘোড়াকে বেশি করে ছোলা খাইয়ে এই আশায় বসে থাকা যে ঘোড়ার বিষ্ঠা থেকে কিছু বাড়তি ছোলা মিলবে !

আমাদের দেশে নতুন নীতির বয়স যেহেতু এখনও চার বছরও হয়নি, তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে তার কী প্রভাব পড়েছে সে বিষয়ে চূড়ান্ত রায় দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। উন্নয়নের হার উর্ধ্বমুখী হয়েছে বটে কিন্তু তা এখনও আশির দশকের হারের চেয়ে বেশি হয়নি। বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় বেড়েছে, কিন্তু উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে মূল্যবৃদ্ধির হার। দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর আর্থিক সংস্কারের অভিঘাত নিয়ে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার যে বিবরণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তাতে অন্তত উৎসাহিত হওয়ার মতো বিশেষ কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত পাঁচ বছরে কৃষি মজুরদের ক্ষেত্রে ক্রেতামূল্যসূচক ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে যে চাল ও গম দেওয়া হয় গত তিন-চার বছরে তার দাম বেড়েছে যথাক্রমে একশ এবং ৭৫ শতাংশ। কৃষি মজুরদের ক্ষেত্রে মাথা পিছু খাদ্যশস্যের প্রাপ্তির পরিমাণও কমে গেছে।

দারিদ্র্য কী এবং কীভাবেই বা তার পরিমাপ করা হবে সে বিষয়ে আলোচনার স্থান এখানে নেই। উৎসাহী পাঠক নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের রচনাবলীর কথা জানেন এবং প্রয়োজনে তাঁর ''ইনইকোয়ালিটি রিএগজামিন্ড্'' উল্টে-পাল্টে দেখে নিতে পারেন। কিন্তু দারিদ্র্যের যে মাপকাঠিই আমরা মেনে নিই না কেন তাতে দারিদ্র্যমোচনের ক্ষেত্রে নতুন নীতির সম্ভাব্য অভিঘাত বিশ্লেষণে ব্যাঘাত হওয়ার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা একাধিক সতর্কবাণীর কথা স্মরণ করতে পারি। সংস্কার উদ্যোগের প্রায় সূচনা পর্বেই বিশ্ব ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে (১৯৯২) এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে, নতুন নীতির ফলে ভারতের গরিব মানুষেরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। প্রায় একই সময়ে বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্মেলন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার রিপোর্টেও উচ্চারিত হয়েছিল একই ধরনের আশঙ্কার কথা। অবশ্যই এরা কেউই মূল নীতির বিরোধিতা করেনি, করতে পারেও না, কিন্তু যেভাবে সেই নীতি রূপায়িত হচ্ছে তার ফল নিয়েই ছিল তাদের উদ্বেগ।

এই প্রসঙ্গে আমরা লন্ডনের সাপ্তাহিক 'দা ইকনমিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত (মে, ১৯৯৩) একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করতে পারি। আই এম এফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করতে গিয়ে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের কী অবস্থা হয়েছে, ঐ প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় ছিল তাই। ''দা ইকনমিস্ট'' পত্রিকাকে নিশ্চয়ই কেউ বামপন্থী বলবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এই সাপ্তাহিকটি বিশ্বজুড়ে বিনিয়ন্ত্রণ ও বেসরকারিকরণের উৎসাহী সমর্থক। জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া

ইত্যাদি দেশের অভিজ্ঞতার কথা বিশ্লেষণ করে ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আই এম এফ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে ঐ সব দেশের শুধু মোহভঙ্গই হয়নি, সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে রীতিমতো বিরোধিতা। কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল আরাপ মই বলেছেন, আই এম এফ হলো স্বেচ্ছাচারী, তাদের নির্ধারিত নীতি কেনিয়ার পক্ষে আত্মঘাতী। জাম্বিয়ার প্রধান খাদ্য ভুট্টার দাম বেড়ে যাচ্ছে বলে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত। জিম্বাবুয়ের মাতা-পিতার অভিযোগ, স্কুল-কলেজের নতুন যে ফি নির্ধারিত হয়েছে তা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। ইথিওপিয়ার সরকারি চাকুরেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে চাকরি যাওয়ার ভয়ে। ব্রিটেনের বিখ্যাত ত্রাণ সংস্থা অক্সফ্যাম তাদের রিপোর্টে বলেছে যে, আর্থিক সংস্কারের নীতির ফলে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের হার বাড়েনি, দারিদ্র্যও হ্রাস পায়নি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টেও নতুন নীতির ব্যর্থতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে বলা হয়েছে, মূল নীতিতে ভুল নেই, ত্রুটি সেই নীতির রূপায়ণে। এই মন্তব্য প্রসঙ্গে ''দা ইকনমিস্ট'' পত্রিকার অভিমত উল্লেখযোগ্য: ''কমিউনিজমের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে কমিউনিস্টরাও একই কথা বলে থাকে!''

সম্প্রতি মেক্সিকোর অর্থনৈতিক সঙ্কট নতুন আর্থিক নীতির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সাহায্য করেছে বেশ কিছুটা। ত্রয়োদশ অর্থনীতিবিদদের বিবৃতিতেও স্থান পেয়েছে মেক্সিকোর অভিজ্ঞতার কথা। মেক্সিকোর উদাহরণ ভারতের পক্ষে কতটা প্রযোজ্য সে-বিষয়ে সব বিশেষজ্ঞ যে একমত তা অবশ্য নয়। জগদীশ ভগবতী অন্তত মনে করেন যে, মেক্সিকোর উদাহরণ থেকে ভারতের ভীত হওয়ার কিছু নেই। বিদেশি মুদ্রার যে-সঙ্কট মেক্সিকোর বিপর্যয় ডেকে এনেছে তা আমরা আপাতত এড়াতে পেরেছি বলে অধ্যাপক ভগবতী মনে করেন। কিন্তু বিপুল পরিমাণ বাজেট ঘাটতি মেক্সিকোর সঙ্কটের কম বড় কারণ নয়। এই দিক থেকে ভারত এবং মেক্সিকো কিন্তু একই দোষে দোষী। মেক্সিকোর সঙ্গে ভারতের অবস্থার মিল-অমিল যাই থাক, এ-কথাটা পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথ ধরে এগোলেও যে-কোন সময়ে সঙ্কট দেখা দিতে পারে— আমেরিকা মহাদেশের ঐ দেশটির উদাহরণ থেকে আমরা এই শিক্ষা অন্তত নিতে পারি।

সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবী নানা দেশের অভিজ্ঞতার উল্লেখ এই কারণেই করা হচ্ছে যাতে আমরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারি; আর্থিক সংস্কারের নীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য এই আলোচনা নয়। কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে আর্থিক সংস্কার, বিনিয়ন্ত্রণ ও বেসরকারিকরণের নীতি যে প্রার্থিত ফল দিতে পারেনি তা আমরা দেখেছি। যে-সব দেশের সাফল্যের উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে তাদের নীতির বিশ্লেষণে অতঃপর আমরা অগ্রসর হতে পারি।

॥ চার ॥

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলে পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথ ধরে অগ্রসর হলে কত দ্রুত, ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যেতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। চলতি কথায় তাদের নামকরণ করা হয়েছে ''এশিয়ার বাঘ'' হিসাবে। তাদের অনুসরণ করতে এখন প্রায় সকলেই উৎসাহী। ভারতও এক দিন এমন একটি ''বাঘ'' হয়ে উঠতে পারে বলে আমরা মাঝে-মাঝে শুনতে পাই। অবশ্য তার আগে থেকেই অর্থনৈতিক সাফল্যের উদাহরণ হিসাবে জাপানের নামও উল্লেখিত হয়ে আসছে।

এশিয়ার ঐ কয়েকটি ছোট দেশ কী করে এমন দ্রুত উন্নতি করল তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ হচ্ছে যথেষ্ট। অধ্যাপক অমিয়কুমার বাগচি সম্প্রতি তাঁর পি সি সেন স্মারক বক্তৃতার বিষয়বস্তু হিসাবে এই বিষয়টিকেই বেছে নিয়েছিলেন। অধ্যাপক বাগচির বক্তৃতাটি এই কারণে আগ্রহী সকলের অবশ্যপাঠ্য, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক জাগরণ নিয়ে অনেক ভুল ধারণার তিনি অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। সংক্ষেপে সেগুলিকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি:

এক: সাধারণভাবে পুঁজিবাদী পথ ধরে এগোতে চাইলেও ঐ দেশগুলি সব কিছু বাজারের চাহিদা-যোগানের উপর ছেড়ে দেয়নি। শিল্পনীতি নির্ধারণে, ঋণ নীতি নিয়ন্ত্রণে, প্রয়োগবিদ্যার আমদানি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্র বা সরকার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে এসেছে।

দুই: ঐ সব দেশ আমেরিকা ও অন্যান্য ধনী দেশ থেকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য চেয়েছে এবং নিয়েছে, কিন্তু নিজের দেশে সরাসরি বিদেশি অর্থলগ্নি কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং স্বদেশি কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যাতে বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে চলে না যায় সেদিকে নিয়মিত লক্ষ রাখার ব্যবস্থা করেছে।

তিন: অর্থনৈতিক বিপ্লবের আগে অথবা তারই সঙ্গে সামাজিক বিপ্লব সংঘটনেরও চেষ্টা হয়েছে ঐ সব দেশে, জমিদার শ্রেণীর বিলুপ্তি, চাষিদের জমি যাতে বেদখল হয়ে না যায় তার ব্যবস্থা করা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যূনতম স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমেই এই সামাজিক বিপ্লব ঘটানোর প্রয়াস চালানো হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাফল্যের কথায় আমরা যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি তখন অধ্যাপক বাগচির উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমরা অনেকেই ভুলে যাই। আমরা এ-কথাও সব সময়ে মনে রাখি না যে, ঐ সব দেশ সামগ্রিক



অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে আয়ের সমবণ্টনের উপরেও জোর দিয়েছে। বেকারের আনুপাতিক সংখ্যা ঐ সব দেশে তুলনায় অনেক কম এবং আয়বৃদ্ধির সুযোগও অধিকাংশের সামনেই আছে।

এখানে জাপানের সাফল্যের উদাহরণের একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন বলে মনে হয়। জাপান যে শুধু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে বিসর্জন দেয়নি তা-ই নয়, অর্থনৈতিক বিকাশের কাজে রাষ্ট্রকে দিয়েছে বিশেষ ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় যে জাপানের শিল্পায়ন এবং চমকপ্রদ রপ্তানি বৃদ্ধিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে এসেছে তা কিছু গোপন কথা নয়। কিন্তু সেই ভূমিকা আমলাতান্ত্রিক ফাঁস হয়ে শিল্প বা বাণিজ্যের গলা টিপে ধরেনি, বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের বিকাশে সাহায্য করেছে। সেই সঙ্গে জাপান আরও দুটি কাজ করেছে। নিজের দেশের গবেষণা ও উন্নয়নে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছে এবং জাগিয়ে রেখেছে জাতীয়তাবোধ।

বৈষয়িক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা যে রীতিমতোই থাকতে পারে তার স্বীকৃতি মিলবে বিশ্ব ব্যাঙ্কেরই একটি বার্ষিক রিপোর্টে (১৯৯১)। ঐ রিপোর্টে খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, প্রশ্নটা রাষ্ট্র বা বাজার কোনও একটাকে বেছে নেওয়ার নয়। দুটিরই রয়েছে অনিবার্য ভূমিকা। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক। একটি দেশের নীতি-নির্ধারকদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, রাষ্ট্র ও বাজারের পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকাকে ঠিকমতো কাজে লাগানো। এই প্রসঙ্গেই ঐ রিপোর্টে এসেছে জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ এবং সেখানে বলা হয়েছে খোলা বাজার এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সঠিক মিশ্রণই ডেকে এনেছে এই সাফল্য।

সুতরাং আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে যারা আরও দ্রুত বেসরকারিকরণ চাইছেন, চাইছেন রাষ্ট্রের ভূমিকাকে আরও খর্ব করে বাজারের চাহিদা-যোগানের উপর আরও বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে উঠতে, তাঁরা নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকেই সামনের দিকে এগোতে চাইবেন। আমলাতান্ত্রিক নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে গিয়ে আমরা নিশ্চয় এমন বিকল্প পথ নিতে পারি না যেখানে কিছু লোক লুটেপুটে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নটি থেকে যাবে উপেক্ষিত।

# অপহরণ

## রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সন্ধে ছ'টা পনের মিনিটে জানা গেল দেড় দিনের শিশুটি চুরি গেছে। বেসামাল সরকারি হাসপাতাল থেকে নয়, অপহরণ করা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত নার্সিং হোম থেকে। ষোল হাজারি নিরাপত্তার জ্যাকেট ভেদ করে তের নম্বর কেবিনের শিশুটি পাচার হয়ে গেছে। ষোল হাজারের মধ্যে সমস্ত রকম নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ছিল— গাইনির কাঁচি শিশুর পায়ে কামড় দেবে না, স্টিচ পেটের চামড়াকে খামচে ধরবে না, এইড্‌সের জীবাণু ঢুকবে না ঐ নারী কিংবা শিশুর শরীরে। কথা ছিল রাত্রে বা দিনে শিশুর চিৎকার প্রসূতিকে উত্যক্ত করবে না। প্রসূতি বা শিশুর ওষুধ কিংবা রক্তের জন্য হাসব্যান্ড কিংবা বাড়ির অন্যান্য লোকদের ছোটাছুটি করতে হবে না। উদ্বিগ্ন সিগারেটে টান দিতে দিতে লেবার রুমের সর্বশেষ সংবাদের জন্য পাক খেতে হবে না। দারোয়ানের হাতে টিপস গুঁজে দিয়ে খুচরো খবরের প্রতীক্ষা করতে হবে না। তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না কখন সন্টু ওপর থেকে ফিরে মন্টুকে কার্ড দেবে। পিসিমা, নাতনির খবর নিতে গিয়ে, নিজের তেরটি সন্তানের জন্ম-ইতিহাস শুনিয়ে কখন নিচে ফিরবেন তার অপেক্ষা থাকবে না। ষোল হাজারে অনেক কথা দেওয়া ছিল— নার্স ছুটে আসবে মুখের কথা খসলে, সিজারের সমস্ত ঝক্কির পরেও ডাক্তারের মুখে ভেসে থাকবে হাসি, রিসেপসনিস্টের গলায় ফুটে উঠবে রেওয়াজি মধুর স্বর।

সবই মিলেছে। শুধু হারিয়ে গেছে সুমিতা-অনুপ চ্যাটার্জির শিশুটি। শিশুটির জন্মের সংবাদ টেলিফোনে পৌঁছে গিয়েছিল অনেকের কাছেই। সুমিতার বাবা-মা এসেছিলেন। সুমিতার কাকা-কাকিমা এসেছিলেন। এসেছিলেন অনুপের জ্যাঠাইমা এবং তাঁর ছেলে। খবর গিয়েছিল অনুপের মা-বাবার কাছে দুর্গাপুরে। এসেছিল অনুপের কিছু সুদূর আত্মীয়-আত্মীয়া। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হলে এরকম কিছু প্রশাখার আপনজন তিনপুরুষ আগের স্মৃতি-রোমন্থনে মাতে। তারা অতীতের গিঁট দিয়ে বর্তমানের সুতোকে শক্ত করে বাঁধতে চায়। কেউ ভাবে পিসতুতো দাদার খুড়তুতো আই.এ.এস. ভাইয়ের কলমের আঁচড়ে নেপা হগ মার্কেটের লাল বাড়িতে চেয়ার পেয়ে যাবে। কারও আশা জেঠ্‌তুতো দাদার শালা লালবাজারে ফোন করলে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। কেউ এটুকুই দাবি নিয়ে আসে যে তার মেয়ের বিয়ের ফাইন্যালের দিন আই.এ.এস. অনুপ উপস্থিত থাকবে। বংশ পরিচয়, বিয়ের বাজারে, খুব কাজে লাগে। আবার কারো কারো উপস্থিতি নেহাৎই নিষ্কাম। দুর্গাপুরে একবাড়িতে ভাড়া থাকত। কেউ ছিল অনুপের মেস-মেট। তাদেরই আনা নানা উপহার আয়ার জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চ জুড়ে সাজানো ছিল। ছিল শুভেচ্ছাবার্তাও। দিল্লি থেকে অনুপ ফ্যাক্স মেসেজ পাঠিয়েছে। তিন কোটি টাকার গ্রান্ট সাড়ে তিন দিনে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। কালই কলকাতায় ফিরবে প্রাইভেট এয়ারলাইন্সে।

তার আগেই শিশুটি হারিয়ে গেল।

নার্সিং হোমের এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার মিস্টার দত্ত অবসরপ্রাপ্ত মেজর। প্রশাসনে দক্ষ। জানেন এই শিশু অপহরণের প্রতিক্রিয়া কতখানি। খবরের কাগজগুলি ছুটে আসবে। ওয়ার্ল্ড কাপের পর খবর বাড়ন্ত। নির্বাচন কমিশনার ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত। মিস ইউনিভার্স টিভি স্ক্রিনের বাইরে চলে গেছে। যুবনেত্রী এবং যুবনেতারা উপস্থিত খেলা আর নানা উৎসবে ব্যস্ত। প্লেন ঝরে পড়ছে না। ইন্দ্রপতন ঘটছে না। নেতিয়ে গেছে খবরের কাগজগুলো। নার্সিং হোমে শিশু অপহরণের





ঘটনায় মুহূর্তে ছুটে আসবে। নেতিয়ে পরা শরীর তাতিয়ে নেবে। সুমিতা বারবার বলা সত্ত্বেও মিস্টার দত্ত ঘটনাটা অনুপকে জানান না। হয়ত সামান্য চাপ দিলে এই ফ্লোরেই মিলে যাবে শিশুটি।

মেলে না। ধমকে মেলে না। কাজ চলে যাবে সে ভয়েও মেলে না। তের নম্বর কেবিনের আয়া শেফালীর স্বরগ্রামটি শুধু চড়ে। কেবিনে দিদিমণির বাড়ির লোকজন আছে দেখে কাপড়চোপড় কাচতে গিয়েছিল। দিদিমণি গিয়েছিলেন বাড়ির লোকজনদের খানিক এগিয়ে দিতে। সেই ফাঁকে...। শেফালী কান্না জোড়ে।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয় নার্সিং হোমের সমস্ত ফ্লোর। ডাস্টবিন ওল্টানো হয়। ডেটল ক্রিমের ফাঁকা টিউব, স্যানিটারী ন্যাপকিনের খালি প্যাকেট, চল্লিশ সেন্টিমিটারের ইনফ্যান্ট ফিডিং টিউব, রেক্টিফায়েড স্পিরিটের শিশি, ক্রমিক জনসনের '০' নম্বরের ক্যাডগাট, ড্যাবসিলক্স এবং রেরিক্যাপের খালি স্ট্রিপ, ভি.ডি.আর.এল.-এর রিপোর্ট— এসব ছড়িয়ে পড়ে।

সব আছে, শিশুটি নেই।

খবর দেওয়া হয় অনুপকে। পাঁচ-মিনিটের ভেতর লালবাজারে ঝনঝন করে ওঠে টেলিফোন। রিলে পদ্ধতিতে বেল বেজে যেতেই থাকে। অবশেষে লোকাল থানা। আই.এ.এস. অফিসারের কেস। আই.এ.এস. অফিসারের মাল চুরি গেছে। কী চুরি গেছে তখনও সবার কাছে স্পষ্ট নয়। জরুরিও নয়। তিনটি অক্ষরই যথেষ্ট— আই.এ.এস.। অন্য কিছু জুড়ে দিলে যেন শব্দদূষণ ঘটে যাবে। লঘু হয়ে যাবে কেসের ঘনত্ব। প্রতিমুহূর্তে কত কিছুই হারিয়ে যাচ্ছে। কতকিছুই চুরি যাচ্ছে। সে সবের মতো এচুরিও সাধারণ হয়ে যাবে। কী চুরি হল এবং কত দাম তার — এ হিসাবের গুরুত্ব কতটুকু? ব্রিফকেস, হাতঘড়ি এবং ছাগল সে সবও অমূল্য হয়ে যেতে পারে ব্যক্তি বিশেষের পদের কারণে। আই.এ.এস. অফিসার অনুপ চ্যাটার্জির চুরির কেস। এটাই জরুরি, এটাই জরুরি অবস্থা।

ফল-অন করানো হয় আটচল্লিশজন আয়াকে। তাদের মুখোমুখি নার্সিং হোমের মালিক চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য। আগে নামের পাশে বি.এস.সি. (বায়ো) লেখা থাকত। তখন প্যাথলজিকাল ল্যাব চালাতেন। নার্সিং হোম করার পর ডিগ্রি তুলে দিয়েছেন। চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার দত্ত, মেজর (রিটায়ার্ড)। নার্সিং হোমের লেটার প্যাডের নিচে এরকমই তথ্যসমৃদ্ধ রাবার স্ট্যাম্প। ওপরে নার্সিং হোম-এর 'হোম' এবং নিচে মিস্টার দত্তের 'মেজর (রিটায়ার্ড)'— এ দুয়ের ভেতর যেন গৃহের সুখ এবং দুর্গের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি থাকে।

সবকিছু থেকেও কিছুই নেই। শিশুটি হারিয়ে গেছে।

আটচল্লিশজন আয়ার শরীরে হালকা নীল পাড়ের সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ গায়ে। যেন আটচল্লিশজন যুদ্ধবন্দী। তাদের সামনে মেজর (রিটায়ার্ড) দত্ত এবং প্রোপাইটার ভট্টাচার্য, তাদের দুপাশে পিস্তলধারী চার অফিসার, তাদের পেছনে বন্দুকধারী ছজন পুলিশ।

সুমিতার হুইল চেয়ারটিকে গড়িয়ে আনে দুই নার্স। তাদের পেছনে স্টেথো-গলায় দুই ডাক্তার। জরুরি অবস্থার সমস্ত বন্দোবস্ত। সুমিতা চিনিয়ে দেবে গত চারদিনে, তার নির্দিষ্ট আয়ারা ছাড়া, কে বা কারা ঢুকেছিল তার কেবিনে। এক কাঁপে, দুই কাঁপে — কাঁপে পুরো আটচল্লিশ। যদি ভুল করে দেখিয়ে দেয় তাকে? জেল গরাদে বাস, চাকরি থেকে বাদ। দিনের দিন পঁচিশ টাকা রোজগার বন্ধ। ক্যানিং-এর নমিতার বুকের ভেতর ঢেউয়ের উথালপাথাল। মনসাদ্বীপের চামেলির কপালের ওপর জলদেবীর ফণা। সন্দেশখালির পিয়াসীর কানে বাঘের হুংকার। চেতলার ছ' নম্বর বস্তির দীপুর মায়ের মনের উঠোনে বোমাবাজি। কসবার আঙুরমাসি দ্বিতীয় ছেলের লাশের প্রতীক্ষা করে। হুইলচেয়ার গড়ায়। হুইল চেয়ার থামে। যেখানে থামে তার কাছাকাছি মুখের চাঁই বিবর্ণ হয়ে যায়। সুমিতার আঙুল, মেজর (রিটায়ার্ড) দত্তের চোখ, চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্যের ভুরু, পুলিশ অফিসারদের হুড-দেওয়া টুপি আর পিস্তল এবং সাধারণ পুলিশদের বন্দুক — সব মিলে এক ফায়ারিং স্কোয়াড।

হুইল চেয়ার গড়ায় আর আটচল্লিশের সমবেত আতঙ্ক থেকে খসে যেতে থাকে এক একটা শরীর। আতঙ্কের সমবেত শরীর থেকে একটি একটি করে আনন্দের শরীর বেরিয়ে আসতে থাকে। আটচল্লিশটা শরীর তখন আতঙ্ক আর আনন্দের দুই স্পষ্ট সীমারেখায় বিভাজিত। সুমিতার আঙুলের ছুরিতে আইসক্রিম বার-এর জমাট শীতল শরীর থেকে আনন্দের খণ্ডগুলি খসে যেতে থাকে। খসে যায় সমস্ত শরীর। সুমিতা, পুলিশ অফিসার, নার্সিং হোমের কর্মকর্তাদের সমবেত আতঙ্কের বিপরীতে আটচল্লিশটা আনন্দের, আটচল্লিশটা খুশির মুখ। হুইলচেয়ার ঘোরে। আবার ফিরবে মুখ খুঁজতে খুঁজতে। খুশির আটচল্লিশটা মুখ আবার সমবেত আতঙ্কে জমাট বাঁধে। হুইল চেয়ার গড়ায়। হুইল চেয়ার গড়িয়ে চলে। হুইল চেয়ার শেষ আয়াটিকে পেরিয়ে যায়। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে সুমিতা।

পরের দিন অনুপ ফেরে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা নার্সিং হোম। পুলিশ জানায় ওদের প্রাথমিক তদন্ত শেষ। শিশুটি নার্সিং হোমে নেই। তদন্তের গণ্ডী বিস্তৃত করতে হবে। ক্লু দরকার। কে চুরি করতে পারে এবং কেন? অনুপ সুমিতার সঙ্গে আলোচনায় বসে। কে বা কারা দু-পরিবারের শত্রু হতে পারে। সুমিতাদের কলেজের সহকর্মীদের কাউকে তেমন সন্দেহ হয় না। মতভেদ ঘটেছে নানা সময়ে কারো কারো সঙ্গে কিন্তু তাঁরা কেউ এ কাজ করবেন না। শিক্ষাজগতের মানুষ। কেউ

পড়ানো, কেউ গবেষণা, কেউ বক্তৃতা দেওয়া, কেউ নোটবই লেখা, কেউ বা টিউটোরিয়াল হোম নিয়ে ব্যস্ত। শিশুচুরির ঘটনায় জড়াবেন না তাঁরা। অনুপ ইতিমধ্যে বার তিনেক বদলি হয়েছে। মতবিরোধ ঘটেছে কারো কারো সঙ্গে। কিন্তু যে স্তরে অনুপের মেলামেশা সেখানে এক-দুয়ের কোন ব্যাপার নেই। তাদের কাজকর্ম লক্ষ মানুষের ভালমন্দ নিয়ে। একটি শিশু চুরি তাদের কাছে দশ হাজার টাকা সরিয়ে ফেলার মতোই হাস্যকর।

হঠাৎই মনে পড়ে গৌতম চক্রবর্তীর কথা, সুমিতা এবং অনুপ দুজনেরই। সুমিতাদের পাড়াতেই থাকত ছেলেটা। এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। ওর সঙ্গেই বিয়ে হওয়ার কথা সুমিতার। কার্ডও ছাপতে চলে গিয়েছিল। দুপক্ষেরই আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবেরা পেয়েছিল বিয়ের খবর মুখেমুখে। হঠাৎই অনুপের খবর নিয়ে আসে পিসতুতো দাদা। গলফ্ ক্লাবের বন্ধু ওরা। এমন সুপাত্র ছাড়তে চাননি সুমিতার মা-বাবা। হয়ত একটু অস্বস্তিতে পড়তে হবে কিন্তু বিয়ে মানে একটি মেয়ের সারা জীবনের সুখ-দুঃখ। অমত ছিল না সুমিতারও। গৌতমের সঙ্গে বিয়েটা ছিল সামাজিক, প্রেমের নয়। বিয়ে যখন সামাজিক তখন সামাজিক সুযোগ সুবিধে যে যার মতো বুঝে নেবে। একটা সাজানো যুক্তি দেখিয়ে বিয়ে বাতিল করেন সুমিতার বাবা। গৌতম চক্রবর্তী অপমানিত হয়েছিল। শাসিয়ে গিয়েছিল পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বিয়ের দিন হুজ্জুৎ করবে। কিছুই হয়নি শেষ পর্যন্ত। বিয়ের পর অনুপকে সুমিতা শুনিয়েছিল ডাক্তার গৌতম চক্রবর্তীর ঘটনা। অনুপ আত্মতুষ্টির বিপরীতে মুখটা ভারী করে বলেছিল— 'ডাক্তার' গৌতম চক্রবর্তী বোল না। এম.ডি. করলে ডাক্তার হয়। ডাক্তারিতে গ্র্যাজুয়েসন করলে ফিজিশিয়ান বলতে হয়। শর্ট অক্সফোর্ড দেখো।

গৌতমের খবর নিতে অসুবিধে হয় না সুমিতার বাবার। পাশের পাড়াতে ফ্ল্যাট কিনে ওরা উঠে গেছে বছর দুয়েক। গৌতমের খবর দেয় ওরই এক বন্ধু। গৌতম কলকাতাতেই নেই, বছর চারেক। আলিগড় থেকে এম.এস. করে লণ্ডনে গেছে এফ.আর.সি.এস. করতে। নাতি হারানোর শোকের সঙ্গে এফ.আর.সি.এস. জামাই হারানোর দুঃখ বুকে নিয়ে নার্সিং হোমে ঘেরে সুমিতার বাবা।

শিশুটি কাগজের খবর হয়ে গেছে। সমস্ত দায় এখন পুলিশের। কে এবং কেন তার হিসেবনিকেশ চলে। সুমিতার কেবিনের সমস্ত উপহার পর পর সাজানো হয়। পুলিশী তদন্ত এবার নিজস্ব পথে চলে। উপহারটি কী, কে দিয়েছে, থাকে কোথায়, কী করে, বাড়িতে ছেলেমেয়ে কটি? প্রথম থেকে
— সুমিতার বাবা মা— গড়িয়াহাট— রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার ও হাউসওয়াইফ যথাক্রমে— একমাত্র মেয়ে সুমিতা। কমপ্লান— সুমিতার কাকা-কাকীমা— শ্যামবাজার— অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা— দুই ছেলে, বড়টি ব্যাঙ্কের অফিসার আর ছোটটা পটেটো চিপসের হোলসেলার। তাদের ছেলে অপ্রাপ্তবয়স্ক। সন্দেশ ও মুসাম্মী— অনুপের জ্যাঠাইমা এবং জেঠতুতো ভাই— নাকতলা— যথাক্রমে হাউসওয়াইফ এবং পি সি ও বুথ। অনুপের বাকি দুই জেঠতুতো ভাই যথাক্রমে কানপুর এবং পিলানীতে। বেবি সোপ, ক্রিম ও পাউডার সেট— পিসতুতো বৌদি— আরকেডিয়া (বেহালা)— ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষিকা— দুই মেয়ে— ইয়েট টু বি ম্যারেড। ক্যাডবেরি— মেসের একসময়ের বন্ধু অনিমেষ— হাজরা — আই.টি.ও.— প্রেমিকার প্যানেলে নাম আছে; চাকরি হলেই বিয়ে। আপেল ও রসগোল্লা— প্রসূন— দূরতম আত্মীয়— রাজাবাজার— পেতল-কাঁসার ব্যবসা— দুই ছেলে। ফুটপাতের ফ্রক, ল্যাংচা এবং পটল বিস্কুট— মাসতুতো ভাই— শেয়ালদা...। পুলিশ থামিয়ে দেয় অনুপকে।

— শেয়ালদার কোথায়?
— শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে?
— কী করেন?
— ব্যবসা।
— কিসের ব্যবসা?
— কাপড়ের।
— দোকান কোথায়? ঠিকানা?
— ফুটপাথে বসে।
— নিজের মাসতুতো ভাই? আপনার নিজের?
— হ্যাঁ। মানে আগে চাকরি করতো একটা মালটিন্যাশনাল কোম্পানিতে।
— কী পোস্টে।
— ঠিক জানি না।

সুমিতার দিকে ফেরেন অফিসার। —আপনি জানেন?
— ঠিক জানি না।
— ওঁদের বাড়ি যাননি কখনো?
— গিয়েছিলাম, মাস আষ্টেক আগে। অনুপ উত্তর দেয়। রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল মাসিমার সঙ্গে। যেতে হয়েছিল।
— কোথায় দেখা হয়েছিল? কোন্ জায়গায়?
— মৌলালীর কাছে।
— রাস্তার ওপর?
— না, একটা নার্সিং হোমে।
— ওখানে কি মাসিমা ভর্তি ছিলেন?
— না। ওখানে মাল সাপ্লাই দিত বরুণ।
— বরুণ কে?



— বরুণ মাসিমার ছেলে।
— বরুণবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই কি আপনারা ওখানে গিয়েছিলেন?
— না। আমরা জানতাম না বরুণ ওখানে মাল সাপ্লাই করে। গিয়ে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল মাসিমার সঙ্গে।
— আপনারা গিয়েছিলেন কেন?
— সেটা কি তদন্তের পক্ষে জরুরি? অনুপ কিছুটা উত্তেজিত।
— খুব গোপনীয় কিছু হলে এখনই বলতে হবে না।
— সুমিতার আবরণনের কথা ভেবেছিলাম। তখন বিদেশে আমার একটা ট্রেনিং এর কথা চলছিল। সুমিতার পি.এইচ.ডি...
— ডিটেলসের দরকার নেই।
— না। ইউ মাস্ট নো। যে শিশুটি চুরি গেছে — দ্য বেবি ওয়াজ এ সন। আমরা কোনও সেক্স টেস্ট করাইনি। আপনি নিশ্চয় সাসপেক্টদের তালিকায় আমাদের ইনক্লুড করছেন না।
— না করছি না। আপনারা মাসিমার বাড়ি গেলেন?
— জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। সুমিতা উত্তর দেয়।
— বরুণবাবু বাড়ি ছিলেন?
— না।
— বরুণবাবুই আমাদের প্রাইম সাসপেক্ট। মিসেস সেন, বরুণবাবু কারখানায় কী কাজ করতেন একেবারেই আন্দাজ করতে পারেন না? — বেবিটিকে খুঁজে পেতে এসব তথ্য খুব জরুরি।
— বোধ হয় সাপ্লাই ভ্যান চালাতো। অনুপ আর আমাকে দেখে বছর তিনেক আগে রবীন্দ্রসদনের সামনে একবার গাড়ি থামিয়েছিল। খাকি ইউনিফর্ম ছিল গায়ে।
— নার্সিং হোমের মীল দেওয়া বন্ধ হল কেন?
— তা জানি না। অনুপ উত্তর দেয়।
— ড্রিঙ্ক করে? দিদি কখনো বলেছে কিছু?
— না।
— ড্রাগ্‌স্।
— শুনিনি।
— আমাদের বরুণবাবুর কাছে যেতে হবে। চলুন মিস্টার চ্যাটার্জি। পুলিশের জিপ দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসে। মৌলালির জ্যাম পেরিয়ে শিয়ালদা ফ্লাইওভারে। বাঁদিকে ঘুরে কলেজ স্ট্রিটের দিক। ওয়ারলেসে মুচিপাড়া থানাতে খবর দেওয়া হয়। জিপ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের গা দিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পড়ে। লেডি ডাফরিন হসপিটালের কয়েকটা বাড়ি আগে রাস্তার ওপর জাপান-আমেরিকার জামা-গেঞ্জি নিয়ে বসে আছে বরুণ। চিনতে অসুবিধে হয় না অনুপের। কয়েকবারই গাড়িতে যেতে যেতে দেখেছে।

পুলিশের জিপ খানিকটা আগেই থেমে যায়। নেমে হাঁটতে থাকে অনুপ। একটু এগিয়েই বরুণকে দেখতে পায়। খদ্দেরদের সঙ্গে দর কষাকষি করছে। বরুণও দেখে অনুপকে। চোখ দুটো ঘষে। বোধ হয় বিশ্বাস হয় না। ভুল দেখছে না তো?

ছুটে আসে বরুণ। কোথায় যাবে দাদা?
— তোর কাছেই এলাম।

মাথাটা ঝাঁকায় বরুণ। স্বপ্ন দেখছে নাকি? ঘরে চল। এখানে কেন? বৌদির কিছু হয়নি তো? নেপা, দুটো চা।
— না। বেবির ব্যাপারে।
— কী ব্যাপার? বরুণের চোখেমুখে বিস্ময়।

অনুপের উত্তরের আগেই এগিয়ে এসেছে পুলিশের জিপ। সেটা দেখে উঠে দাঁড়ায় ফুটপাথের হকাররা। চিৎকার করে — হল্লা, হল্লা। যে যার মাল গুটিয়ে ছুটে গলির ভেতর আশ্রয় নেয়। বরুণও চাদরের চার খুঁটে বেঁধে ফেলেছে মালপত্র। হাতটা চেপে ধরে অনুপ। চারজন পুলিশ চারদিকে দাঁড়িয়ে যায়। বরুণ কিছু বলার আগেই তার মাল গাড়িতে ওঠে। নেপা চায়ের গ্লাস দুটো ধরে অন্য খদ্দেরদের বলে — বরুণ ভেবেছিল চায়ে ম্যানেজ করবে। একি তোর এন.জি.ও.!

বরুণকে ইন্টারোগেট করতে বিশ মিনিট দেরী হয়ে যায়। তুই, তুমি নাকি আপনি — এটাই ঠিক করে উঠতে পারেন না পুলিশ অফিসাররা। হাকারো 'তুই' পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এ হচ্ছে আই.এ.এস.-এর মাসতুতো ভাই। অনেক ভেবে সম্বোধনের পরিবর্তে ভাববাচ্যে চলে যান। স্কুলে শেখা সেই বাচ্য যে এতদিন পরে এমন কাজে লাগবে ভাবতেই পারেননি।

— আগে কী কাজ করা হোত? তার আগে? নার্সিং হোমের সংবাদ কোথা থেকে পাওয়া গেল? মা যেতে বলেছিলেন না নিজের ইচ্ছেয়? কখন নার্সিং হোমে ঢোকা হয়েছিল? কখন বেরনো হোল? নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া হল? তারপর কোথায়? রাতে কখন বাড়ি ফেরা হোল? গত কাল কী করা হল? আজ সকাল থেকে? নার্সিং হোমে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

বরুণের উত্তরের ভেতর একটি নতুন নাম মেলে তের নম্বর কেবিনের সেদিনের ভিজিটারদের মধ্যে।

— দাদা, মনে আছে মানবদাকে? দারুণ ঘুড়ি ওড়াতো! বিশ্বকর্মা পুজোর দিন একায়টা ঘুড়ি কেটেছিল! ফুটবল খেলতো। ফার্স্ট ডিভিসনে খেলেছে। খেলার জন্যে এফ.সি.আই.-এ চাকরি হল। মানবদার বউ সেদিন মানবদার বোনকে দেখতে গিয়েছিল নার্সিংহোমে। বেরোবার মুখে বড়দির সঙ্গে দেখা। বললুম তোমার কথা। বলল মায়ের মুখে তোমার কথা কত শুনেছে। আমিই বৌদিকে নিয়ে গেলুম ছেলে দেখাতে।
— তারপর? পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করেন।
— নার্সিংহোমে তো নো স্মোকিং। আমি কেবিনে বৌদিকে

ঢুকিয়ে বাথরুমে ঢুকলুম।

— ফিরে ? অনুপ জিজ্ঞেস করে।

— বৌদি ততক্ষণে চলে গেছে।

— বৌদির ক' ছেলে-মেয়ে ? পুলিশ অফিসারের প্রশ্ন।

— নেই। ডাক্তার-টাক্তার অনেক করেছে। ঠাকুর দেবতাও।

— থাকেন কোথায়।

— নারকেলডাঙায়।

— বাড়ির নাম্বার ?

— তা জানি না তবে বাড়ি চিনি। দুবার গেছি। মানবদার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল। ধরে নিয়ে গেস্‌ল।

— ওখানে যেতে হবে। পুলিশ অফিসারের নির্দেশ।

— কেন ? বরুণের প্রশ্ন।

— নো কোয়েশ্চেন।

— আমার মাল ?

— কিছু হবে না। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। অনুপ বলে।

জিপ চলে নারকেলডাঙায়। পুলিশ অফিসার যেন রহস্যের কিনারা খুঁজে পেয়েছেন। ওখানেই মিলবে বেবিটিকে। কিন্তু তার আগে একজন মহিলা পুলিশ অফিসারকে ফুলবাগান থানায় অপেক্ষা করতে বলতে হবে। সে নির্দেশ যায়। বরুণকে পুলিশ অফিসার নির্দেশ দেন তাকে কী কী করতে হবে। দরজার বেল টেপা। ভেতরে ঢোকা। মিস্টার অনুপ চ্যাটার্জির সঙ্গে মানববাবু এবং বৌদির পরিচয় করে দেওয়া। নানা জিনিসপত্রের প্রশংসা করা। যেমন ফ্রিজ, টিভি। অন্য যা কিছু করার করবেন মিস্টার চ্যাটার্জি। এর বাইরে মিস্টার চ্যাটার্জির নির্দেশ ছাড়া একটি কাজও করবে না বরুণ।

তিন বাই বি ফ্ল্যাটটি পুরোপুরি অন্ধকার। বেল টেপে অনুপই — একবার, দুবার, তিনবার। কোন সাড়া নেই। বাটনটা বুড়ো আঙুলের চাপে আটকে রাখে অনুপ। বেল বেজে যায় নিরন্তর। পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে যায় বেল বেজে যাওয়ার অস্বাভাবিকতায়। এক সময় ভেতরের আলো দরজার নিচে দিয়ে ছিটকে আসে বাইরে। দরজা খোলে। ভেতরে ঢোকে বরুণ। বরুণকে দেখে সোফায় বসে পড়েন মানবদা। কোন আবাহন নেই। অনুপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় বরুণ। কোন উত্তর নেই। বৌদি কোথায় জিজ্ঞেস করে বরুণ। কোন কথা নেই। বরুণ বেড-রুমে ঢোকে। কোন বাধা নেই। অনুপ ব্যালকনিতে গিয়ে দেশলাই জ্বালে। সাদা পোশাক এবং সাদা ইউনিফর্মের পুলিশ ফ্ল্যাটে উঠে আসে। মানব বসে আছে পাথরের মূর্তির মতো। হঠাৎ শিশুর আওয়াজ ভেসে আসে। কান্নার শব্দ। আলমারির গায়ে পিঠ দিয়ে আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা মানবের স্ত্রীর। শিশুটিকে ঢুকিয়ে নিয়েছে বুকের ভেতর। দুগ্ধশূন্য স্তনের বোঁটা শিশুটির মুখে। যদি কান্না থামায়। যদি ওরা চলে যায়।

সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশ অফিসারটি সামনে এসে দাঁড়ান। তাঁর হাত শিশুটিকে তুলে দেয় মানবের স্ত্রী।

পুলিশের একটি ভ্যান এবং দুটি জিপ রাতের কলকাতায় পাড়ি দেয় উত্তর থেকে দক্ষিণে। প্রিজন-ভ্যানের ভেতরে মানবের স্ত্রী মাথা ঠোকে গাড়ির তারের জালে। স্বামীকে খামচায়, কামড়ায়। দোষারোপ করে ওর ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল, কিছু বলল না কিছু করল না সে। দ্বিতীয় জিপে মহিলা পুলিশ অফিসার পরম মমতায় বুকে করে বহন করে নিয়ে চলেন অচেনা অজানা এক শিশুকে। তৃতীয় জিপে অনুপ চ্যাটার্জি মানবের অদ্ভুত আচরণের বর্ণনা দেন পুলিশ অফিসারকে।

রক্ত একটি তরল পদার্থ। সমপরিমাণ মিনারেল ওয়াটার কিংবা সফট ড্রিঙ্কসের চেয়ে দাম কিছুটা বেশি। জমাট রক্ত আঠালো। একেই বলে রক্তের টান। তবে রক্তের চেয়ে যে কোন এ্যাডহেসিভ এমনকি সাধারণ গামের টান বেশি, জোড়ার ক্ষমতা অধিক। দামেও অনেক সস্তা।

# ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বিনয় চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৭.১)

ভূমিজ সমাজের তুলনায় মুণ্ডাসমাজে হিন্দুপ্রভাব আরও বেশি সীমাবদ্ধ, অন্তত ভূমিজ-বিদ্রোহের সমসাময়িক ঘটনা 'কোল' বিদ্রোহ পর্যন্ত (১৮৩১-৩২)। এ বিদ্রোহের কারণ সংক্রান্ত সরকারি বিশ্লেষণে হিন্দু-প্রভাবের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। বিদ্রোহীদের কোন কোন কার্যকলাপের ব্যাখ্যা প্রসংগে এ উল্লেখ। যেমন মুণ্ডা নাগবংশী রাজপরিবারের কারও কারোর ** বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আক্রোশ সুপরিকল্পিত হিংসা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। এ ব্যাখ্যায় মুণ্ডারাজপরিবারের হিন্দু ধর্মের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঝোঁকের কথা বলা হয়েছে। এর একটা ফল, মুণ্ডারাষ্ট্রের শাসনকার্যের নানা স্তরে মুণ্ডা সমাজ বহির্ভূত লোকের প্রাধান্য বাড়তে থাকে ; মুণ্ডাদের চাষের জমি ও অন্যান্য গ্রামীণ সম্পদের একাংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কিন্তু কোল বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত হিন্দু প্রভাব প্রধানত রাজপরিবার এবং তাদের অনুগ্রহভাজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুণ্ডা অঞ্চলের কোথাও কোথাও (যেমন পাঁচ পরগণায়) বৈষ্ণব প্রভাবের প্রমাণ অন্য সূত্র থেকে পাই।** তবে সামগ্রিক আদিবাসী সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে এ প্রভাব নিতান্তই নগণ্য মনে হয়।

আসলে হিন্দুধর্মের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও রাজপরিবার এর প্রচারের জন্য বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেয়নি। কারণ এ আকর্ষণের উৎস কোন বিশেষ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নয় ; হিন্দু-মুখিতা খানিকটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি-প্রণোদিত। নাগবংশী পরিবার চেয়েছিল তারা যে আদিতে মুণ্ডা ছিল এ সত্যটা চাপা পড়ুক ; তারা হিন্দু ক্ষত্র ঐতিহ্যের ধারক— এ কল্পিত ধারণার ভিত্তিতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এ ধারণার সৃষ্টি ও প্রচারে আসল সহায় ছিল ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী। তারা বানাল মিথ্যা কুলপঞ্জী, যাতে কল্পিত কোন রাজপুত রাজবংশের সংগে তাদের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। (আসলে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতেও রাজনৈতিক ক্ষমতা সুনিশ্চিত করার কৌশল হিসাবে এ ধরনের কুলপঞ্জী তৈরি করার নজির আছে। নৃতত্ত্ববিদরা একে বলেন Mythical calendar)। রাজপরিবার ও তার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল আমলা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুণ্ডাসমাজের ক্রমবর্ধমান বিরূপতা এ মিথ্যার আশ্রয় নেবার প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

(৭.২)

আমাদের নির্বাচিত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির— সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং হো— উপর হিন্দু-প্রভাবের প্রকৃতি সম্পর্কিত আমলাদের পরবর্তী আলোচনার মূল বৈশিষ্ট্য একটু পরেই নির্দেশ করব। আর একটি প্রাসংগিক তথ্য তার আগে উল্লেখ করতে চাই। ১৮৭০-এর দশক থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে হিন্দু প্রভাবের দ্রুত প্রসার সম্পর্কে সচেতনতা এবং কৌতূহল বাড়তে থাকে। এ ঘটনার নানা আখ্যা তাদের রচনাতে পাই। কেউ কেউ বলেছে, আদিবাসিরা 'হিন্দু' হয়ে যাচ্ছে ('Hinduized')। কেউ কেউ 'হিন্দু' এবং 'ব্রাহ্মণ' শব্দদুটিকে সমার্থক মনে করে এ ঘটনাকে 'ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার' ('Brahaminization') বলে বর্ণনা করেছে। এখানে হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির গড়নে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-বহির্ভূত লৌকিক ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির নানা বিশিষ্ট উপাদানের ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

ডাল্টনের বিখ্যাত বই-এর (**Descriptive Ethnology of Bengal**) প্রকাশকাল ১৮৭২ সাল। তিনি অবশ্য হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কোনও পরিবর্তনের কথা বলছেন না। তবে আদিবাসিদের শ্রেণী বিভাজন বিষয়ে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিতে তাদের সম্পর্কে সরকারি মহলে নতুন অনুসন্ধিৎসা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়।*** তার মতে

আদিবাসিদের মধ্যে দুটি স্পষ্ট ভাগ লক্ষণীয় — খাঁটি আদিবাসী আর হিন্দু-আদিবাসী ('Hinduized aborigines') 'হিন্দু-আদিবাসীদের' তিনি 'ভেঙ্গে-যাওয়া' (broken) আদিবাসী গোষ্ঠী বলেও বলেছেন। দুটি নিয়মের ভিত্তিতে ডাল্টন আদিবাসিদের ভাগ করেছেন: ভাষা এবং হিন্দু-প্রভাবের ব্যাপকতা। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এ দুটি নিয়ম সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র নয়। অন্তত আদিবাসী-হিন্দু সম্পর্কের ক্ষেত্রে। তাঁর মতে: "এটা লক্ষণীয় যে, ভাষায় পরিবর্তন ধর্মীয় প্রভাবের ফলেই ঘটেছে। যে সব আদিবাসী ধর্মীয় বিশ্বাসে হিন্দু হয়ে গেছে, তারা তাদের আদিভাষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে; ভাঙ্গা আঞ্চলিক কোনও হিন্দি বুলিতে তারা এখন কথা বলে" ('speak a rude dialect of Hindi')। হিন্দু আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তিনি এ ভাবে নির্দেশ করেছেন: তাদের কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা গোড়ায় সহজ মনে হয়না; 'তারা তাদের আদিভাষা ভুলে গেছে, তাদের গোড়ার ইতিহাস অবিকৃত রাখেনি ('mystified their early history'); আচার এবং ধর্মের বিষয়ে তারা বেশ হিন্দুভাবাপন্ন'। নিজ ঐতিহ্য থেকে তাদের প্রধানতম বিচ্যুতি ঘটেছে ভাষার ক্ষেত্রে

প্রশাসনিক মহলে অনেকেই হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার বলতে আসলে সমসাময়িক ঘটনাকেই বুঝিয়েছে। সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলন (১৮৭৪-৮২) সম্পর্কে আমলাদের বিবরণীতে 'হিন্দু প্রভাবে'র কথা বার বার বলা হয়েছে। আগেই আমরা এর উল্লেখ করছি। এখানে হিন্দু প্রভাবের অর্থ— কীভাবে সাঁওতালরা নিজেদের 'শুদ্ধি'র উপায় হিসেবে নানা হিন্দু-বিশ্বাস ও আচার সাগ্রহে গ্রহণ করছে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত একটি রচনায় আলফ্রেড লায়াল (Alfred Lyall) হিন্দু প্রভাবের তাৎপর্য বোঝাতে বলেছেন কীভাবে নানা 'আদিম জনগোষ্ঠী, অনার্য জাতি এবং বর্ণজাতিহীন ('Casteless') আদিবাসীরা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের আওতায় চলে আসছে'।[৩১] ১৮৮৪ সালে বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন ভারত সরকারের কাছে লেখা একটা চিঠিতে এ প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। "১৮৮১-র আদমশুমারী থেকে বোঝা যায় কী দ্রুতগতিতে আদিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং কী ভাবে আদিমজাতিকুল বিপুল হিন্দু-ব্যবস্থার ('great system of Hinduism') অংগীভূত হয়ে পড়ছে"।[৩২]

এ পরিবর্তনের নিপুণতম বিশ্লেষণ প্রথম আমরা পাই রিজলীর লেখায়,[৩৩] এর জটিলতা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত তিনিই প্রথম আলোচনা করেন। তার দেওয়া দৃষ্টান্তগুলি এক বিশেষ ধরনের। এখানে আদিবাসীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে 'হিন্দু' হয়ে গেছে। তিনি চারটি 'প্রক্রিয়া'র কথা বলেছেন।

প্রথম প্রক্রিয়াটি একটু আলাদা ধরনের। এখানে হিন্দু-সংস্কৃতির কোন কোন দিক অনুকরণে প্রধান উদ্যোগ ছিল ক্ষমতাবান ভূস্বামীদের ('independent landed proprietors')। আদিতে এর সবাই ছিল অদিবাসী। কিন্তু গ্রামের সংগে তাদের সম্পর্ক বা গ্রামের যৌথ সমাজ-সংগঠনে তাদের ভূমিকা আস্তে আস্তে পাল্টে যায়। ঐ পরির্তনের একটা প্রধান কারণ অদিবাসী জগতে 'রাষ্ট্রশক্তি'র আবির্ভাব এবং বিকাশ। গ্রামের উপর এ নতুন 'রাষ্ট্রের' কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য নানা ব্যবস্থার সংগে তারা যুক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের নিজ গ্রাম বা কাছাকাছি গ্রামসমষ্টির উপর তাদের নিজস্ব ক্ষমতাও বাড়ে; পুরনো গ্রাম-সংগঠন থেকে তারা ক্রমেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে। গ্রামের জমি বা অন্যান্য নানা সম্পদের একাংশও তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এ ভাবে আস্তে আস্তে তারা ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-সংস্কৃতিতে আগ্রহ আসলে তাদের এ ক্ষমতা বজায় রাখার কৌশল মাত্র। এ কৌশল হল, আদিবাসী গ্রামের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এ নেপথ্য ইতিহাস যাতে গ্রামের লোকেরা ভুলে যায়। এটা অংশত সম্ভব হয়, যদি তারা দেখাতে পারে, এ ক্ষমতালাভের ইতিহাস আলাদা। যেমন, যদি তারা প্রমাণ করতে পারে তারা আদৌ আদিবাসী গ্রামের লোক ছিল না; বাইরের লোক, এবং প্রতাপশালী লোক; এর জোরেই তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এ ছলনা বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের নানা ফন্দি বাৎলাতে হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান একটা হল, মিথ্যা ইতিহাস বানিয়ে ক্ষমতাবান কোন হিন্দু রাজপরিবারের সংগে দীর্ঘকালব্যাপী রক্তের সম্পর্কের অকাট্য প্রমাণ সৃষ্টি করা।

রিজলী এ সুপরিকল্পিত প্রবঞ্চনার বিভিন্ন ধাপ নির্দেশ করেছেন: গোড়ায় তারা নিজেদের রাজপুত বলে জাহির করে। এর জন্য প্রথম দরকার কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কাজে লাগানো। সে তাদের পরিবারের কোনও কল্পিত আদিপুরুষের নাম বানায়; এ পরিবারকে ঘিরে অলৌকিক নানা কল্পিত ঘটনার গল্প ফাঁদে; বলে, যে আদিবাসী গ্রামে এ পরিবারের দীর্ঘদিন বাস, সেখানেই এ সব ঘটনা ঘটেছে; সে আরও বলে বেড়ায়, এ পরিবার আসলে প্রখ্যাত রাজপুতকুলের সংগে সম্পর্কিত; এজন্য এমন কোন রাজপুত গোত্রের কথা বলে, যার নামই কেউ কখনও শোনেনি। এ পরিবারের আরোপিত মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরও নতুন ফন্দি বাৎলানো হল। যেমন, বিশেষ ধরনের বৈবাহিক সম্বন্ধ; অবশ্যই আদিবাসী সমাজের বাইরে। খাঁটি কোনও রাজপুত পরিবারের সংগে এ সম্পর্ক স্থাপন নিঃসন্দেহে শ্রেয়তম; না হলে দ্বিতীয় বিকল্প এমন কোনও পরিবার যারা নিজেরাই নানা কপট কৌশলে রাজপুত বলে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। হয়ত এ স্বীকৃতির ঘটনা এতকাল আগে ঘটেছে যে লোকে এ সব ছলাকলার কথা বেমালুম



ভুলে গেছে। খাঁটি রাজপুত পরিবারের সংগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নাই বা হল; অন্তত এ সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী আদিবাসী-ভূস্বামীদের আদিবাসি হিসাবে পরিচয় তো ঘুচল। 'বিশুদ্ধ রক্তের' হিন্দুদের থেকে তাদের তফাত করার বা তাদের অনার্য আখ্যা দেবার উপায় থাকল না। ফলে তারা সম্পূর্ণ অর্থে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেল এবং স্থানীয় সমাজও তাদের উচ্চবর্ণের হিন্দু বলে মেনে নিল। রিজলীর ধারণা, ছোটনাগপুরের প্রধান প্রধান অনেক পরিবারের ইতিহাস আলোচনা করলে এ রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন মিলবে। অদিবাসীদের হিন্দু বনে যাওয়ার অন্য তিনটি 'প্রক্রিয়া' স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে বিত্তবান, প্রতাপশালী ভূস্বামীদের মতো সংখ্যায় নগণ্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যোগ ছিল না।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, এখানে উদ্যোগী আদিবাসীরা সাধারণ অবস্থার লোক। যে কোন কারণেই হোক তাদের একটা অংশ কোন না কোন হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়ে (sect) যোগ দেয় যেমন বৈষ্ণব, রামায়েত (Ramayat) ইত্যাদি। এদের নতুন ধর্মবিশ্বাস এ বিশিষ্ট সম্প্রদায়-প্রচারিত বিশ্বাস; প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাস বা আচারের বিশৃংখল সমাহার নয়, এখানে বিশ্বাস ও আচরণবিধি অনেক সুবিন্যস্ত। এ নতুন সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীরা তাদের পুরনো সমাজ থেকে আস্তে আস্তে অনেক দূরে সরে আসে। সম্প্রদায়ের রূপ যাই হোক তারা ক্রমে হিন্দু সমাজে মিশে যায়।

তৃতীয় প্রক্রিয়া নানা দিক থেকে এর থেকে আলাদা। এখানে হিন্দু মর্যাদা পাবার জন্য আগ্রহী আদিবাসীর সংখ্যা সচরাচর অনেক বেশি। একটি গোটা আদিবাসী গোষ্ঠী বা এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এক সংগে হিন্দু হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুদের প্রচলিত নানা জাতির কোনটাকেই তারা গ্রহণ করেনি। তারা নতুন 'জাতি' (Caste) হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিল। যেমন রঙপুরের (এবং পাশাপাশি এলাকার) কোচরা হিন্দু হল বটে; কিন্তু নতুন জাতি হিসাবে 'রাজবংশী' বা 'ভঙ্গ ক্ষত্রিয়' এ নতুন নাম বেছে নিল। এ নতুন জাতিত্বের দাবির সমর্থনে তারা বলল, তারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী ক্ষত্রিয় সমাজের অংশ; ক্ষত্রিয়কুলবিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরশুরামের আক্রোশ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলে পালিয়ে এসেছিল। স্বতন্ত্র জাতিত্বের কথা বললেও ধর্মকর্ম বা বিবাহাদি অনুষ্ঠানে তারা প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য রীতিকেই অনুসরণ করেছে। ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণরাই পুরোহিতের কাজ করে। বিবাহের নানা মঙ্গলাচার প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্য-আচার। গোত্র ব্যবস্থাও ব্রাহ্মণদের অনুরূপ।

চতুর্থ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপ রিজলী পশ্চিমবঙ্গের ভূমিজদের হিন্দুতে রূপান্তরের কথা বলেছেন। এর আলোচনা আমরা আগেই করেছি। তৃতীয় প্রক্রিয়ার সংগে এর একটা পার্থক্য বিশিষ্ট। কোচদের মতো ভূমিজরা আলাদা নতুন কোন জাতি বানায়নি। পুরনো আদিবাসী আখ্যা 'ভূমিজ'ও বর্জন করেনি।

(৭.৩)

এ চারটি 'প্রক্রিয়া'র নানা দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায় কীভাবে আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন স্তরে হিন্দুপ্রভাব ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু রিজলীর বিশ্লেষণ থেকে এ সিদ্ধান্ত কি যথার্থ হবে যে, এ প্রভাবের ফলে সবক্ষেত্রে আদিবাসী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে যাচ্ছিল?

অন্তত প্রথম এবং চতুর্থ, এ দুটি প্রক্রিয়ার বিশিষ্ট ধরনের উদ্ভব এ প্রভাবের সীমাবদ্ধতা সূচিত করে। এখানে আদিবাসী সমাজের একান্তই ক্ষুদ্র কোন কোন গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখার কৌশল হিসাবে নানা রাজপুত রাজবংশের সংগে তাদের জন্মগত যোগের অলীক কাহিনী প্রচার করে, যে কাহিনীর বয়ান বানিয়েছিল তাদের অনুগ্রহপ্রার্থী একান্ত বশম্বদ ব্রাহ্মণকুল। কোন বিশেষ হিন্দু ধর্মীয় এবং নৈতিক বিশ্বাস তাদের সামগ্রিক জীবন-চর্চাকে প্রভাবিত করেনি; স্বভাবতই আদিবাসী জনগণের মধ্যে এসব বিশ্বাসের প্রচারে তাদের কোন উদ্যোগ ছিল না। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিল, বৃহত্তর আদিবাসী সমাজের সংগে তাদের দুস্তর সাংস্কৃতিক ব্যবধানের মিথ্যা কুহক বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হলে তাদের কর্তৃত্বের ভিত্তি দৃঢ় হবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সামাজিক ভিত্তি অনেক বেশি ব্যাপক। এবং কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচরণবিধি অনুসরণে উদ্যোগী আদিবাসীদের আন্তরিকতা এ ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত। তবে রিজলী স্পষ্ট করে বলেননি, আমাদের নির্বাচিত অঞ্চলের কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে কিনা। আমরা আগে সাঁওতালদের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব প্রসারের কথা বলেছি। কিন্তু এর ফলে সাঁওতালরা তাদের আদি ধর্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ বর্জন করে কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত হতে চায়নি। আমরা পরে দেখব, এ বর্জনের ব্যাপকতা সব চাইতে বেশি ছিল ওরাঁওদের মধ্যে। কিন্তু কোথাও তারা ওরাঁও হিসাবে তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হয়নি। কোথাও বা যদি দলবদ্ধ হয়ে আদিবাসীরা কোনও হিন্দু 'সেক্টে' (sect) যোগ দিয়ে থাকে, তা সম্ভবত ক্ষুদ্র কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। তুলনায় রাজবংশী আন্দোলন যাকে রিজলী তৃতীয় প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন, এক বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩৪] এ ক্ষেত্রে হিন্দুবর্ণপ্রথার চৌহদ্দির মধ্যে নতুন জাতিত্বের মর্যাদা লাভের প্রয়াসও অনেকটা সফল হয়েছিল। অন্তত এখানকার আদিবাসিদের একটা বড় অংশ[৩৫] নিজেদের আদিপরিচয় ক্রমেই অস্বীকার করে। এবং এর বদলে 'রাজবংশী' অভিধার প্রকাশ্য ঘোষণায় অনুভব করে এক বিশেষ গর্ব। তাদের মানসিকতায় এ পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ১৮৮১ সালের আদমশুমারীতে দেখা গেল দীর্ঘকাল কোচ নামে অভিহিত আদিবাসীরা লোকগণকদের কাছে ঐ পরিচয়ই দিল না, এমনকি কোচ প্রধান অঞ্চল কুচবিহারেও।[৫৬] অবশ্য এর মধ্যে আত্ম-প্রবঞ্চনার উপাদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদের দাবী ছিল ক্ষত্রিয়ত্বের। বর্ণাশ্রম-শাসিত হিন্দু সমাজ তাদের হিন্দু বলে গ্রহণ করলেও তাদের অভিপ্রেত মর্যাদা স্বীকার করেনি। এ সমাজে তাদের স্থান ছিল নিচুতে।[৫৭] উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের হাত থেকে রান্না খাবার নিত না, আর একই হুঁকোয় তামাক খেত না। দার্জিলিং তরাইয়ে, যেখানে বিপুলসংখ্যক রাজবংশীর বাস, বর্ণহিন্দুরা তাদের হাতের ছোঁয়া জল খেত বটে; কিন্তু রিজলীর মতে তা একটা ব্যতিক্রম মাত্র; স্থানীয় অবস্থাভেদে।

অধিকাংশ রাজবংশী যে জাতে উঠতে পারেনি তার একটা সম্ভাব্য কারণ তাদের চরম আর্থিক দৈন্য। প্রধানত কৃষিজীবী হলেও জমিতে স্থায়ী দখলীস্বত্ব খুব কম জনেরই ছিল। এদের মধ্যে দরিদ্রতম গোষ্ঠীরা হল বিভিন্ন ধরনের ভাগচাষী (যেমন আধিয়ার) বা একেবারে নিঃস্ব ভূমিহীন দিনমজুর। বিত্তবান রাজবংশী 'জমিদার'ও ছিল; কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, 'এ সব আদি রাজবংশী পরিবার বেশ কিছুকাল আগে 'রাজপুত' পদমর্যাদা-অধিকারী গোষ্ঠীতে উন্নীত হয়ে গেছে'।[৫৮]

রিজলী এবং আরও অনেকের মতে 'রাজবংশী আন্দোলন' মূলত তথাকথিত ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এ সিদ্ধান্ত কি যথার্থ? আদিবাসী জগতে হিন্দুপ্রভাবের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসংগে এ প্রশ্নের আলোচনা জরুরি। এটা অনস্বীকার্য যে এ দাবির প্রতিষ্ঠা রাজবংশী আন্দোলনের একটা প্রেরণা, কোন কোন সময়ে প্রধানও বটে। তবে রিজলী-প্রমুখ পণ্ডিতেরা যে ভাবে এর চরিত্র-নির্দেশ করতে চেয়েছেন, তাতে এর বৈচিত্র্য এবং জটিলতা সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না।

আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য যে প্রশ্ন বিশেষভাবে প্রাসংগিক তা হল, সামগ্রিক হিন্দু-প্রভাব এবং ক্ষত্রিয়ত্বের স্বীকৃতি লাভের প্রয়াস কি সমার্থক? প্রশ্নটি আসলে রাজবংশী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কিত। কোন্ সামাজিক গোষ্ঠী এ স্বীকৃতির জন্য সবচাইতে বেশি উদ্যোগ নিয়েছিল? তার কারণই বা কী? প্রশ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্ডিতেরা একটা বিষয়ে একমত। তাহলে, ক্ষত্রিয়ত্ব সম্পর্কে আন্দোলনের নেতা বা প্রবক্তাদের যে যুক্তি তার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আকস্মিক কোন ঘটনাচক্রে এ ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী তাদের আদিবাস ছেড়ে উত্তরবংগ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে এসে জমায়েত হয়েছিল — এ ধারণার কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। এ গোষ্ঠী তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বর্গ সম্পূর্ণ বিস্মৃতই হল কেন? পণ্ডিতদের তাই স্থির সিদ্ধান্ত, রাজবংশী নেতাদের ধারণা সম্পূর্ণ বানানো।[৫৯]

অবশ্য রাজবংশী আন্দোলনের বিশেষ করে প্রাক্-ঔপনেশিক যুগের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। তবে উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর বা আশির দশক থেকে বিশিষ্ট 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনে'র বিবর্তন এবং বিকাশ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণা [৬০] থেকে আমরা কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

(ক) এ আন্দোলন শুধু রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি। বৃহত্তর আদিবাসী জগৎ থেকে তাদের দূরত্ব ক্রমেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে গেছে। রাজবংশীরা চাইল, হিন্দু সমাজ এ বর্গগত ব্যবধানকে স্বীকৃতি দিক। রাজবংশী আন্দোলনে এটা সম্পূর্ণ নতুন কোন প্রবণতা নয়। নতুন আন্দোলনে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(খ) এ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিবেশ। নানা ঘটনার ফলে তাদের আশংকা বাড়ছিল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নির্দ্বিধায় মেনে নেবে না।

(গ) এ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল প্রধানত কয়েকটি বৈষয়িক দিক থেকে সফল এবং বিত্তশালী রাজবংশী পরিবার। বস্তুত এ বৈষয়িক সাফল্যের জন্যই তারা হিন্দুসমাজে তাদের যথোপযুক্ত স্থান এবং মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল।

(ঘ) আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সাধারণ অবস্থার রাজবংশীদের সমর্থন এবং সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। আন্দোলনের কোনও কোনও কর্মসূচি এর পক্ষে অনুকূল ছিল বটে; কিন্তু রাজবংশী সমাজে ক্রমবর্ধমান শ্রেণীবৈষম্য এক বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে ওঠার পথে একটা প্রধান অন্তরায় ছিল।

(ঙ) এ আন্দোলন আসলে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের (organized politics) দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও কর্মসূচির প্রচার, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নানা সংগঠন সৃষ্টি অপরিহার্য ছিল।

ক্ষত্রিয় আন্দোলন হিসাবে রাজবংশী আন্দোলন মোটেই সাম্প্রতিক কোন ঘটনা নয়। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী অনেক দিনের। আগেও তারা এর ভিত্তি হিসাবে শাস্ত্রীয় অনুমোদনের কথা বলেছে। বিশিষ্ট রাজবংশী পরিবার নিজেদের হিন্দু বলে মনে করত। অবশ্য উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজ একে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়নি। হিন্দু বলে মানলেও রাজবংশীদের মনে করত নিচু জাতের লোক। এ মনোভাবের দৃষ্টান্ত আমরা আগে উল্লেখ করেছি।



নতুন ক্ষত্রিয় আন্দোলন এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তখন আবার নতুন করে সুসংবদ্ধভাবে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি অস্বীকার করতে শুরু করে। এ বিষয়ে তাদের মনোভাব ক্রমেই অনমনীয় হয়ে ওঠে। উপলক্ষ ছিল, সরকারি আদমশুমারীতে রাজবংশীদের কীভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, উচ্চবর্গীয় হিন্দু-সমাজের রাজবংশী বিরোধী মনোভাবের জন্যই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় বলে মানলই না।[৬১] আদমশুমারীর নতুন বিধানে বলা হল তারা কোচই। রাজবংশী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য এ স্বেচ্ছাচারী বিধানকে প্রতিহত করা। রাজবংশীদের আশংকা ছিল, একবার সরকারী নথিতে তাদের সামাজিক বর্গ নির্দিষ্ট হয়ে গেলে পরে তার পরিবর্তন কঠিন হবে। তাছাড়া হিন্দুদের থেকে এ নিরন্তর উপেক্ষা আর অবমাননা তারা আর মানতে চাইল না, বিশেষ করে বৈষয়িক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নানা রাজবংশী পরিবার। তাদের বিত্ত আছে; ভূস্বামী হিসাবে তাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ; নানা পেশায় তাদের দক্ষতা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত; তবুও হিন্দুসমাজ তাদের যথাযথ সামাজিক মর্যাদা দিচ্ছে না। নানাদিকে অগ্রসর কোচরা হিন্দুদের অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু অনেক রাজবংশী পরিবার কোচদের সংগে তুলনীয় নয়।

স্বভাবতই, এ আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিল নানা পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত, বিত্তবান — এ সব আত্মবিশ্বাসী পরিবার — যেমন জমিদার, জোতদার, স্বচ্ছল বড় জোত-জমার মালিক কৃষক, আইন-ব্যবসায়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, তেজারতি, মহাজনীতে যুক্ত নানা পরিবার।[৬২] বিত্তের সংগে তারা চাইল সামাজিক মর্যাদা; বর্ণাশ্রম নিয়ন্ত্রিত-হিন্দুসমাজে এ মর্যাদার প্রধানতম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি বর্ণপ্রথায় উঁচু স্থান। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাদের তীব্র বিরূপতা কিন্তু বর্ণপ্রথা বর্জনের প্রয়াস মূঢ়তা মাত্র, কারণ শুধুমাত্র তাদের প্রতিরোধে সুদৃঢ় বর্ণপ্রথার উৎসাদন সম্ভব নয়। তাই তারা চেয়েছিল সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে উচ্চবর্গের সমান হতে। রাজবংশী নেতৃত্ব মাঝে মাঝে নিজেদের সমাজের সংস্কারের কথা বলেছে, কিন্তু তার মুখ্য আদল উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের আচরণ বিধি। যেমন উপবীত ধারণ। তারা ভেবেছিল, এ সব আচার আচরণ গ্রহণের (appropriation) মধ্য দিয়ে হিন্দুদের সামাজিক প্রাধান্য খর্ব হবে।

অথচ সফল আন্দোলনের জন্য বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। আন্দোলনের ব্যাপকতা থেকে অনুমান করা যায়, এ সম্পর্কে নেতৃত্বের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ বিফল হয়নি। এর একটা কারণ, বর্ণহিন্দুদের কাছে 'নিচু জাতের লোক' বলে গণ্য রাজবংশীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা সংহতিবোধ ছিল। এ অবজ্ঞা তাদের সমাজের সর্বস্তরের লোককে সমানভাবে ক্ষুব্ধ করেছে। ক্ষত্রিয় হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণবিরোধী নতুন আন্দোলন তাই রাজবংশী সমাজকে এক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আন্দোলন সম্পর্কে জনসাধারণের অনুকূল মনোভাবের আর একটা কারণ নেতাদের কোন কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচি।[৬৩] কিন্তু এ সহযোগিতা আদৌ সর্বব্যাপী ছিল না। এর প্রধান কারণ, তখনকার রাজবংশী সমাজের গড়ন — তার শ্রেণীবিন্যাস, প্রকট শ্রেণীবৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব। নতুন আবাদের এলাকায় এ দ্বন্দ্বের প্রধান উৎস, জোতদার ও প্রান্তিক চাষী এবং ভাগচাষীদের (আধিয়ার) সম্পর্ক। সব জোতদার অবশ্যই রাজবংশী নয়; কিন্তু জমিতে ভাগচাষীদের অধিকার বিষয়ে রাজবংশী নেতাদের মনোভাব প্রধানত প্রতিকূল ছিল।[৬৪] এ দ্বন্দ্ব কদাচিৎ মাত্র সংগঠিত জোতদার বিরোধী প্রতিরোধের রূপ নিয়েছে। কিন্তু এ নিরবচ্ছিন্ন বৈরিতা বহু ক্ষেত্রে আধিয়ারদের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ক্ষত্রিয় আন্দোলনে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ের ডাক তাদের এ অনীহাকে সম্পূর্ণ ভাঙতে পারেনি।

আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি যাই হোক না কেন, এর সংগঠন অত্যন্ত নিপুণভাবে গড়ে তুলতে হয়েছে। এখানে রাজবংশী নেতৃত্বের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংগঠনের একটা দিক ভাবাদর্শগত; যেমন বর্ণহিন্দুসমাজ-প্রচারিত ভাবাদর্শের একটা বিকল্প তৈরি করা (counter-ideology)। রাজবংশীরা আদিতে কোচ বৈ অন্য কিছু ছিল না, তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই — এ প্রচার খণ্ডন না করা গেলে ক্ষত্রিয় আন্দোলন টেকে না। এ খণ্ডনের একটা উপায় ক্ষত্রিয়ত্ব দাবির সপক্ষে শাস্ত্র, পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত নানা কাহিনী, গাথা, গান ইত্যাদির ব্যাপক প্রচারেরও ব্যবস্থা হল। এ সংগঠনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বিভিন্ন অঞ্চলের আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা। এর জন্য দরকার ছিল 'আধুনিক' ধরনের এক সংগঠনের যাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নানা নিয়মের মাধ্যমে এর শাখা, উপশাখার সংগে যোগাযোগ রেখে যেতে পারে। এখানে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা বা পছন্দ থাকতে পারে, কিন্তু তা বজায় রাখার জন্য সংগঠনের লিখিত বিধান, রীতি এবং পদ্ধতির লঙ্ঘন অবাঞ্ছিত। বিধান ইত্যাদি সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। সংগঠনের একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক দিকও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তা হল, বর্ণহিন্দুসমাজ-বিরোধী আন্দোলনের একটা হাতিয়ার হিসাবে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা। এর ভিত্তি এ প্রত্যাশা যে, হিন্দুসমাজ তাদের দাবি অস্বীকার করুক; কিন্তু রাষ্ট্রের অনুমোদনে হিন্দুদের এ বিরুদ্ধতা অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই

রাজবংশী আন্দোলন মূল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলন থেকে সচেতনভাবে দূরে থেকে গিয়েছিল।

প্রাক্ ব্রিটিশযুগের 'রাজবংশী আন্দোলন' একটু স্বতন্ত্র ধরনের। (এখানে 'আন্দোলন' শব্দের ব্যবহার যথার্থ নয়)। আমরা আগেই বলেছি, এ সময়কার আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। তবুও এর কয়েকটা প্রবণতা মোটামুটি বোঝা যায়।[৪৮]

(ক) রাজবংশী নামে পরিচিত হবার জন্য উদ্যোগ কোচ বা অন্য কোন আদিবাসী সমাজের ভিতর থেকে আসেনি। এ উদ্যোগ প্রধানত স্থানীয় কয়েকটা ক্ষমতাবান, উচ্চাভিলাষী পরিবারের। বিশাল কামরূপরাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা স্বতন্ত্র, স্বাধীন 'রাজ্য' গড়তে চেয়েছিল। সফল যারা হয়েছিল, তারা নিজেদের রাজা আখ্যা দিল। আসলে, সত্যিকার কোন রাজবংশের সংগে তাদের সম্পর্ক ছিল না আদৌ। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পেরেছিল বলেই তারা 'রাজা' নাম নিল। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় এ রকম এক সফল ব্যক্তির নাম বিশ্ব। প্রচলিত ধারণা, সম্ভবত বিশ্বই প্রথম নিজের পরিবারকে রাজবংশী বলে। তার দাবি, কোচ গোষ্ঠী কোন ক্ষত্রিয় রাজবংশ-সম্ভূত। বিশ্ব তার নতুন পাওয়া রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সাধারণের চোখে এ ভাবে বৈধ করে নিতে চাইল।

(খ) অনিবার্যভাবে এখানে গড়ে উঠল ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্ম প্রচারের নানা ব্যবস্থা করা হল; আদিবাসী গ্রামের 'পুরোহিত' কলিতাদের সরিয়ে নানা জায়গা থেকে এনে ব্রাহ্মণদের বসানো হল। শুধু তাই নয় সম্পূর্ণ নতুনভাবে সমাজকে ঢেলে সাজানোর জন্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করা হল। সম্ভবত রাজাদের উদ্দেশ্য ছিল, এর ফলে নতুন এক অনুগত সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে।

(গ) কিন্তু শুধুমাত্র রাজপরিবারের খামখেয়ালিপনায় দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ-সংগঠন পাল্টানো সম্ভব ছিল না। এ সমাজ-সংগঠনে যুক্ত নানা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যেমন কলিতা, এ স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নেয়নি। বহু আদিবাসীর সমর্থনও তাদের প্রত্যাশিত ছিল। ফলে ব্যাপক অসন্তোষ। এ ব্যাপকতার একটা প্রমাণ, ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রাজা নরনারায়ণ একটা আপসে আসতে বাধ্য হয়। রাজতরফ থেকে বলা দেওয়া হল, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের কোচ, মেচ ইত্যাদি আদিবাসিদের ধর্মকর্মে কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। আপসের প্রধান প্রশ্ন ছিল — পৌরোহিত্যের অধিকার কার, কলিতার না ব্রাহ্মণের। এর থেকে মনে হয়, আদিবাসীদের বিরোধিতা কলিতাদের নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছিল।

(ঘ) কোচদের (বা অন্যান্য আদিবাসীদের) মধ্যে রাজবংশী নামের আকর্ষণ কেমন ছিল সঠিক বলা যায় না। বুকাননের বিবরণ থেকে জানতে পারি, প্রধানত হিন্দু সংস্কৃতি-প্রভাবিত কোচরাই রাজবংশী বলে নিজেদের পরিচয় দিত। আসামের গোয়ালপাড়া এ ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম বলা যায়। হিন্দুপ্রভাবের রূপ যাই হোক্, 'বিজনী'রাজাদের এলাকায়, কোচদের প্রচলিত নামই ছিল 'রাজবংশী'। বুকাননের লেখা থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেও অনেক কোচ হিন্দুপ্রভাবের আওতায় আসেনি। মোটামুটি ভাবে বলা যায় এ প্রভাব সব চাইতে বেশি ছিল রঙপুরে। কিন্তু সেখানেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সর্বথ্যাপী ছিল না। ধর্মানুষ্ঠানে কলিতাদের পৌরোহিত্য তখনও কোথাও কোথাও অব্যাহত ছিল। 'পতিত' শ্রেণীর ব্রাহ্মণদেরও মাঝে মাঝে এ কাজে ডাকা হত।[৪৯] কোচদের আরও দুই সম্প্রদায়ের কথা বুকানন বলেছেন, যাদের মধ্যে হিন্দু প্রভাব ছিল নগণ্য। যেমন কেউ কেউ বাংলা ভাষা গ্রহণ করলেও কোচদের পুরনো নানা নাম বাতিল করেনি। অন্যান্যরা বাংলাই বলত না। 'জুম' পদ্ধতিতে তারা চাষ করত। হিন্দুপ্রভাব সেখানে একেবারে পৌঁছয়নি।

উপরের আলোচনায় আমরা রাজবংশী আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে ধারণার বিচার করতে চেয়েছি। স্পষ্টত এ ধারণা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। রিজলীর মতে, এ আন্দোলনের ফলে এক বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রায় সবাই অথবা এর বৃহত্তম অংশ পুরোপুরি হিন্দু হয়ে গেছে, এবং হিন্দুবর্ণপ্রথার মধ্যে একটা 'জাতি' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় এ আন্দোলন ছিল ভিন্ন চরিত্রের। আন্দোলনের মূল উদ্যোগ আদিবাসী জনসাধারণ থেকে আসেনি। ব্রিটিশ আমলের আগে রাজবংশী নাম ব্যবহারে প্রধান উৎসাহ ছিল রাজ-মর্যাদাকাঙ্ক্ষী উচ্চাভিলাষী কোন কোন ব্যক্তির। উদ্দেশ্য ছিল ঐবেধ উপায়ে পাওয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধকরণ। ব্রিটিশ যুগের 'রাজবংশী আন্দোলনে' মুখ্য ভূমিকা ছিল হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় সামাজিক প্রতিপত্তিকামী কোনও কোনও পরিবার, যারা প্রায় সবাই বৈষয়িক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তথাকথিত হিন্দুপ্রভাব তাই আদিবাসী গোষ্ঠীর একটা অংশে সীমাবদ্ধ ছিল।

এ সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণগুলির[৯১] একটি আগেই উল্লেখ করেছি। তা হল, রাজবংশী সমাজ মূলত শ্রেণীবিভক্ত সমাজ; বহু ক্ষেত্রে কৃষিউৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি আধিয়ারি প্রথা; সম্পন্ন, জোতদার রাজবংশী পরিবারের সংগে প্রধানত ভূমিহীন, নির্বিত্ত



আধিয়ার রাজবংশীদের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক অনিবার্য ছিল, যদিও কোন কোন বিশেষ অবস্থা ছাড়া এ বৈরিতা প্রকাশ্য সংঘর্ষে পরিণত হয়নি। তাই উচ্চবিত্ত রাজবংশী পরিবার পরিচালিত ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সংগে গরীব রাজবংশী সমাজের সহজ সহমর্মিতাবোধ গড়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয় কারণও প্রধানত অর্থনৈতিক। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের এক অপরিহার্য অংশ হিসাবে পরিকল্পিত, ব্যাপক সমাজসংস্কার কর্মসূচিও এ জন্যই স্বল্পবিত্ত রাজবংশীদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারেনি। এ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, রাজবংশী সমাজের অনেক প্রথা, আচার, রীতিনীতি উচ্চবর্গের হিন্দুদের কাছে গর্হিত মনে হত; ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা পেতে হলে তাই এ সব সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। যেমন — রাজবংশী নারীরা ঘরের বাইরে চাষবাস এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে নির্বিচারে অংশ নিত; একটু বেশি বয়সে মেয়েদের বিয়ে হত; বিধবা বিবাহ এখানে প্রচলিত প্রথা; নরনারীর যৌনসম্পর্ক ছিল অপেক্ষাকৃত অবাধ; এবং মদ্য জাতীয় পানীয় বা শুয়োরের মাংস খাওয়া সম্পর্কে কোন বাধানিষেধ ছিল না। এসব ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতাদের মনোভাব ছিল অনমনীয়। তারা নানাভাবে এ সব বন্ধ করতে চেষ্টা করেছে। তাদের নিষেধ অমান্য করার জন্য 'অপরাধী'দের সম্পর্কে গুরু শাস্তির বিধান ছিল, যেমন জরিমানা, জাতিচ্যুতি ইত্যাদি।

কিন্তু আধিয়ার, প্রান্তিক চাষী বা শ্রমজীবী রাজবংশী পরিবারের পক্ষে সমাজ-সংস্কারের এ সব কর্মসূচি মেনে নেওয়ার অর্থ সমূহ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার। কারণ, তাদের আয়ের একটা বড় অংশ আসত, নারীদের নানা ধরনের কায়িক শ্রম থেকে। তাছাড়া যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের জন্য উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ রীতি-সম্মত ছিল না, বা মদ্যপান বা শুয়োরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্যের সংগে তা মোটেই সংগতিপূর্ণ ছিল না।

কোন কোন সংস্কারকের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের উচ্চবিত্ত নেতারাই চায়নি যে রাজবংশী সমাজের সবাই এ সম্পর্কে সমান আগ্রহী হোক্; তারা নানা ভাবে চেষ্টা করেছে, এ সংস্কার একটা ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠীতেই সীমাবদ্ধ থাকুক। যেমন 'উপনয়ন', অর্থাৎ উপবীত ধারণ। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটা কর্মসূচি ছিল, রাজবংশী সমাজ উপবীত ধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে, কারণ এর ফলে 'ব্রাত্য' গোষ্ঠী হিসাবে তাদের দীর্ঘদিনের অবমাননা এবং হীনমন্যতাবোধ ঘুচবে। এ উপনয়ন অনুষ্ঠানের একটা অপরিহার্য অংশ ছিল এই যে তারা সম্মিলিতভাবে একটা বিশেষ জায়গায় ('মিলনক্ষেত্র') ব্রাহ্মণ্য মর্যাদার একটা বিশেষ প্রতীক উপবীত ধারণ করবে। প্রথম থেকেই অনেক গরীব রাজবংশী এ সম্পর্কে কোন উৎসাহ দেখায়নি। কারণ উপনয়ন অনুষ্ঠানের একটা অংগ, 'শুদ্ধি', ছিল ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু যেখানে তারা এ খরচ যোগাতে সমর্থ এবং সম্মত সেখানেও ক্ষত্রিয় আন্দোলনের নেতারা তাদের নিরুপায় করতে চেষ্টা করেছে; গরীব রাজবংশীদের থেকে নিজেদের সামাজিক দূরত্ব তারা এ ভাবে বজায় রাখতে চেয়েছে। ফলে এমনও ঘটেছে, উপনয়ন অনুষ্ঠানের পরেও অনেকেই উপবীত বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে।

বস্তুত উপবীত ধারণের অধিকার নিয়ে বিতর্ক এবং বিরোধের ফলে রাজবংশী সমাজে বিভেদ ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনটে আলাদা গোষ্ঠীতে রাজবংশী সমাজ ভাগ হয়ে যায়: উপবীতি, পতিত এবং অনুপবীতি। উপবীতিরা প্রধানত উচ্চবিত্ত রাজবংশী পরিবার; যারা উপবীত গ্রহণ করে কখনও বর্জন করেনি। 'পতিত' তিন তারা যারা উপবীত গ্রহণ করেও নানা কারণে তা ছাড়তে বাধ্য হয়। অনুপবীতিদের উপবীত ধারণ করার কোন অধিকার উচ্চবিত্ত রাজবংশী পরিবার স্বীকার করেনি। এ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ব্যবধান ক্রমেই দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে পড়ে; তা হিন্দুসমাজের 'উঁচু' এবং 'নিচু' জাতের মধ্যে ব্যবধানের মতোই। যেমন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পংক্তি ভোজন বা বৈবাহিক সম্পর্ক অসিদ্ধ। এ ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই রাজবংশীসমাজের শ্রেণীবিভাগও ক্রমেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। প্রধান শ্রেণী হিল তিনটি: 'ভদ্রলোক' বা বাবু; কোন এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাসকারী 'জোতদার' এবং আধিয়ার ও ভূমিহীন চাষী। সামাজিক প্রতিপত্তির দিক থেকে ভদ্রলোকেরাই ছিল সবার উপরে। জোতদারদের গ্রামসমাজের নেতা বলা যেতে পারে। তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ভূসম্পত্তি; ক্ষুদ্রচাষী, আধিয়ার এবং ভূমিহীন দিনমজুরদের উপর তাদের প্রভুত্ব কায়েম করা সম্ভব ছিল প্রধানত এ সম্পত্তির জোরেই।

রাজবংশী সমাজে হিন্দু প্রভাব তাই প্রতিপত্তিশালী কয়েকটা মাত্র পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে; বৃহৎ সমাজের সংগে এর যোগসূত্র ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। এটা আমরা বিশেষভাবে মনে রাখব, কারণ অন্যান্য প্রধান প্রধান আদিবাসী সমাজে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের পটভূমিকা এবং চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

### পাদটীকা

৪৮. বিশেষ করে গোবিন্দপুরের হরনাথ শাহী।

৪৯. শরৎচন্দ্র রায় (**The Mundas & their Country**, 1st Edn. Calcutta 1912) এর নানা নিদর্শনের মধ্যে মুণ্ডারী গানে বৈষ্ণব প্রভাবের কথা বলেছেন।

৫০. ডাল্টন, পূর্বোল্লেখিত; (Calcutta Reprint) পৃ: ১২০. 'Group Five: Hinduized Aborigines and Broken

Tribes.'

৫১. **Asiatic Researches** (London, 1882), পৃ: ১০২।

৫২. Risley, **Castes & Tribes...** 'Introductory Essay' তে উদ্ধৃত, পৃ: (iii)।

৫৩. Risley, **পূর্বোল্লেখিত;** 'Introductory Essay' পৃ: (xv-xviii)।

৫৪. বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের রঙপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং তরাই, কুচবিহার, এবং 'নিম্ন' আসামের গোয়ালপাড়া।

৫৫. প্রচলিত মত অনুযায়ী রাজবংশীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বৃহত্তর বোড়ো (Bodo) গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ, মেচ, পালিয়া, গারো, রাভা, লালঙ, মোরা, ধীমাল ইত্যাদি এ 'বোড়ো পরিবার'- এর অংশ। (চারুচন্দ্র সান্যাল, **The Rajbansis of North Bengal** (The Asiatic Society, Calcutta, 1965) প্রথম অধ্যায়ের অংশ: 'Historical and Ethnological Data'.)

৫৬. 'At the present day the name Kochh, without doubt the original designation of the Tribe, is so carefully tabooed in the districts where they are most numerous, and where there is every reason to believe them to represent the earliest permanent settlers, that in Kuch Behar itself at the census of 1881 not a single Kochh was to be found'. H.H.Risley, **The Castes and Tribes...** (Vol. I., P.491).

৫৭. 'In spite of their pretensions to be Kshatriyas, the social status of the Rajbansi is still extremely low, and no well known caste will take cooked food from their hands or smoke in their hookahs. In the Darjeeling Terai, where the caste is numerous, Hindus take water from them, but this is one of the concessions to circumstances of which caste custom offers many examples". H. Risley, **ibid**, P. 499.

৫৮. রিজলীর মন্তব্য: "There are said to be no zamindars among them, the fact probably being that all the zamindars who were originally Rajbansis have long ago got themselves transformed into Rajputs." **Ibid**, P. 499. জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং অঞ্চলে অবশ্য এদের অনেকেই ছিল বড় জোতের (জোতদারির) মালিক।

৫৯. 'The transformation of the Kochh into the Rajbansi... is a singular illustration of the influence exercised by fiction in the making of a caste.... Although there is no historical foundation for the claim of the Rajbansi to be a provincial variety of the Kshatriyas, the title Rajbansi serves much the same purpose for the lower strata of the Hindu population of Northern Bengal as the title Rajput does for the landholding classes of dubious origin all over India. The one term, like the other, serves as the sonorous designation of a large and heterogeneous group bound together by the common desire of social distinction." **Ibid**, p. 491.

৬০. রাজবংশী আন্দোলনের চরিত্রবিশ্লেষণে এক মূল্যবান সংযোজন Ranajit Das Gupta, **Economy, Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947** (Oxford University Press, Delhi, 1992) Chapter I এবং পৃ: 87-92, 126-28। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের আন্দোলনের জন্য: S. Taniguchi, 'The Rajbansi Community and the changing structure of landtenure in the Koch Bihar princely state', in S. Taniguchi et al (e d s) **Economic changes and Social Transformation in Modern and Contemporary South Asia** (Tokyo, 1994).

৬১. ১৮৯১ এবং ১৯০১— এ দু'বারের আদমশুমারিতেই রাজবংশীদের কোচ বলে উল্লেখ করা হয়। ১৮৯১-এর লোকগণনা শুরুর আগে রঙপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংগঠন রঙপুর ধর্মসভার মত জানতে চান। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেন, রাজবংশী এবং কোচ আলাদা 'জাতি'। এবং রাজবংশীদের 'ব্রাত্যক্ষত্রিয়' বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ১৯০১-এর লোকগণনায়ও তাদের কোচদের থেকে আলাদা করে দেখানো হয়নি। রণজিৎ দাশগুপ্তের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য: "It seems that opposition from sections of high caste Hindus was an important factor behind the rejection of the demand." R. Das Gupta, **op. cit,** পৃ: ৮৮।

৬২. **Ibid** পৃ: ৮৯-৯২।

৬৩. যেমন, রাজবংশী কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা হয়; সমবায় সমিতি গড়ে তোলার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া



হয়; হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণ বর্জন করার জন্য তাদের মধ্যে প্রচার করা হয়।

৬৪. জোতদার-স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রস্তাব রাজবংশী নেতৃত্ব সাধারণত অনুমোদন করেনি। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে (১৮৮৫) একটা সংশোধনের প্রস্তাব নিয়ে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বির্তক হয়। ১৮৮৫ সালের আইনে জমিতে ভাগচাষীদের কোন অধিকারের কথা বলা হয়নি। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাগচাষীর অধিকার দেওয়া হোক। আইন পরিষদে রাজবংশী সদস্য এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। অথচ জোতদারের স্বার্থে জমিদারদের ক্ষমতা খর্ব করার প্রশ্নে রাজবংশী নেতারা ছিল পরম উৎসাহী। R. Das Gupta, **op. cit,** পৃ: ১২৮।

৬৫. S. Taniguchi, পূর্বোল্লেখিত; পৃ: ৫৭-৭২।

৬৬. বুকাননের মতে এদের স্থানীয় নাম ছিল 'বর্ণ-ব্রাহ্মণ'। বুকাননের আসামের উপর বিবরণেও এদের উল্লেখ আছে। তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয়, এরা কেউ স্থানীয় নয়; বাইরের কোন জায়গা থেকে তাদের আনা হয়েছিল। এদের নাম ছিল 'বৈদিক ব্রাহ্মণ'। এদের একটা অংশ পরে 'পতিত' বলে গণ্য হয়। বুকাননের এ সম্পর্কিত আলোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি: 'Many Kamrupi Vaidika Brahmins are now settled in Assam and it is said that among them there are many persons learned in Hindu science.... some of the Vaidiks in this Country have degraded themselves, have become Varna, and instruct the impure tribes, a meanness to which none of those in Bengal have submitted." Francis (Buchanan) Hamilton, **An Account of Assam** (compiled in 1807-1814), (Department of Historical and Antiquarian Studies, Assam, Gauhati, 1963), পৃ: ৫২।

৬৭. এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক একটা প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Sibsankar Mukherjee, 'The Social Role of a Caste Association', **The Indian Economic and Social History Review**, Jan-March 1994.

## গ্রন্থ সমালোচনা

# বাঙালি হিন্দু-মুসলমান : সমন্বয় ও দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কি মহম্মদ ঘোরীর ১১৯২ খ্রি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ের পর ভারতে মুসলমান শাসক বংশের প্রতিষ্ঠা ধরে নেওয়া হয়। তেমনি অপর এক তুর্কি ভাগ্যান্বেষী বখতিয়ার খিলজীর ১২০৪ খ্রি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সতর্কতার অভাবের সুযোগ নিয়ে নবদ্বীপের রাজপ্রাসাদ দখল করার পর বঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। অবশ্য ভারতবাসীর ইসলামের সঙ্গে পরিচয় আরও প্রাচীন। সেটা ইসলামী নব্য ধর্ম প্রচারকদের কারণে। লুণ্ঠক, শাসক বা বিজেতা হিসাবে ইসলামধর্মী সেনাপতিরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও নব্য ধর্মের নিদর্শন ইসলামের প্রতি কিন্তু সেকালের ভারতবাসী তেমন কোন প্রতিরোধ জ্ঞাপন করেননি। এ ধর্মকে স্বাগত জানিয়েছিলেনও বলা যায়। একে আমাদের পূর্বজদের সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার নিদর্শন আখ্যা দিতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

শাসক শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় ব্যাপক ও অনুভূতিগ্রাহ্য রূপে এদেশে ইসলামের উপস্থিতির আটশ বছরের মতো কালও কম নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক সমন্বয় প্রক্রিয়ার জন্য এর মধ্যে ইসলাম ভারতকে প্রভাবিত করেছে এবং আরব দেশে আরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে উদ্ভূত ও ইরান তুরস্ক হয়ে ভারতে আসার পথে স্থানিক প্রভাবে বিবর্তিত ইসলাম এদেশের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। ভারত কেন, বিশ্বের কুত্রাপি ইসলামের আদি আরবীয় রূপ বজায় নেই এবং দেশে দেশে ও যুগে যুগে ইসলামী মৌলবাদীদের (সদর্থে) চেষ্টা সত্ত্বেও আদি রূপে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কালের প্রভাব সর্বোপরি কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। ভারতে ইসলামের প্রভাবের সর্বাপেক্ষা দৃষ্টিগোচর নিদর্শন হল বহু সংখ্যক ভারতবাসীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ। ভারতে আরব, ইরান, তুরস্ক বা আফগানিস্তানের মুসলমানদের বংশধরদের তুলনায় মূল ভারতীয় থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের উত্তরসূরীদের সংখ্যা বহু গুণ বেশি।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত বিশ্বাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে ভারতে ইসলাম প্রচারিত হয়। কিন্তু এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। জোর জবরদস্তি করে শাসক মুসলমানরা কিছু ভারতবাসীর ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন ঠিকই। শাসকদের কাছে থেকে অনুগ্রহ প্রাপ্তির লোভেও কিছু কিছু ভারতীয় ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন। কিন্তু ঐসব বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ভারতে ইসলামের ব্যাপক প্রচারের ব্যাখ্যা করা যায় না। দিল্লী-আগ্রা-উত্তর প্রদেশের ব্যাপক অঞ্চলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের রাজত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকলেও তুলনায় বঙ্গদেশ ও কেরলে অধিক সংখ্যক ভারতবাসী কেন ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তার সূত্রও প্রচলিত বিশ্বাসে মেলে না। ভারতে ইসলামের ব্যাপক স্বীকৃতির কারণ সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। একাধিক বার তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে হিন্দু সমাজের জাতপাত বিভক্ত রূপ ও তথাকথিত উচ্চ বর্ণ কর্তৃক নিম্ন বর্ণদের কেবল প্রচণ্ড শোষণই নয়, তাদের মনুষ্যেতর জীব হিসাবে বিবেচনা করার জন্যই দলে দলে ভারতীয় নবাগত ধর্মের শরণ নিয়েছিল। বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাসের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান পর্বে বৌদ্ধদের প্রতি দারুণ অত্যাচারও তাদের শাসকদের ধর্ম ইসলামের শরণাগত হতে অনুপ্রাণিত করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গোড়া থেকেই ইসলামের সঙ্গে ভারতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্বন্ধ। একেই হয়ত মনোবিজ্ঞানীরা love-hate সম্বন্ধ বলে থাকেন। এই সম্পর্কের ধারা আমাদের বঙ্গদেশেও।

প্রথম যুগে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সাধক বিদেশি ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা বাংলার হিন্দু মুসলমানদের সঠিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছি। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর পর্বেও জাতীয়তাবাদের আবেগ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখায় এ সম্পর্কের সত্য মূল্যায়ন হয়নি। আর স্বাধীনতা-উত্তর কালেও রাজনীতি আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে আবিল করায় এদেশে হিন্দু মুসলমানের সঠিক সম্পর্কটা আমরা দেখেও দেখতে চাইনি। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর কালে যা সব থেকে বেশি জরুরি ছিল — হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ দৃঢ় বাস্তব ভিত্তির উপর গড়ে ওঠেনি। তাই বাংলা সহ ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের বাস্তব বিজ্ঞানসম্মত সম্পর্কের ইতিহাসের আলোচনা হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় এক জাতীয় কর্তব্য। এই দিক থেকে ড. নজরুল ইসলামের আমাদের মাতৃভাষায় রচিত এই গবেষণাগ্রন্থ এক উল্লেখযোগ্য সারস্বত প্রয়াস, একথা সূচনায়ই স্বীকার করতে হবে।

॥ ২ ॥

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে (প্রাচীন যুগ : যখন কোন মুসলমান



ছিল না) দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম ও ধর্মীয় সংঘাত শীর্ষকে লেখক কুশলতা সহকারে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের পটভূমি রচনা করেছেন। এর মধ্যে শেষ প্রসঙ্গটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ লেখক এই অধ্যায়ে অপর একটি অতিকথা দূর করার চেষ্টা করেছেন। অতিকথাটি হল — ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশের সব ধর্মাবলম্বীরাই মিলে মিশে থাকতেন। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত সনাতনধর্মীদের (পরে আরব ও পারস্যের অভিযাত্রীরা সিন্ধু নদের তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দা বলে এক সম্মিলিত অভিধা 'হিন্দু' নামে এঁদের পরিচিত করেন) ভিতরই কেবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল না। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীনকারী বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গেও সনাতনধর্মীদের বহুবিধ সংঘাত ও সংঘর্ষ ঘটেছে। তবে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মাধ্যমেই যে সমন্বয় প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং বাংলার সমাজেও যে অনুরূপ ঘটেছিল, তা লেখকের অভিজ্ঞ দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বৌদ্ধ পাল রাজাদের ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ''ব্রাহ্মণ- মন্দির-দেবস্থানকেও ভূমিদান'', স্বস্তিক নামে রাজকর্মচারীর নিযুক্তির উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে পাল রাজাদের সময়ে ''ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব প্রজার প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টি ছিল'' (পৃ ৩৫)। বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে সহনশীলতার এরকম আরও অনেক উদাহরণ লেখক উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় বঙ্গের হিন্দু সমাজের জাত ও বর্ণের ভিত্তিতে স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে প্রাক্ মুসলিম যুগে উত্তরণের ছকটিও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অতঃপর লেখকের ভাষায় ''ভিনপ্রদেশী সেন শাসনের স্থলে ভিনদেশী মুসলমান শাসন কায়েম'' হবার পর্ব ''যখন বাংলার অর্ধেক লোক মুসলমান হয়ে গেল।'' এক দিকে বৌদ্ধ ও সনাতনীদের বিবাদ এবং অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসিত সনাতনীদের মধ্যেও কেবল ছত্রিশ নয়, আর অনেক জাত-পাতের ভেদাভেদ যা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ও জলচল ও অচল পর্যন্ত উপনীত হয়েছিল, তাতে ইসলামের মতো সাম্যের বাণীর প্রচারক ও নবীন প্রাণশক্তিতে ভরপুর ধর্মের পক্ষে বঙ্গে শিকড় গাড়ার এক অনুকূল ক্ষেত্র জুটে গেল।

''বাংলার সুলতান-সুবেদাররা ইসলামী বিধি অনুসারে দেশ শাসন করতেন। ইসলামী বিধি অনুসারে শাসক 'আমেরুল মোমেনিন' অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলমানগণের নেতা এবং মুসলমানদের দ্বারাই তাঁর নির্বাচিত হবার কথা, কিন্তু ওমায়েদদের কাল থেকেই রাজপদ বংশগত হয়ে পড়েছিল। আব্বাসীয়রাও সেটা মেনে নিয়েছিল। তবে বাস্তবে শুধু বংশগত নয়, অস্ত্রবল ঠিক করে দিত শাসক কে হবে'' (পৃ ৪৮)। বঙ্গদেশ তথা বিশ্বের সর্বত্র ''সাহাবা''-উত্তর ইসলামী শাসনের চারিত্রধর্মের পূর্বোদ্ধৃত বৈশিষ্ট্য পাঠকের বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। কারণ কেবল এই নয় যে ইসলামের আদি আরব রূপ থেকে এ এক উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি। মনোযোগ দেবার বিশেষ কারণ হল সব কিছুর মতো ইসলামের উপরও দেশকালের প্রভাব— প্রকৃতির যে শক্তির প্রভাব এড়াবার ক্ষমতা কারও নেই।

যাই হোক বঙ্গের বিদেশাগত ইসলামধর্মী শাসকদের শাসন ব্যবস্থায় দেশীয় হিন্দুদেরও যে একটা বড় ভূমিকা ছিল — তাঁরা ছোট বড় রাজকর্মচারী হিসাবে ভিন্নধর্মী শাসকদের সহায়তা সহযোগিতা করেছিলেন, তার বহুবিধ প্রমাণ লেখক দিয়েছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও তিনি তুলে ধরেছেন যে ''সেন শাসনের উচ্ছেদে জনসাধারণের মনে কোন ক্ষোভের সঞ্চার হয়নি। বৌদ্ধরা তো খুশীই হয়েছিল।'' (পৃ ৪৯) ''তথাকথিত নিম্নবর্গের জনসাধারণ বা অন্ত্যজ পতিতদেরও সেন শাসনের প্রতি কোন মোহ ছিল না। বরং মুসলমান শাসন তাদের ব্রাহ্মণ্য নির্যাতন এবং সামাজিক অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতির সুযোগ দিল। সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞার ফলে যেসব মৎসজীবীরা শহরে যেতে পারছিল না তারাও খুশি হল। ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমী সমাজে যেসব অস্পৃশ্য লোকেরা এত দিন মানুষের সম্মান পায়নি, ইসলাম তাদের সামনে আশার আলো নিয়ে এল। দলে দলে তারা মুসলমান হয়ে যেতে লাগল।'' (পৃ ৫১)

পরবর্তী অধ্যায়টি (কী করে অর্ধেক বাঙালি মুসলমান হয়ে গেল) মাত্র সাত পৃষ্ঠার হলেও এর গুরুত্ব সমধিক। বর্তমান আলোচনার সূচনায় ভারতে ইসলামের প্রসারের কারণ আবিষ্কার প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের যে অভিমতের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত ও তথ্যনির্ভর সমর্থন মেলে এই অধ্যায়ে। ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানপ্রেমীদের অভিনিবেশ সহকারে পঠনীয় এই অধ্যায়টিতে উপস্থাপিত একটি তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এই মূল্যবান অধ্যায়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করা হবে। উদ্ধৃতিটি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের এবং নিম্নরূপ :

হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।

''আপনে আসিয়া'' ও ''ইচ্ছায়'' শব্দগুলির তাৎপর্য লক্ষ্যণীয়।

পরবর্তী অধ্যায় দুটি যথাক্রমে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের সমাজের অবস্থা বর্ণনা যেহেতু বাংলার অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তরিত এবং কোরান ও হাদিসের মতো মূল ইসলামী সাহিত্য আরবীতে রচিত হওয়ায় অধিকাংশ বাঙালি

মুসলমান তা পড়তে অক্ষম (আর সে কালে শিক্ষার প্রসার কতটুকুই বা হয়েছিল), তাই ইসলামের কয়েকটি মূল বিধি পালন করা ছাড়া সামাজিক আচার ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বতন ধ্যানধারণা রয়ে গেল। আর সেসব তাঁদের পূর্বতন বিশ্বাসেরই জের এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে ভারতের ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য — বৃত্তিভিত্তিক উচ্চ নীচ জাতপ্রথার কথাও স্বভাবতই এসেছে, তেমনই অবস্থার ফেরে জাতপাত বিচারে স্থান পরিবর্তনের বাস্তব অবস্থাও লেখক বর্ণনা করেছেন। ''হিন্দু'' শব্দটির উদ্ভব ও তার অর্থের বিবর্তনের (''হিন্দু বলতে মধ্যযুগের প্রথম দিকে এদেশের সব লোককে বোঝাত। পরবর্তী কালে একটা সম্প্রদায়কে বোঝায়।'' পৃ ৬৫) ইতিহাস বিবৃত করার পর লেখক হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ, কৌলিন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহ এবং সে সবের সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ ঘেঁটে লেখক বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন নিজ বক্তব্যের সমর্থনে।

॥ ৩ ॥

অতঃপর ''হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক'' প্রসঙ্গ। এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে প্রশংসা করতে হয় লেখকের খোলা মন ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ ইতিহাসচেতনাকে। কোন রকম আবেগ বা পূর্বগ্রহ চালিত না হয়ে তিনি সহজ সত্য কথা স্বীকার করে বলেছেন, ''হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের অন্যতম কারণ দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্নতা। এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা এবং সামাজিক রীতি-নীতি অন্য সম্প্রদায়ের থেকে যে শুধু আলাদা, তাই নয়। অনেক সময়ে তা সম্পূর্ণ বিপরীত'' (পৃ ৭১)। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বিগত আট শতাব্দীতে প্রাকৃতিক স্বাভাবিক বিধানে যে নিরন্তর সমন্বয় ঘটেছে, তৎসত্ত্বেও এই পার্থক্য এক বাস্তব সত্য। ড. ইসলাম এরকম বারোটি মৌলিক পার্থক্যকে তালিকাবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মুসলমান শাসক ও বিজেতাদের দ্বারা হিন্দু দেবস্থান ধ্বংস ও তাঁদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা হরণের বহু ঘটনারও উল্লেখ করেছেন লেখক সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসকারের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। অনুরূপভাবে শাসক ও বিজেতাদের দ্বারা ''ছলে বলে কৌশলে'' হিন্দুনারীদের নিজ অন্তঃপুরে গ্রহণের কথাও বলেছেন তিনি। তবে এই প্রসঙ্গে একটি বাস্তব দিকের উল্লেখ করলে ঐসব ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য বুঝতে সাহায্য হত। ইরান-তুরান-আফগানিস্তানের থেকে দুর্গম পথ অতিক্রম করে যে অভিযাত্রীরা ভারতে এসেছিল, তাদের পক্ষে স্বভাবতই স্বদেশের নারীদের সঙ্গে আনা দুরূহ ছিল। আর ইসলামী সমাজে নারীর পর্দাপ্রথার জন্য যাতায়াতের ঐ অসুবিধার দিনে দুর্গম-দুস্তর পথে নারীদের যোদ্ধবর্গের সঙ্গী হবার কথাই উঠত না। অথচ দীর্ঘকাল নারীসঙ্গবিহীন হয়ে কাটানো মানুষের প্রকৃতি নয়, বিশেষ করে যখন অভিযাত্রীরা অনেকেই এদেশে বসতি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এদেশে গৃহ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাই গৃহিণী সংগ্রহেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে মুসলমান শাসকদের অধীনে হিন্দুদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের (জিম্মি) স্থান দেওয়া ও তাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনও এক বাস্তব সত্য।

এই প্রসঙ্গে লেখক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর প্রথমটি হল : ''মধ্যযুগের সাহিত্যে মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর ওপর যেসব অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই মুসলমান শাসক বা রাজকর্মচারী কর্তৃক হিন্দু জমিদার, ইজারাদার বা ব্রাহ্মণের ওপর। সাধারণ মুসলমান কর্তৃক হিন্দুর ওপর অত্যাচারের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জমিদার-ইজারাদারদের অত্যাচারের কারণ বৈষয়িক। আর ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচারের কারণ গৌড়ের সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণরাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ষড়যন্ত্র'' (পৃ ৮১)। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, ''দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা মুসলমান সুলতান, সুবাদার বা নবাবের হাতে থাকলেও, জনসাধারণ যাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল সেই জমিদার এবং রাজারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। ... সেইজন্য ড. শহীদুল্লা বলেছেন 'তখন প্রত্যক্ষ ভাবে প্রজাকে শাসন-পোষণ ও শোষণ-পীড়নের নির্দ্বন্দ্ব অধিকার ছিল স্থানীয় হিন্দু সামন্তদেরই''' (পৃ ৮২)। তৃতীয়ত মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যে মুসলমান শাসকদের যেমন অত্যাচারী ও পীড়নকারী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা সর্বতো সত্য নয় (পৃ ৮২-৮৫)। এক্ষেত্রে ড. নজরুল ইসলামের যুক্তিতর্কসমূহ সবিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

পরবর্তী ছটি পৃষ্ঠা (৮৬-৯১) খুবই মূল্যবান এইজন্য যে তিনি ভাবালুতা বা কল্পনার উপর নির্ভর না করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের সঠিক চারিত্রধর্ম এই উপ-অধ্যায়ে তুলে ধরেছেন। রাজনীতি ও প্রশাসনব্যবস্থা ছাড়াও পোষাক, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ, পূজা-উৎসব — সর্বত্রই এই ''দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'' প্রবণতা। এরই সুপরিগণিত একদিকে লোকশিল্পীদের রচনায় ও অন্যদিকে সহজিয়া সাধকদের বাণীতে। এর দুটি উদ্ধীপক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডির দড়ি।
কেহ আল্লা বলে আর কেহ বলে হরি॥
বিসমিল্লা আর ছিরিবিষ্টু একই গেয়ান।
দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহিমান॥
(মলুয়া পালা)

অপর উদ্ধৃতিটি বাংলার চিরায়ত সম্পদ :



তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে,
তোমার ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

পরবর্তী ''ভাষা ও সাহিত্য'' শীর্ষক অধ্যায়টিতে লেখক বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ ভূমিকার ইতিবৃত্ত দিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের এই মিলিত সম্পদের সঞ্চয় করে উভয় বঙ্গের বাঙালি-বাংলাদেশি এক দিকে সংস্কৃত এবং অন্য দিকে আরবি, ফার্সি এবং এমন কি এক ভারতীয় ভাষা উর্দুকে পশ্চাৎপটে সরিয়ে রেখে। হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সাধনার ধন এই ''আ মরি বাংলা ভাষা'' কেবল তাবৎ বাঙালির মিলনসূত্রই নয়, বাঙালি-বাংলাদেশি ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যে কোন রকমের আক্রমণ রোখার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যমও। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম যথার্থই বলেছিলেন :

যেসবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায়।

॥ ৪ ॥

পলাশীর যুদ্ধ ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নেতৃত্বে ইংরেজদের বিজয় এদেশকে কেবল আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তেই উপনীত করল না, হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নবদিগন্তও সূচিত হল। পরবর্তী একশো ছয় পৃষ্ঠায় লেখক ''যখন হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হল'' শীর্ষকে চারটি অধ্যায়ে এই অবস্থার বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে শেষের দুটি ধাপ — কোম্পানির শাসনের একশো বছরে হিন্দু মুসলমানের অবস্থার পরিবর্তন ও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য অধ্যায় দুটি সবিশেষ মূল্যবান।

বিদেশি, বিধর্মী ও বিভাষী শাসকদের সঙ্গে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে স্থানীয় জনসাধারণের লেন-দেন ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া শুরু হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও দ্বন্দ্বেরও অস্তিত্ব ছিল। সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান সমানভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়লেও যেহেতু শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সামনে রেখে বিদ্রোহীরা নিজেদের কাজের বৈধানিক সমর্থন খুঁজেছিলেন, তাই স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভেদনীতির খেলার প্রথম পর্যায়ে তাদের কাছে মুসলমানরা অবাঞ্ছিত এবং হিন্দুরা কৃপাপাত্র ছিল। তাঁরা রাজার জাত এবং তাদের হাত থেকে ইংরেজ শাসন ক্ষমতা অধিকার করেছে এই অহমিকা চালিত হয়ে মোগল ও অযোধ্যার নবাবদের উর্দুভাষী অভিজাত নেতৃবৃন্দ (পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যবাদীরা এদেরই natural leader-এর মর্যাদা দেয়) ইংরেজ ও ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। বিজ্ঞানের একটা বড় সূত্র হল — প্রকৃতি শূন্যতা থাকতে দেয় না। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও এ সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। শূন্যতা দূর করার জন্য হিন্দুরা এগিয়ে এলেন এবং ব্রিটিশ শাসনে ধর্মীয় কারণে ভেদাভেদের স্থান না থাকায় সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়ক রূপে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করার সঙ্গে চাকুরি ও ব্যবসার দ্বারা বিত্তবান হবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা হিন্দুদের মধ্যে নবজাগরণের সৃষ্টি হল। এ নবজাগরণ মুসলমান কেন, হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণকে স্পর্শ করেনি বলে এর সুবিভুক্ত দুর্বলতার প্রতি লেখক যথাযথ ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আধুনিক যুগে উপনীত হবার পথে এর গুরুত্ব হ্রাস পায় না।

প্রায় পঞ্চাশ বছর সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরা এই ভাবে পিছিয়ে থাকার পর স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে উন্নতির পথ গ্রহণ করলেন। ফলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে শাসিত হিসাবে যতটুকু পাওয়া সম্ভব তা পাবার পর পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হিন্দুদের মনে যখন সমানাধিকারের দাবি উঠল এবং স্বভাবতই তা যখন শাসকদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হল, স্যার সৈয়দের নেতৃত্বাধীন উত্তর ভারতের উর্দুভাষী মুসলমানেরা তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হলেন না। পশ্চিমের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রভাবে ভৌগোলিক সীমার যে জাতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এদেশে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে হওয়া শুরু হয়েছিল, সম্প্রদায়ের স্বার্থে স্যার সৈয়দ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তার বিরোধিতা করলেন। ইসলামের শিক্ষায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার একটা প্রবণতা বরাবরই আছে এবং ফরাজি ও ওহাবি আন্দোলনের প্রভাবে আদি ইসলামে ফিরে যাবার ধুয়ো তুলে তা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রবল হয়েছিল। তারপর হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংলন্ড ও ইউরোপের আদর্শে স্বায়ত্বশাসনের দাবি স্যার সৈয়দের কংগ্রেসের সর্ব সম্প্রদায়ের মিলিত জাতীয়তাবাদের বিরোধিতার পটভূমিকায় মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিল।

এ ব্যাপারে হিন্দু জাগরণেরও (তবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে একই শ্রেণীভুক্ত করার লেখকের ব্যাখ্যাকে স্বীকার করা যায় না— পৃ ১৬৭) ভূমিকা ছিল। দয়ানন্দের আর্যসমাজ আন্দোলনের নগ্ন মুসলিম বিদ্বেষ, আর্য সমাজীদের দ্বারা প্রবর্তিত গোরক্ষা আন্দোলনের নামে মুসলমানবিরোধী দাঙ্গা ও কাশীর ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর অনুবর্তীদের দ্বারা উত্তর প্রদেশের শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের ভাষা উর্দুর বদলে সংস্কৃত ঘেঁষা নাগরী লিপিতে লিখিত হিন্দি প্রবর্তনের আন্দোলন। জীবনের শেষ

বছরগুলিতে স্যার সৈয়দ মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক সম্প্রদায়েও পরিণত করার যে প্রয়াস আরম্ভ করেছিলেন (১৮৬৮ খ্রি কংগ্রেসের সভাপতি বোম্বাই-এর আইনজীবী বদরুদ্দীন তৈয়বজীর মোগল অভিজাতদের প্রতিনিধি স্যার সৈয়দকে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার যে আমন্ত্রণ জানান এবং স্যার সৈয়দ অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার তাঁর যে অভিমতের উল্লেখ করেন, লেখক ১৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় তার সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা আর একটু বিস্তারিত হলে বিষয়টি ভাল ভাবে বোঝার সহায়ক হত), তাঁর ভাবশিষ্যবর্গ ও আলিগড় কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ থিওডর মরিসনের (পরবর্তী কালে সরকারি সম্মান পাবার জন্য এঁকে সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট মনে করা অনুচিত নয়) চেষ্টায় তা বড়লাট লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচন ব্যবস্থার দাবিতে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৯ খ্রি শাসন সংস্কারে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হবার পর তো সাম্প্রদায়িকতার সমগ্র দেশে ছুটে বেড়ানোর রাজপথ তৈরি হয়ে গেল। মোগল অভিজাতদের উত্তরসূরী উত্তর ভারতের উর্দুভাষী জমিদার-তালুকদার শ্রেণীর প্রতিনিধি স্যার সৈয়দ ও তাঁর আলিগড় গোষ্ঠীর পূর্বোক্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী ভূমিকার আরও বিস্তারিত আলোচনা এ জাতীয় একটি মূল্যবান গ্রন্থে অপেক্ষিত ছিল।

তবে কী পাইনি তার হিসাব মিলিয়ে লাভ নেই। এই একশো ছয় পৃষ্ঠায় পাঠক পেয়েছেনও প্রচুর। "মুসলমানদের বিশেষ মর্যাদা ও রাজনৈতিক গুরুত্বের" তথাকথিত দাবি মেনে নিয়ে "অতীতের শাসক সম্প্রদায়কে" স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের লগ্নে যাতে সংখ্যাল্পতার জন্য সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধীন না হতে হয় তার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ভেদনীতির খেলায় যে নতুন পর্বের সূচনা হয় তার নিদর্শন মেলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে এক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন এবং পরবর্তী বৎসরের (১৯০৬) বড়লাট মিন্টোর কাছে আগা খাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলমানদের প্রতিনিধিমণ্ডলের দাবি অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য কেবল পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাই নয়, আইনসভায় জন সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন বরাদ্দ করাতেও। ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা হয়, অনতিবিলম্বে তার পরিণাম দেখা যায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও সমাজের সর্বস্তরে (এমনকি সাহিত্যেও) সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের মাধ্যমে। পশ্চাৎপটের সঙ্গে এই পর্বের ইতিহাস অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক এই একশো ছয় পৃষ্ঠার মধ্যে। শিবাজী উৎসবের মূল্যায়ন, সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা (হিন্দু লেখকদের মুসলমান ও মুসলমান লেখকদের হিন্দুবিদ্বেষ) ছাড়াও ইংরেজ লেখক টড ও হান্টারের অপকৌশল, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী সংগঠন সমূহের কার্যকলাপ ও সব কিছুর পরিণামে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিস্তার নিরপেক্ষ ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন।

"বিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়টি পূর্ববর্তী বক্তব্যেরই সম্পূরক। বঙ্গভঙ্গ-বর্জন স্বদেশী-সন্ত্রাসবাদী ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক থেকে শুরু করে খিলাফৎ-অসহযোগ-আইন অমান্য আন্দোলন ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবেচনার পর তিনি ভেদনীতির খেলার চূড়ান্ত পর্ব — বাংলার রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রাধান্যলাভ ও দেশবিভাগে উপনীত হয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের একশো কোটিরও বেশি মানুষকে আগামী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত যে ভূকম্পসদৃশ ঘটনা সর্বাধিক আলোড়িত করবে, তার সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য উপস্থাপিত করার প্রসঙ্গে তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপকতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। লেখক কর্তৃক উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বন্ধে অবহিত হবার সময়ে বিষাদাপ্লুত চিত্তে মনে হয় যে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে শতাব্দীর গোড়ার দিকে "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে সদুপদেশ দিয়েছিলেন, তার প্রতি আমরা গুরুত্ব না দেবার পাপের ফলভোগ করছি।

"দেশভাগের পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" অধ্যায়টির দ্বারা লেখক তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটিরও উপসংহার টেনেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই জঙ্গী (এবং মেকি) হিন্দুত্বের সৃষ্টি এবং তার পরিণামে দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কের অধোগতি ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করে জাতীয় সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সংগঠিত সাম্প্রদায়িকতার কথা বলার প্রসঙ্গে সঙ্ঘপরিবারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কুকর্মের কাহিনী বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিন, ইসলামিক সেবক সঙ্ঘ, মুসলিম লীগ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের ও কোন এক বিখ্যাত মসজিদের ইমামের অনুরূপ কট্টর সাম্প্রদায়িক ভূমিকার কথা উল্লেখ না করা একটি বড় রকমের বিচ্যুতি হিসাবে পরিগণিত হবে। এই ত্রুটিকে অবশ্য আমরা পক্ষপাতমূলক বলব না। কারণ বহু সৎসাহসের সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় রকমের অপ্রিয় সত্য ব্যক্ত করার সত্যনিষ্ঠা যিনি দেখাতে পারেন, তাঁকে কোন মতে পক্ষপাতদুষ্ট বলা যায় না। সংক্ষিপ্ত একটি উদ্ধৃতিতে এর প্রমাণ মিলবে। "একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা ভারতের প্রতি না হয়ে পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন (পৃ ২৮৬)।



বলাবাহুল্য "কিছু লোক" মানে সমাজের সবাই বা অধিকাংশ নন এটা যুক্তিশীল ব্যক্তিরা বুঝবেন। যাই হোক লেখক পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে এর উৎস — এই মর্মে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর ইঙ্গিত করা পথরেখা ধরে আরও একটু এগোলে আমরা দেখব এ প্রশ্ন ভারতের মুসলমানদের অস্মিতার অন্তর্দ্বন্দ্বের — তাঁরা প্রথমে ভারতীয় না সর্বাগ্রে মুসলমান? প্যান ইসলাম মানসিকতার এই জের কেবল এদেশের মুসলমানদেরই পীড়িত করছে না, বাংলাদেশের মুসলমানরা — যে রাষ্ট্রে তাঁরা প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ — সেখানেও তাঁরা এই ব্যাধিতে ভুগছেন। আধুনিক "নেশন স্টেট"-এর ধারণার সঙ্গে প্যান-ইসলাম এবং এমনকি তার প্রসাধন করা মুখমণ্ডল অর্গানিজেশান অফ ইসলামিক কনফারেন্স যে খাপ খায় না এটা সব দেশের শিক্ষিত মুসলমানদের বোঝার সময় এসেছে।

এই পর্যায়ের অপর একটি ত্রুটির কথা বলে উপসংহারে উপনীত হব। লেখক ২৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন: "...হিন্দু মহাসভা এমনকি কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবেও অবিভক্ত বাংলাকে সমর্থন করতে পারেনি। কারণ তারা বুঝেছিল যে অবিভক্ত বাংলা ভারতে থাকলেও সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য মুসলমানদের প্রাধান্য থাকবে। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী একজন মুসলমানই হবে। ...প্রশাসন মুসলমানদের হাতেই থাকবে।" কংগ্রেসের শতবিধ দোষ ও দুর্বলতা থাকলেও এজাতীয় এক যুক্তিবাদী ও মূলত ইতিহাসনিষ্ঠ গ্রন্থে কোন রকম সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করা অনুচিত হয়েছে। লেখকের ধারণার কিছু বিরুদ্ধ প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ খ্রি কংগ্রেসি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাসমূহে একাধিক মুসলমান নেতা গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছিলেন এবং তারা যোগ্যতা সহকারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এমন কি কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীর পদও একজন মুসলমান অলঙ্কৃত করেছিলেন — একথা সর্বজনবিদিত। আমরা উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের খাঁ সাহেবের প্রতি ইঙ্গিত করছি। এছাড়া সিন্ধুতে আল্লা বকস ও জি. এম. সৈয়দ এবং পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট (তখনকার) প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খাঁ-ও প্রয়োজনে কংগ্রেসি সমর্থন পেয়েছিলেন। বঙ্গেও কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু একদা হক্ সাহেবের নেতৃত্বে কাজ করেছিলেন এবং লীগের আবুল হাশিম ও সুরাবর্দীর সার্বভৌম বঙ্গের আন্দোলন অন্তত সাময়িক ভাবেও দানা বাঁধত না, শরৎবাবুর সমর্থন প্রাপ্ত না হলে। আসলে ব্যাপারটা হিন্দু মুসলমানের বিবাদের ক্ষেত্রের নয়। এর মূল কারণ ক্ষমতার লড়াই। তার জন্য ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পক্ষেরা সুযোগ মতো ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাত-পাত এবং এমন কি শ্রেণীসংগ্রামের পর্যন্ত অন্তরালে নিজেদের আসল লক্ষ্য গোপন করে শনৈঃ শনৈঃ অভীষ্টের অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে।

সর্বশেষে ড. ইসলাম "উত্তরণের উপায়" শীর্ষক হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে সুস্থ ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার প্রস্তাব দিয়েছেন। এক প্রবীণ সাংবাদিকের বিশ দফার দীর্ঘ মেয়াদী প্রস্তাব উদ্ধৃত করার পর বাস্তববুদ্ধি চালিত হয়ে তার মধ্যে অবিলম্বে করণীয় ও করা সম্ভব পদক্ষেপগুলির উপর সঙ্গতভাবেই লেখক জোর দিয়েছেন। এগুলি হল এদেশের মুসলমানদের ভালভাবে বুঝে নেওয়া যে তাঁরা মূলত বহিরাগত নন, এদেশেরই সন্তান এবং এদেশের ভাল-মন্দের সঙ্গে তাঁদেরও মঙ্গল-অমঙ্গল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এদেশের সন্তান বলে ভারতের প্রাক্-ইসলামী ঐতিহ্যেও তাঁদের সমান অধিকার। এদেশের ভাষা ও সাহিত্যেও তাদের তেমনই তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদ। এর সঙ্গে অপর যে কথাটি যোগ করা উচিত ছিল তা হল নিজ স্বার্থে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইন বা বাবরি মসজিদ জাতীয় আবেগের রাজনীতির বদলে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অনুরূপ যুক্তিযুক্ত উপদেশ তাঁর হিন্দুদের প্রতিও। তাঁর শেষ কথা হল: "ধর্মাচরণকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখে দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বন করে এক সাথে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হবে।" এ কেবল তার আশাই নয়, বাংলা সহ ভারতীয় উপমহাদেশের একশো কোটিরও উপর নর-নারীর বাঁচার এবং আরও অগ্রগতির পথ ঐ সূত্রকে অবলম্বন করে। লেখক যদি তাঁর এই সদর্থক বক্তব্যকে মাত্র তিন পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত না রেখে আরও একটু বিস্তারিত ভাবে বলতেন তবে দীর্ঘ ইতিহাস, সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের পটভূমিতে তা মানানসই হত।

॥ ৫ ॥

সর্বশেষে আবার বলি কী পাইনি তার হিসাব মিলিয়ে লাভ নেই, কারণ ড. নজরুল ইসলামের কাছ থেকে বাঙালি চিন্তাশীল পাঠক পেয়েছেন প্রচুর। পূর্বে উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত কিছু কিছু অপূর্ণতা অথবা কিছু কিছু মারাত্মক মুদ্রণপ্রমাদ (যা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন) গৌণ ব্যাপার। মুখ্য কথা হল জাতির অস্তিত্বের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে তিনি বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করেছেন। ভাবালুতাবর্জিত তাঁর আদ্যন্ত যুক্তিবাদী আলোচনাশৈলীর পিছনে যে পরিশীলিত মন ও মানস রয়েছে তার প্রতি পাঠকের মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হবে। তাঁর উদ্দেশ্য মহান এবং প্রয়োজনীয় পরিশ্রম দ্বারা তিনি তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যপূর্তিতে সফল হয়েছেন বলে তাঁকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাতে হয়। নিঃসন্দেহে ড. নজরুল ইসলামের গ্রন্থ বাংলার প্রবন্ধ সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং দেশের যে

কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অবশ্য পঠনীয়। এজাতীয় উচ্চাঙ্গের গ্রন্থের প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদ্বয়ও বঙ্গভাষী পাঠককুলের অকৃত্রিম ধন্যবাদের পাত্র।

**বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক** — ড. নজরুল ইসলাম / মিত্র ও ঘোষ, / ১০০ টাকা।

# বঙ্গ-রাজনীতির পটপরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও কিছু প্রসঙ্গ

অতীন্দ্রমোহন গুণ

শ্রী সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত পেশায় সাংবাদিক, দীর্ঘকাল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় রিপোর্টার হিসেবে কাজ করে কয়েক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন। তার আগে বিভিন্ন সময়ে তিনি 'লোকসেবক,' 'জনসেবক' ও 'যুগান্তর' সমাচারপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আলোচ্য পুস্তকটি বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর কিছু প্রবন্ধের সঙ্কলন। পুস্তকের নাম দেখে এমন ধারণা হতে পারে যে প্রয়াত ফজলুল হক থেকে আরম্ভ করে শ্রী জ্যোতি বসু পর্যন্ত বাংলা-রাজনীতির পট-পরিবর্তনের প্রকৃতি বিশ্লেষণই শ্রীসেনগুপ্তের আলোচনার বিষয়বস্তু। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারা, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর শান্তি প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজির প্রয়াস, মুজিবর রহমানের আবির্ভাব ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, নকশালবাড়ি আন্দোলন, জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক জীবন ও তাঁর শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা — এসব কিছু নিয়েই শ্রী সেনগুপ্ত আলোচনা করেছেন। বাংলা রাজনীতির জ্যোতিষ্ক কিরণশঙ্কর রায়, সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফার খান, ইন্দিরা গান্ধী ও জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে যদিও বাংলা রাজনীতির সঙ্গে শেষ তিনজনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। এ কারণে পুস্তকটির নামকরণ যথাযথ হয়নি। প্রবন্ধগুলির উপস্থাপনেও কোনও স্পষ্ট কালানুক্রম অনুসৃত হয়নি।

প্রথম প্রবন্ধটিরও শিরোনাম 'ফজলুল হক থেকে জ্যোতি বসু।' ১৯৩৭ সালে কলকাতার মহাকরণে প্রথম বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী (তখন ইংরেজী অভিধা ছিল 'প্রিমিয়ার') হয়ে এলেন ফজলুল হক। গ্রাম বাংলার মানুষ ছিলেন তিনি, ''আকাশের মত হৃদয়ের বিশালতা, বরিশালের গ্রাম্য বাচনভঙ্গী, তীব্র স্বাজাত্যাভিমান, মানুষের প্রতি এক অসাধারণ মমত্ববোধ নিয়ে এই হক সাহেব ছিলেন বাংলার দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর।'' নির্বাচনের পর তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দল কৃষক প্রজা পার্টির সমঝোতার ভিত্তিতে সরকার গড়তে। কিন্তু কংগ্রেসের বড় কর্তারা সে প্রস্তাব নাকচ করায় মুসলিম লীগ ও কিছু নির্দল সদস্যকে নিয়ে তাঁকে সরকার গড়তে হল। ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগ কোয়ালিশন থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি সরকার টিকিয়ে রাখলেন। ১৯৪৩ সালে গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের সঙ্গে সঙ্ঘাত বাধল। সে সময়ে এশিয়ার রণাঙ্গনে ইংরেজ সামরিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করে জাপানি স্থলসেনা ও নৌবহর দ্রুত ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের অগ্রগতি রোধ করার উদ্দেশ্যে গর্ভনরের নির্দেশে ও মুখ্যমন্ত্রীর অজ্ঞাতে চীফ সেক্রেটারি পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলিতে ২৫-৩০ লক্ষ টন মজুত চাল আগুনে পুড়িয়ে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করলেন। এর অল্প পরে নোয়াখালির একটি অঞ্চলে রাজকীয় নৌবহরের কিছু সেনা ধীবরদের স্ত্রী-কন্যাদের উপর ধর্ষণে লিপ্ত হয়। ধীবররা পাল্টা আঘাত হানলে তাদের উপর গুলিবর্ষণ হয় এবং ফলে জনা কুড়ি ধীবরের মৃত্যু ঘটে। এসব কিছু প্রথমে হক সাহেবের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। পরে জানতে পেরে তিনি যখন মহাকরণের আমলাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন, তখন গভর্নরের ইচ্ছানুসারে তিনি পদত্যাগ করলেন। এসময়ে তাঁর আচরণের মধ্যে চারিত্রিক দার্ঢ্যের প্রমাণ মেলে। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য, ''বিনয়ী, ভদ্র ও পরমতে(?) সহিষ্ণু। কিন্তু অতিশয় ইংরেজভক্ত''। এর পর এলেন শাহিদ সুরাবর্দি — ''সুপুরুষ, অতিচতুর, ইংরেজি ও উর্দুতে চৌকস বক্তা''। সুরাবর্দি প্রথমে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্য, পরে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উস্কানি দিয়েছেন। ১৯৪৬-এ কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার জন্যে মুখ্যত তিনিই দায়ী। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নতুন অভিধা হল 'চীফ মিনিস্টার'। এ পদে প্রথমে অধিষ্ঠিত হলেন বিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক ও গান্ধীবাদী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু দুর্নীতি দূর করতে গিয়ে কংগ্রেসের একটি প্রভাবশালী অংশের বিরাগভাজন হলেন তিনি, ফলে পাঁচ মাস কাজ করার আগেই তাঁকে সরে যেতে হল। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রখ্যাত চিকিৎসক বিধান চন্দ্র রায়, সাড়ে চৌদ্দ বছর ধরে এবং আমৃত্যু এ পদে কাজ করেছেন তিনি। অসাধারণ প্রশাসনিক নৈপুণ্য



ও নিরপেক্ষতা ছিল তার। তিনি স্বপ্ন দেখতেন অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত, শিল্পে সমৃদ্ধ এক পশ্চিমবঙ্গের। দুর্গাপুর শিল্পনগরী, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরির কারখানা, কল্যাণী ও সল্টলেকে উপনগরী, মশানজোর ও দুর্গাপুরের ব্যারেজ, হলদিয়া বন্দর, একাধিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নতুন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর বিরাট কর্মোদ্যমের পরিচয় বহন করছে। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন গান্ধী-আদর্শে গ্রাম-সংগঠনে বহুকাল কাটিয়েছেন, স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নিয়ে কইবরণ করেছেন। বিধানচন্দ্রের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে তিনি অসামান্য প্রশাসনিক দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। প্রখর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী ছিলেন তিনি। ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান হিসাবে। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন সততার প্রতীক, কিন্তু দুই কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে বেশি দিন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বস্তুত তাঁর তিন দফায় মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে রাজ্যের প্রশাসন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মাঝখানে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অল্পদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করেছেন, তারপর ১৯৭১ সালে কংগ্রেস নির্বাচনে জেতার পর ঐ পদে আসীন হলেন সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় তাঁর ফলাও আইন-ব্যবসায় ছেড়ে। দেশবন্ধুর এই দৌহিত্র অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থ মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য বিধানচন্দ্রের মতো তাঁরও কিছু স্বপ্ন ছিল। ''কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে এমন অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে যেগুলিকে হঠকারী সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে।'' ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর সিদ্ধার্থশঙ্কর মহাকরণ থেকে বিদায় নিলেন। বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, আর ফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক সি.পি.আই.(এম) দলের নেতা জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হলেন। নাজিমুদ্দিনের পর অবিভক্ত বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের তিনিই দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী যিনি জাতীয় আন্দোলনের মূলধারা থেকে রাজনৈতিক মঞ্চে আসেন নি। ''সুতরাং তিনি এক আলাদা মূল্যবোধের মানুষ।'' ভারতবর্ষের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র তিনিই যখন তখন সংবিধানকে ও কেন্দ্রীয় নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। ''রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিরা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার — এঁরা কেউই তাঁর খর রসনা থেকে রেহাই পাননি।''

অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে জ্যোতিবাবুর তুলনা শ্রীসেনগুপ্তের বইটিতে আরও নানা প্রসঙ্গে এসে পড়েছে।

যেমন, বাংলার বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বার বার সংঘটিত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ১৯৫০ সালে বড় দাঙ্গা হল, তখন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়। প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে গোলমাল শুরু হল, তারপর শুধু কলকাতা নয়, দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের প্রতিটি জেলায় উপদ্রব ছড়িয়ে পড়েছিল এবং চলেছিল একমাসের বেশি সময় ধরে, দিনে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার করে হিন্দু উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান থেকে এরাজ্যে এসেছে সে সময়ে। এদের আশ্রয় ও ত্রাণের ব্যবস্থা করা এবং একই সঙ্গে এখানকার মুসলিম সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। মাত্র দু'বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু সংখ্যক দক্ষ অফিসারের সহায়তায় চার সপ্তাহের মধ্যে বিধানবাবু পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। এর পর বড় দাঙ্গা হল ১৯৬৪ সালে। শ্রীনগরের হজরতবল মসজিদ থেকে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ রক্ষিত আধারটির নির্খোজ হওয়াকে উপলক্ষ করে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু হল। হিন্দু উদ্বাস্তুর দল আবার পশ্চিমবঙ্গে আসতে লাগল। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতার মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকাগুলি আক্রান্ত হল। তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। সামরিক বাহিনীর সহায়তায় এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনেছিলেন। একদিকে কলকাতা ও সীমান্তবর্তী আটটি জেলায় দাঙ্গা দমনের ব্যবস্থা করেছেন; অন্যদিকে সীমান্ত পেরিয়ে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসছিল, তাদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। ১৯৬৪-র দাঙ্গার পর অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে উপলক্ষ করে কলকাতায় খানিকটা ব্যাপক দাঙ্গা হল ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে। কিন্তু এ দাঙ্গা দমনে জ্যোতি বসুর বামফ্রন্ট সরকার চরম অপদার্থতা দেখালেন। ৬ই ডিসেম্বর মসজিদ ধ্বংস হল, আর পরদিনই বাংলা বন্‌ধ ডেকে দিলেন জ্যোতিবাবুরা; আবার ৮ই ডিসেম্বর জাতীয় মোর্চার ডাকা ভারত বনধের সঙ্গে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গকেও যুক্ত করে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেন তাঁরা কিন্তু হাঙ্গামা হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সে সম্বন্ধে কোনই সিদ্ধান্ত নিলেন না। ফলে যখন মেটিয়াবুরুজ, কড়েয়া, বেনেপুকুর, ট্যাংরা ও তিলজলায় দাঙ্গা আরম্ভ হল তখন গোটা প্রশাসন যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অবশ্য সামাল দিতে অযথা বিলম্ব হল। তাই জ্যোতিবাবুকে উদ্দেশ্য করে শ্রী সেনগুপ্তের উক্তি: ''আপনি পনেরো বছরে প্রশাসনকে যে কেবল 'আমাদের লোক' চেনাতে শিখিয়েছেন, কাজ করতে শেখাননি, শেখাননি বিপদ ও আর্তলোককে রক্ষা করতে, এবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটা বুঝে নিয়েছেন।''

অন্য একটি প্রবন্ধে শ্রী সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর দলবাজির উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা নিয়ে জ্যোতিবাবুর সরকার যে বিশেষ মানসিকতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন সহ-উপাচার্য ড. ভারতী রায়ের নিগ্রহ তারই পরিণতি। কংগ্রেস আমলে

চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শম্ভুনাথ ব্যানার্জি, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা কংগ্রেসি ছিলেন না, তাঁরা উপাচার্য হয়েছিলেন নিজেদের যোগ্যতা ও খ্যাতির জোরে। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ উপাচার্য ও অন্য প্রশাসনিক কর্তারা সকলেই পার্টি মনোনীত। ''এঁরা সিটু সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি হন। পার্টির ছাত্র যুব নেতারা ঘরে ঢুকলে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান।''

শ্রীসেনগুপ্ত একটি পৃথক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরে যাওয়ার ব্যাপারে জ্যোতিবাবু রেকর্ড স্থাপন করেছেন। প্রায় ১৫ বছরের শাসনকালে বিধানচন্দ্র রায় বার আটেক বিদেশে গেছেন; ১৯৯৩ পর্যন্ত ১৬ বছরের জ্যোতিবাবু গেছেন ২১ বার (এবং ৪৫০ দিন দেশের বাইরে কাটিয়েছেন)। বলা হয়ে থাকে যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে বিদেশি পুঁজির আমদানিই তাঁর বিদেশ সফরের লক্ষ্য। অথচ প্রশ্ন করা যেতেই পারে, ''প্রায় চারশো (সাড়ে চারশো?) দিনের বিদেশ সফরে এই রাজ্যের জন্য ক' পয়সার বিদেশি লগ্নী এবং ক'জন অনাবাসী ভারতীয়কে আনতে পেরেছেন?'' আর ''তাঁর এই বিদেশ সফরগুলিতে রাজ্যের কোষাগার থেকে ক' কোটি টাকা খরচ হয়েছে?''

জ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে ক্রমশ বেশি কঠোর, বেশি ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে এ নিয়েও শ্রীসেনগুপ্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

বিধান চন্দ্র ও জ্যোতি বসুর কর্মপদ্ধতির একটা তুলনা করেছেন শ্রীসেনগুপ্ত। প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বছরের শাসনকালে বিধানচন্দ্র রামপন্থী দলগুলির উপদ্রব উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু আগমন ইত্যাদি সমস্যার মোকাবিলা করেছেন, দৃঢ় হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন এবং রাজ্যের সর্বত্র উন্নয়নের জোয়ার এনেছেন। সে তুলনায় জ্যোতিবাবু আরও বেশি দিন মুখ্যমন্ত্রীর কাজ করেছেন। তাঁর আমলে কিন্তু উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ কিছুই হয়নি। তাঁর বড় অবদান প্রশাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে পার্টির অধীনস্থ করা। ফলে দলের লোক অন্যায় করলে তার প্রতিকার হওয়া দূরে থাকে, অভিযোগকারীর হয়রানির অন্ত থাকে না।

জ্যোতিবাবুর উত্তরাধিকারী কে হবেন — এ প্রশ্নটি নিয়েও আলোচনা করেছেন শ্রীসেনগুপ্ত। রাজনৈতিক কৌশলী জ্যোতিবাবু বিভিন্ন সময়ে প্রতিপ্রতিমান ব্যক্তির সাহায্য কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু নিজের কাজ হাসিল হওয়ার পর এমন মানুষদের তিনি বর্জন করেছেন। মনে রাখতে হবে জ্যোতিবাবু কেবল নিজেকেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাই তাঁর জীবদ্দশায় কোনও উত্তরাধিকারী মুখ্যমন্ত্রিত্বের জন্য তিনি মনোনীত করে যাবেন এমন কথা যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবেন।

বাংলার প্রেক্ষাপটে পুস্তকের আর যে সব প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার একটিতে শ্রীসেনগুপ্ত নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা ও তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তথ্যাদি উপস্থাপন করে তিনি দেখিয়েছেন তরাই অঞ্চলের এই আন্দোলনে স্থানীয় যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের সর্বনিম্ন জমির পরিমাণ ১২ বিঘা ও সর্বোচ্চ পরিমাণ ৭৫ একর। তাই আন্দোলনের পেছনে ভূমিহীনদের জমির ক্ষুধা কাজ করেছে এমন দাবি করা অসঙ্গত। তাঁর মতে এ কারণেই তরাইয়ের জঙ্গলে এ আন্দোলন বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের সূচনা পর্ব নিয়ে লিখতে গিয়ে সুখরঞ্জনবাবু বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আন্দোলন দমন করার জন্যই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো হয়েছিল; মামলার আসামী-সংখ্যা ৩৫ হলেও এর আসল লক্ষ্য ছিলেন মুজিবর রহমান। মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছে সে সময়ে শ্রীসেনগুপ্ত সীমান্তবর্তী কিছু গ্রামে ঢুকে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন একদিকে সাধারণ বাঙালির অসহায়তা, অন্যদিকে বাঙালি সৈনিকদের দৃঢ় সঙ্কল্প — যুদ্ধ তাঁদের চালিয়ে যেতেই হবে, যদিও তাঁরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে কোনও দেশ তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে না এলে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁদের জয়ের সম্ভাবনা নেই। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ সমস্যার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রী সেনগুপ্ত বলেছেন, সি.পি.আই.(এম) দল নিজ ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার কাজে অনুপ্রবেশকারীদের ব্যবহার করছে, তাই সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করায় তার অনীহা। পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রকৃত মতামত যে এভাবে ভোটবাক্সে বিকৃত হয়ে পড়ছে যে কথাটা তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

মাঝখানে তিনটি প্রবন্ধে লেখক ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার মানুষদের মধ্যে গান্ধীজির উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। কলকাতার দাঙ্গার পরই নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর হত্যা ও নিপীড়নের তাণ্ডব নেমে এল। কিছু বিশ্বস্ত অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধী নিপীড়িত মানুষদের সেবার্থে সেখানে উপস্থিত হলেন। নোয়াখালিতে তাঁর অবস্থান একদিকে হিন্দুদের মনোবল পুনরুদ্ধারে অন্যদিকে মুসলিম প্রতিবেশীদের মনোভাব পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে। নোয়াখালির পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হলে তিনি কলকাতায় এলেন। এখানকার হিন্দুরা তখন ১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্টের বদলা নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বেলেঘাটার মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকায় গান্ধীজির অবস্থান এ সময়ে মুসলমানদের মধ্যে ভরসা জুগিয়েছে। তাই দেশবিভাগের সময়ে বিপুল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাবে রক্তগঙ্গা বইল, কিন্তু বাংলায় উদ্রেক করার মতো কোনও গোলমালই হয়নি। সেকারণেই মাউন্টব্যাটেন গান্ধিজিকে



ঐ সময়ে ''ওয়ানম্যান বাউন্ডারি ফোর্স'' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অবশ্য ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর স্বাধীনতা ঘোষণার আনন্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর হিন্দু দুর্বৃত্তরা গান্ধীজির উপস্থিতি উপেক্ষা করে শহরের মুসলিম এলাকাগুলিতে আক্রমণ চালাল। এমনিতেই কংগ্রেস দেশবিভাগে সম্মত হওয়ায় গান্ধীজি সে সময়ে হতাশাগ্রস্ত — তাঁর কাছে ঐ দিনগুলি ছিল ''হারানোর ও হেরে যাওয়ার''। কলকাতার পরিস্থিতির অবনতিতে অনেকটা লুকিয়েই তাঁকে একটি দিল্লিগামী ট্রেনে তুলে দেওয়া হল।

কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায় সম্বন্ধে শ্রী সেনগুপ্ত লিখেছেন, মুখ্যত সাহিত্যিক ও ইতিহাসের পণ্ডিত কিরণশঙ্কর ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর (১৯৩৯-এ) গান্ধীজি-সুভাষ বিরোধ যখন তুঙ্গে সে সময়ে কিরণশঙ্কর গান্ধীজিকে সমর্থন করেছেন। ১৯৪৮-এ পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে তাঁর বড় কাজ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা। এ দুয়ের মধ্যেই কিরণশঙ্করের স্বাতন্ত্র্য ও দৃঢ় মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার দুই মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক ও অজয় মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্য একই সূত্রে বাঁধা ছিল বলে সুখরঞ্জন বাবুর মনে হয়েছে। সিভিল সার্ভেন্টরা যদি মন্ত্রিসভার প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর শাসনতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদাকে অবজ্ঞা করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন, তা হলে তাঁর সামনে মাত্র দু'টি পথ খোলা থাকে। হয় ঐ ধরনের সিভিল সার্ভেন্টদের অপসারণ করা, নয়ত পদত্যাগ করা। হক সাহেব ও অজয়বাবু উভয়েই দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছিলেন।

সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফার খান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শ্রীসেনগুপ্ত বলেছেন, সীমান্ত গান্ধী ও তাঁর অনুগামী খুদা-ই-খিদমতগারারা ছিলেন জাতীয় আন্দোলনের একনিষ্ঠ সৈনিক। কিন্তু ১৯৪৭এ দেশ বিভাগের সময়ে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে সে প্রদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। সে সময়ে সীমান্ত গান্ধী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ''আমি ও খুদা-ই-খিদমতগারা পাকিস্তানে নেকড়ের মুখে নিক্ষিপ্ত হলাম।'' পাকিস্তান সরকার দেশদ্রোহের দায়ে তাঁদের উপর নিপীড়ন চালিয়েছেন। সীমান্ত গান্ধী পাকিস্তানে দীর্ঘ বারো বছর জেলে কাটিয়েছেন, যদিও বার বার তিনি বলেছেন যে পাকিস্তানের ধ্বংস তিনি চান না, শুধু পাঠানদের বাসভূমি বা পাখতুনিস্তান হিসাবে সীমান্ত প্রদেশকে দেখতে চেয়েছেন। শত নিপীড়ন সত্ত্বেও কিন্তু গান্ধীবাদে তাঁর আস্থা ছিল অবিচল।

ইন্দিরা গান্ধী প্রসঙ্গে অন্য অনেকের মতো সুখরঞ্জনবাবুর ধারণা দেশের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ নেহরু-কন্যা বড় করে দেখেছেন, প্রতিহিংসাপরায়ণতায় তিনি সময় সময় অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়েছেন, নিজের দম্ভ বজায় রাখতে গিয়ে তিনি কংগ্রেস দলকে ভেঙেছেন এবং এভাবে দেশকে দুর্বল করেছেন। কিন্তু তাঁর বড় গুণ ছিল এই যে, কোনও সমস্যার মোকাবিলায় তিনি কখনও পিছিয়ে আসেননি। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, যদিও সময় বিশেষে সে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অদম্য সাহস এবং দেশপ্রেমের অধিকারী। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরা এদিক থেকে তাঁর ধারে-কাছে যেতে পারেননি। ''কেবল আত্মরক্ষা করেই এঁরা বেঁচে আছেন। ফলে দেশ ভেসে চলেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে এক অনিবার্য বিপর্যয়ের দিকে।''

জয়প্রকাশ নারায়ণের বৈচিত্র্যময় জীবন শ্রীসেনগুপ্তকে আকর্ষণ করেছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে ভারতীয় রাজনীতির প্রবীণ নেতৃত্বে ছিলেন গান্ধী, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আর নবীন নেতাদের মধ্যে যে তিনটি নাম উজ্জ্বলতম ছিল তা হল নেহরু, সুভাষ ও জয়প্রকাশ। ১৯৬৪ সালে নেহরুর মৃত্যুর পর অনেকেই পরম নির্ভরতায় ভেবেছিলেন রাষ্ট্রতারীটির কর্ণধার এবার হবেন জয়প্রকাশ। কিন্তু ক্ষমতা নিয়ে কোনদিন তাঁর আগ্রহ ছিল না। বিভিন্ন সময়ে নেহরু ও ইন্দিরাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি। কিন্তু ১৯৭৩ সাল থেকে কয়েকটি মৌল প্রশ্ন নিয়ে ইন্দিরার সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হল। ১৯৭৫-এর এপ্রিলে জাতীয় জীবনের শুদ্ধি মানসে জয়প্রকাশ সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান জানালেন। সে বছরের ২৪-২৫ জুলাই মধ্যরাতে ইন্দিরা সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করলেন। জয়প্রকাশ সহ সকল বিরোধী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। ''সূচনা হল জয়প্রকাশের রাজনৈতিক জীবনের সুন্দরতম মুহূর্ত।''

শ্রীসেনগুপ্ত ইতিহাসের গবেষক নন। বাংলার সমকালীন বা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক মঞ্চের নায়ক-নায়িকাদের তিনি সাংবাদিক হিসাবে যেমন দেখেছেন তা-ই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাজনীতির ক্রম-পরিবর্তন নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ ভাষ্য যদি বইটিতে কেউ আশা করেন তা হলেও তিনি হতাশ হবেন। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে লেখকের বিশ্লেষণ ভ্রান্ত বা একপেশে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রীসেনগুপ্ত যে তাঁর মতামত বেশ স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন তা স্বীকার করতে হবে। মুখবন্ধে ড. সজল বসু বলেছেন ভবিষ্যতে গবেষকরা বইটিতে ইতিহাস রচনার উপাদান খুঁজে পাবেন এ কথাটাও যথার্থ। বস্তুত লেখকের সাবলীল ও বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গীর কারণে বইটি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

লেখকের উৎসাহ আগ্রহের সঙ্গে কিন্তু প্রকাশকের যত্ন-সাবধানতা পর্যাপ্ত মাত্রায় যুক্ত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ভুল বানান

দেওয়া হয়েছে, নানা স্থানে চলতি ভাষার মাঝখানে সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ঢুকে গেছে, আর সাধারণ মুদ্রণভ্রান্তি তো অজস্র। সবচেয়ে শোচনীয় ত্রুটি ঘটেছে ১২৭ পৃষ্ঠায়: সেখানে অনুচ্ছেদের শেষে একটি বাক্য অসমাপ্তই রয়ে গেছে। আশা করি প্রকাশকের কাজে ভবিষ্যতে অধিকতর নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য লক্ষিত হবে।

**বাংলা: ফজলুল হক থেকে জ্যোতি বসু**— সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত/ সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা-২৯ / ৫০ টাকা

## একজন বড়মাপের বাঙালি

### পুলক নারায়ণ ধর

কবি ও প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম ১৯০৩ সালে কুমিল্লায়। নোয়াখালির অন্তর্গত কাঞ্চনপুর গ্রামে ছিল পৈতৃক নিবাস। শোনা যায় তাঁর পূর্বপুরুষ বাগদাদ থেকে এদেশে এসেছিলেন। কিন্তু বাংলার ধূলোমাটিতে মিশে কালক্রমে তাঁদের বংশের বাগদাদি কৌলিন্য ঘুমেমুছে গিয়েছিল। খাঁটি বাঙালি ঘরানায় পূর্ণ স্বচ্ছি লাভ করে মোতাহের হোসেন হয়ে উঠেছিলেন অন্যতম বাঙালি বুদ্ধিজীবী। আবদুল ওদুদ পরিচালিত 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা'য় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মোতাহের হোসেন পেশায় ছিলেন শিক্ষক। দেশবিভাগের কিছু পূর্বে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। দেশ বিভাগের পর মোতাহের পূর্ববাংলায় (অধুনা বাংলাদেশ) চলে আসেন এবং আমৃত্যু (১৯৫৬) চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন।

আজীবন স্থিতধী মোতাহের হোসেনের পারিবারিক জীবন ছিল নানা ভাবে বিপর্যস্ত। মানসিক ভারসাম্যহীন নূরজাহানকে (প্রথমা স্ত্রী) নিয়ে দীর্ঘ বারোবছর তিনি ধৈর্য ও প্রশান্তির কঠিন পরীক্ষা দিয়ে গেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মৃত্যু নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। কিন্তু অসীম ধৈর্য ও অপার প্রেমই তাঁর অন্তরতম শক্তি, যা তাঁকে জীবনে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শান্ত সমাহিত থাকতে সহায়তা করেছে। রুচিবান ও মুক্তবুদ্ধির মানুষ মোতাহের হোসেনের চিন্তাভাবনা ছিল যথার্থ রেনেসাঁস বিন্যাসে বিধৃত। যে সময় ধর্মান্ধতার মাদকতায় গোটা ভারত উপমহাদেশে টালমাটাল অবস্থা মোতাহের সাহস করে বলতে পেরেছিলেন:

''ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার লিখিত, মার্জিত লোকের ধর্ম...। বাইরের ধর্মকে যারা গ্রহণ করে তারা আল্লাহকে জীবন-প্রেরণা রূপে পায় না, ঠোঁটের বুলিরূপে পায়।....আল্লাহ যার আকাশে তার সম্বন্ধে সাবধান। কেননা, তার দ্বারা যে কোন অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজ হতে পারে। তারা (সংস্কৃতিবান মানুষ) সব কিছু করে ভালোবাসার তাগিদে।'' বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা হই হট্টগোলের পথে নয় আত্মকল্যাণ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তিনি মানুষের মানবিক পরিবর্তনে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন, এ দিক থেকে তিনি গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার অনুসারী ছিলেন।

ইসলামের আদর্শ বা নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসরণ করেননি বলে তাঁর ভাগ্যেও 'সমাজদ্রোহী' খেতাব জুটেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মোতাহের সমস্ত রকম 'সরকারি' খেতাবেরও বিরোধী ছিলেন। জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল অন্যপথে। তাঁর ভাষায়: ''হিন্দুত্ব, ইসলাম বা অপরাপর ধর্মের নামে আমরা যতই চিৎকার করি না কেন, আসলে আমাদের চরিত্র গঠন করছে অর্থনীতি। একজন মধ্যবিত্ত হিন্দু জীবনের সংগে একজন মধ্যবিত্ত মুসলমান জীবনের পার্থক্য কতটুকু? একটু রঙের পার্থক্য ছাড়া তাদের জীবন ধারা মূলত এক।'' মুসলমানের বাঙালিয়ানা থেকে তথা দেশের জলবায়ু বা ঐতিহ্য থেকে সরে আসার কৃত্রিম প্রবণতা মোতাহের-এর সমর্থন পায়নি। বিংশশতাব্দীর প্রথম দশক থেকে যে আঞ্জুমান ওলামায়ে আন্দোলন শুরু হল তা (মুসলমান) বাঙালির ক্ষতি সাধনই করেছে।

ধর্মের চাইতে দেশ প্রকৃতি ও জাতীয় স্বভাবের প্রভুত্বই তাঁর জীবনে ছিল প্রধান। ''দরকার হলে কালকে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি কিন্তু আমার বাঙালীত্ব অপরিবর্তনীয়'' (মোতাহের হোসেন)।

'ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারকে' তিনি খুব বড় মনে করতেন। জীবনে সার্থক হওয়া বলতে বুঝতেন সাধনার অবিরাম গতিকে ফলাফলের দিকে (মা ফলেষু) ভ্রূক্ষেপ না করে মেনে নেওয়া। তাঁর মতে ''সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তিই বড়, সমাজ বা রাষ্ট্র নয়। কোন প্রকারের রাষ্ট্রের ফল — সে গণতন্ত্রই হক আর সমাজতন্ত্রই হক — সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে না।'' সমাজতন্ত্র মোতাহের-এর কাছে ছিল — উপলক্ষ্য, লক্ষ্য নয়। তাঁর মতে ''মতবাদ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে, আর যন্ত্র দিয়ে আর যাই করা যাক সভ্যতা সৃষ্টি করা যায় না।'' ব্যক্তিসৃষ্টির কোন ধরা বাঁধা পথ নেই। এটাই ছিল মোতাহের-এর গভীর বিশ্বাস। মোতাহের বিশ্বাস করতেন 'মানুষের সৃজনীশক্তির বিকাশের জন্যই অর্থনৈতিক সাম্যের প্রয়োজন। সমাজতন্ত্র একটা উপায় মাত্র। কারণ মানুষের গোড়ার কথা সাম্য হলেও চূড়ার কথা অসাম্য, আর সে অসাম্যই মানুষের ব্যক্তিত্ব'। মোতাহের হোসেন এই বিষয়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের ভাবধারায় অনুগামী। রাসেলের খোলামেলা চিন্তাভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি রাসেলের "The Conquest of Happiness" (১৯৩০) বইটি 'সুখ' নামে অনুবাদ করেছিলেন।

মোতাহের লিখেছেন অল্প, ভেবেছেন বেশি, এবং জীবনচর্যায় তা উপলব্ধি করেছেন আরও বেশি। তাঁর সেই অল্প সংখ্যক রচনার মধ্যেই তাঁর চিন্তা সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে গ্রথিত। তাঁর মৌলিক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সংস্কৃতি-কথা' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। কবিতা ও গান লিখেছেন বিস্তর। কিন্তু কবিতায় আবেগ প্রবণতা যত বেশি মৌলিকত্ব ততটা নেই। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের আদলে লিখতে গিয়ে সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বড্ড বেশি নকল-ধাঁচের বলে মনে হয়। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

মোতাহের হোসেন: ''ও কে বাঁশরি বাজায়/ও তার বাঁশরি সুরে পরাণ আমার/ উদাস হ'ল হায়/ সে যে দেয় না ধরা কাছে...।

রবীন্দ্রনাথ: ''ওগো কে যায়/বাঁশরি বাজায়ে।''

অথবা — ''ও যে চমকে বেড়ায়/দৃষ্টি এড়ায়/যায় না তারে বাঁধা।...''

মোতাহের: ''অন্তরতম/অন্তর মাঝে আছ তুমি জানি/ ওগো অন্তরতম।''

রবীন্দ্রনাথ: ''অন্তরে জাগিছে/অন্তরযামী।''

এইরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

মনে হয় কবি হিসাবে তিনি ততটা সার্থক বা মৌলিক নয় যতটা প্রাবন্ধিক ও চিন্তক হিসাবে সার্থক। বর্তমান প্রজন্মের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে মোতাহের হোসেন খুব পরিচিত নাম নয়। বাঙালি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে তেমন সম্মান দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর (১৯৫৬) পর তাঁকে আরও ভুলে গেছে। এই মননশীল ব্যক্তিত্বকে দুর্মর বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করার প্রয়াসেই তিতাশ চৌধুরী 'মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বইটির ভূমিকায় আবুল কাসেম যথার্থই বলেছেন: 'বাঙালী আজও সামান্যই মনুষ্যত্বপ্রয়াসী। এ অবস্থায় এই গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিতাশ চৌধুরী দেশবাসীকে মনুষ্যত্ব সাধনের প্রতিই আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন।'

মোতাহের হোসেনের জীবনী নিয়ে প্রথম বই লিখেছেন ড. আনিসুজ্জামান (১৯৮৮)। তিতাশ-এর বইটি আনিসুজ্জামানের বই-এর কিছু তথ্যগত অসংগতি শুধরে দেবার চেষ্টা করেছে। তবে তিতাশের বইটিতে মোতাহের সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত আবেগ উচ্ছ্বাস বইটির ভাষার বাঁধুনিকে একটু হালকা করেছে। মোতাহের-এর পরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক দ্বারা হয়ত লেখক প্রভাবিত।



মোতাহের অবশ্যই শ্রদ্ধেয় বাঙালি। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় চিন্তক হিসাবে তাঁর ভূমিকা আদর্শস্থানীয়। অত্যন্ত উঁচুতারে বাঁধা ছিল তার জীবনবোধ। বিংশ শতাব্দীর বিরাট পরিমণ্ডলে যে বিপুল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জন্মেছেন তাঁদের সহযোগী হিসাবে তিনি নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে তাঁর গণ্ডী ছিল ছোট। ছোট ছোট গণ্ডীতে আরও অসংখ্য সাধারণ বাঙালির মতন তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মানুষ।

আজকের চিন্তায় ও মননে হীনবল বাঙালির কাছে মোতাহের-এর মতন একজন মানুষকে উপস্থিত করে তিতাশ চৌধুরী অবশ্যই আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

**মোতাহের হোসেন চৌধুরী: জীবন ও সাহিত্য**— তিতাশ চৌধুরী/ নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০/ ৬৫ টাকা।

## বিষয়: উত্তর রবীন্দ্রযুগের দশজন কবি

### শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

লেখকের মতে বইটির উদ্দেশ্য, বাংলা কবিতার আধুনিকতা অর্জনের মূল্যায়ন। মাইকেল মধুসূদন থেকে বর্তমান কালের রণজিৎ দাশ কি নির্মল হালদারদের প্রজন্ম পর্যন্ত পথযাত্রা। সমীক্ষার অন্তর্গত হলে তাকে দীর্ঘ বলা যেত। জীবনানন্দ থেকে শুরুত্ত-র সময় পরিসর দীর্ঘ নয়, কুড়ি কি তিরিশ বছর মাত্র। এই সময়ে সবচেয়ে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ উত্তর রবীন্দ্রযুগের কবিদের মধ্যে দশজনকে নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। কবিরা নিজ নিজ গুণে উজ্জ্বল থাকেন, নক্ষত্রগণ আরোপ করে তাঁদের যুথবদ্ধ করা উচিত কিনা জানি না।

যে দশজন কবি আলোচিত, তাঁরা হলেন যথাক্রমে, জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮১), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), অরুণ মিত্র (১৯০৯- ), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯- ) এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। আধুনিকতা অর্জনের বিচারে পেছিয়ে গেছেন বলে বা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেননি বলে (?) জীবনানন্দের দুই অগ্রজ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫৪)

এবং মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) তথা তাঁর জগদ্বিখ্যাত সমবয়সী কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-কে নিয়ে আলোচনা নেই, যেমন নেই তাঁর অনুজদের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪- ), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯), মণীন্দ্র রায় (১৯১৯- ) বা অরুণকুমার সরকার (১৯২২-১৯৮০)— এঁদের মূল্যায়ন। আধুনিক বাংলা কবিতার বিচিত্র রূপটিকে সামগ্রিক জটিলতায় উন্মোচিত করতে চেষ্টা করেছেন বলে দাবি করেন লেখক, তাই এই অনুপস্থিতদের নামগুলি উচ্চারণ করে তাঁর পক্ষপাত সনাক্ত করতে হচ্ছে।

কথা সাহিত্যে প্রাধান্য বোঝাতে 'তিন বাঁড়ুজ্জে' নামক গিমিক কার উদ্ভাবনা জানি না, কিন্তু এতই প্রচলিত যে রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের সাহিত্য নিয়ে যে কোনও আলোচনায় তারাশঙ্কর- বিভূতি-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রাপ্য নৈবেদ্য না দিয়ে কেউ অগ্রসরই হন না। তার ফলে বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসুদের উপযুক্ত মূল্যায়ন আজও হলো না। আধুনিক কাব্যগবেষণার স্বীকৃতিপর্বে পাঁচজনকে নিয়ে যে গুচ্ছ বেঁধে দিয়েছিলেন দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ডি-ফিল সন্দর্ভে তারও জের এ-যাবৎ চলছে। তাঁর কাজে অমিত উৎসাহ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু, যিনি সম্ভবত এ গুচ্ছ থেকে অজিত দত্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বাদ দেবার প্রস্তাবও করে থাকবেন। অথচ বাঙালি মানসে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর তুলনায় এঁরা দুজন অনেক বেশি কাছের মানুষ। এই ধরনের পক্ষপাতী নির্বাচন সাহিত্য বিচারের ব্যাপারে কিছু ক্ষতি করে বলে মনে হয়। মানুষের দৃষ্টিকে অন্তত কিছু কালের জন্য একটি বিশেষ দিকে টেনে রাখে। শেষ পর্যন্ত হয়ত কোনও প্রতিভাকে চেপে রাখা যায় না।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক দীপ্তি ত্রিপাঠীর পথ ধরে আরও একটু এগিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়েছেন। আর একজন তিরিশেরই কবি অরুণ মিত্র, স্বীকৃতিপর্বের দুই যুগ কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে দুই যুগে অবিশ্বাস্য সাবলীলতায় তাঁর হৃতজমি পুনরুদ্ধার করেছেন বলা যায় — তিনি আছেন। আর যুক্ত হয়েছেন পরবর্তীকালের সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। অর্থাৎ, বৃত্তটি প্রসারিত হয়েছে।

দীপ্তি ত্রিপাঠীর সন্দর্ভে আলোচিত পাঁচজন কবি ছিলেন আধুনিকতার পথিকৃৎ। ১৯৫৮ সালের নিরিখে তিনি আধুনিকতার একটি বিশ্বাসযোগ্য সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "আত্মসচেতনতা, মননের বৈচিত্র্য, নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ এবং ঐতিহ্যের দিকে মনোযোগ ছাড়াও প্রেম, ধর্ম, মৃত্যু, বিধাতা, কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁরা নতুন করে ভাবলেন। সে-ভাবনা স্বভাবতই রোম্যান্টিক-বিরোধী হল। এই মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং তাকে প্রকাশ করবার জন্য নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিদের, বিশেষত আমাদের আলোচ্য পাঁচজন কবির, প্রধান দান।" এবং এই পরিবর্তিত মেজাজের শিক্ষা তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে কাব্যমুক্তি আন্দোলনের দুই পুরোধা এলিয়ট ও পাউন্ডের কাছ থেকে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের লেখক আজ এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এবিষয়ে আরও চিন্তিত এবং খানিকটা বিভ্রান্ত। তিনি প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁদের নিয়ে কোনও তুলনামূলক আলোচনা করেননি। আসলে তাঁর নির্বাচিত দশজন কবিকে কিছুতেই এক সুতোয় গাঁথা যায় না। সুকান্তে থেমে না গিয়ে তিনি যদি আর একটু অগ্রসর হতেন, তা হলে দেখাতে পারতেন, বাংলা কবিতা দুরূহ নৈর্ব্যক্তিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে, ভেজা মাটির সন্ধানে আবার ঢালু জমিতে বাঁক নিয়েছে। প্রমাণ করা যেত যে পরিশ্রুত পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের কাছে শিক্ষা নিয়েও বাঙালি কবি হৃদয়াবেগের কাছে অসহায়।

সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়কে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হচ্ছে জানলে মনে আনন্দ হয়। এ বইতে তেমন আনন্দের খোরাক কম। যা আছে তা হলো, এ যাবৎ নানা গ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রসঙ্গগুলির একত্র সন্নিবেশ। সমীকরণ বলতে, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে শিলমোহরের মতো একটি করে শিরোনাম, দুকথায় কবির বৈশিষ্ট্য চিনিয়ে দেবার চেষ্টা — যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। যেমন, জীবনানন্দকে বলা হয়েছে পরাচেতনার অভিসারী। সুধীন্দ্রনাথ — সংশয়ী নাস্তিক। অমিয় চক্রবর্তীর বিস্মিতের দৃষ্টি ; প্রেমেন্দ্র মিত্রের মায়াতুর মর্ত্যরাগ ; বুদ্ধদেব বসুর বেলা শরীরী সংরাগ। বিষ্ণু দে আছেন দ্বান্দ্বিক দ্বৈরথ নিয়ে, অরুণ মিত্রের অক্লান্ত আত্মসন্ধান, সমর সেন নগর দর্পণ। সুকান্ত স্বভাবত ছিন্নমুকুল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেহেতু এতদিনকার রাজনৈতিক বিশ্বাসে অবস্থিত নন, তাই তাঁর ওপর প্রবন্ধের শিরোনাম 'বিশ্বাসের স্বপ্নভঙ্গ'। এগুলি শুধু বিভ্রান্তিকর নয় অর্থহীন ক্লিশেও। তার ওপর রয়েছে প্রবন্ধের মধ্যে যত্রতত্র বাংলা বাক্যাংশের পাশাপাশি ইংরেজি প্রতিশব্দ। যেন ইংরেজিটা বলে না দিলে পাঠক বাংলা শব্দের অর্থ বুঝতে পারবেন না। এ থেকে মনে হয়, লেখকের প্রধান লক্ষ্য কবিতার পাঠক না, ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায়। তারা দুই মলাটের মধ্যে জ্ঞাতব্য সব কিছু পেয়ে যাবে, আর কোনও বই তাদের পড়তে হবে না। আমরা ভাবি, কবিতা তো কিছু বোঝায় না, বাজায়। তা হলে কেন কবিদের এক একটি খোপে বসিয়ে দেওয়া ?

যেমন, ধরা যাক, অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো, তিনি জীবনের সকল বৈপরীত্যের মধ্যে মিলনের



সেতুবন্ধন ও সংগতিস্থাপন করতে চেয়েছেন। এই ধারণার বশবর্তী লেখক নিজেও। অমিয় চক্রবর্তীর 'সংগতি' কবিতাটি উল্লেখ করে তিনি জানাচ্ছেন, বেশ উৎসাহ সহকারেই জানাচ্ছেন যে, "বর্তমান করাল কালের নিয়তিলাঞ্ছিত আধুনিক জীবনযাত্রার সর্বতোব্যাপ্ত অবিশ্বাসের অন্ধকারে নেমে তিনি প্রজ্বলিত করেছেন ধ্রুব বিশ্বাসের স্থির শিখাটি, মৃত্যুর ভয়াল ভ্রূকুটিতে উপেক্ষা করে গেয়ে উঠেছেন জীবনের আনন্দ-সংগীত। বাস্তবিক, ছত্রে-ছত্রে অনুসৃত অতি গভীর এক আস্তিক্যবোধের অমৃতবাণীই এই কবিতাটির পরম সম্পদ।"

অধ্যাপকসুলভ ভাষায় বলা তাঁর মন্তব্য কিন্তু ঠিক নয়। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অতি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের সুর থাকে। আলগা উচ্চারণে এই ভ্রাম্যমাণ কবির অনেক উক্তি মুহূর্তের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ থেকে উৎসারিত। সেই দিক থেকে তাঁকে মার্কিন কবি উইলিয়ম কার্লোস উইলিয়মসের সহমর্মী বলা যায়। আর সেই জন্যেই তিনি রবীন্দ্রভাবাপন্ন হয়েও আধুনিক। ওই 'সংগতি' কবিতাটি সম্পর্কে তাঁর ১০ নভেম্বর ১৯৭৭ তারিখের একটি চিঠির অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি। চিঠিটি অলিন্দ, শরৎ সংকলন, ১৩৯৭-এ প্রকাশিত।

"অনেক কাল পূর্বে 'মেলাবেন' কবিতাটা লিখেছিলাম। কিন্তু তখনো একটুকুও ভাবিনি যে কোনো একটি বিরাট নৃ-জাতীয় পুরুষ ভাঙা দরোজা, ফাটা হৃদয়, অন্যায় অত্যাচারের দারুণ্যকে জোড়া দিতে সক্ষম ; সমস্ত কবিতাটা সেই রকম ঐশিকতার বিরুদ্ধে ইস্তাহার। ...অলৌকিক উপায়ে সব অসঙ্গতি নিষ্পন্ন করার চিন্তা আমার কাছে তখনো অলীক মনে হত ; তাই ক্ষুব্ধ চৈতন্যের প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলাম।"

শেষজীবনে নিজের ভাবমূর্তি সংশোধন করার উদ্দেশ্যে তিনি এমন কথা বলতেন, মনে করলে তাঁকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।

বিচক্ষণ সহকবিদের মাধ্য জীবনানন্দ ছিলেন একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির মানুষ— একটু পাগলস্বভাব। কিন্তু জেদী। নেতিয়ে পড়া বাংলাভাষাকে চাঙ্গা করে কাজে লাগাতে তিনি কবিতায় আরোপ করেছেন গুরুচণ্ডাল, চার মাত্রার বিকৃত ক্রিয়াপদ আর ভূরিভূরি দেশি গ্রাম্য শব্দ। তাই তাঁর লেখার বুনট সাবলীল নয়। ভাবনা-প্রতিভার মৌলিক স্বাদ পাওয়ায় পাঠক শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রহণ করেছে। আমরা জানি, তিনি নিজের সফলতা বিষয়ে কখনও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি। ধূসর পাণ্ডুলিপি রচনার পাশাপাশি একই সময়ে ছিয়ানব্বইটি গল্প (অনেক কথাসাহিত্যিকের এক জীবনের কাজ!) আর রূপসী বাংলার সহজ চতুর্দশপদীগুলি রচনা করে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ছাপতে দেননি। হয়ত ভেবেছিলেন, এদিকে না হলে ওদিকে তাঁর প্রতিষ্ঠা হবে একদিন। শেষ জীবনে স্নায়ুরোগে ভুগেছেন। এই সব তথ্য অগ্রাহ্য করে জীবনানন্দকে কখনওই পরাচেতনার অভিসারী বলা যায় না।

আর, বাংলা কবিতায় আধুনিকতার বিচারে নজরুল, প্রেমেন্দ্র, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী সুকান্ত ভট্টাচার্য কিছুতেই এক পংক্তিতে বসতে পারেন কি ? স্বল্পকালের জীবনে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন বলেও না। সুকান্তর রচনা যথেষ্ট রোম্যান্টিক। শিল্পকর্ম হিসাবে কাঁচা। বিবৃতিপ্রধান। শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারে তেমন কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই। রাজনৈতিক কারণে তাঁকে নিয়ে এক সময় অনেক হৈ-চৈ করা হয়েছে। তাঁর অমরত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক হিসাবে। দীর্ঘ জীবন পেলে তিনি কত বড় কবি হতেন বলা যায় না। কিন্তু আমরা, কবিতার পাঠককুল, তাঁকে যতটুকু পেয়েছি, তাতে সুকান্তর জায়গা স্কুলপাঠ্য পুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি র‍্যাঁবো হয়ে জন্মাননি, একথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

লেখক তাঁর আলোচনায় যথাসাধ্য পৈশুন্যমুক্ত থাকতে চেষ্টা করেছেন বলে দাবি করেন। বিশ্বাসের স্বপ্নভঙ্গ শীর্ষক প্রবন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সুবিচার করেননি তিনি। বিশ্বাসের স্বপ্নভঙ্গ বলতে কী বোঝায় ? বিশ্বাস আর স্বপ্ন কি এক জিনিস ? আধুনিকরা পৃথিবীর সমস্ত বিষয়কে কবিতার মধ্যে টেনে এনেছেন। অবলোকনকে করেছেন প্রসারিত। জীবনের প্রয়োজনে আবিষ্কার করেছেন নতুন নতুন রূপক ও প্রতীক। ভাষা ও ছন্দকে গড়ে পিটে ব্যবহারের উপযোগী করে নিয়েছেন। এই সব দিক থেকেই সুভাষের মৌলিক অবদান আছে। তিনি যদি পরিণত বয়সে বিশেষ একটি মতবাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে থাকেন, মানবিক বিশ্বাসের উদার উজ্জীবনকে করে থাকেন অভ্যর্থনা— তাতে দোষ কোথায় ? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা বাড়ে, কবির বিবর্তন হয়, সেইটেই তো স্বাভাবিক। আমাদের ভুললে চলবে না যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অবধি পৌঁছেই বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হয়েছে। তার আগে হয়নি।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মোদ্দা ব্যাপার হলো, এই বইয়ে প্রকাশিত অভিমতের ওপর নির্ভর করে আধুনিক বাংলা কবিতার বিচিত্র রূপটিকে সামগ্রিক জটিলতায় ধরা যাবে না।

**আধুনিক বাংলা কবিতার কালপুরুষ— পরিমল চক্রবর্তী/ পাণ্ডুলিপি, ১৬ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩/ ১০০ টাকা**

## রোমান্টিক কবিতার বৃত্তে

আনন্দ ঘোষ হাজরা

'মৃত্যুর জন্মদিন' পঙ্কজ সাহার তৃতীয় কবিতাপুস্তক। প্রথমটি পড়িনি, ছড়ার বই বলে জানি। দ্বিতীয়টি 'শব্দ ফেরে না',

পড়েছি। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থে শ্রী সাহা নিজের বৃত্তের বাইরে যেতে পারলেন না। অবশ্য বৃত্তের বাইরে যেতে হবেই এমন কোন কথা নেই। কিন্তু আমাদের মতো পাঠকদের কবিতার ব্যাপারে অনেক আশা থাকে, বিশেষ যখন বাংলা কবিতাক্ষেত্রে বর্তমানে উত্তরণের সে রকম কোনও আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মৃত্যুর জন্মদিন কাব্যগ্রন্থটি 'প্রেম' 'জীবন' 'দরজার ওপারে' এবং 'তবু' —এই চারটি পর্বে ভাগ করা। চারটি পর্বের শুরুতে শিল্পী রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের আঁকা চারটি সুন্দর ছবি পাতা জুড়ে। প্রচ্ছদও রামানন্দের আঁকা। ছাপা বাঁধাই বেশ ভাল। এককথায় বইটি হাতে নিয়ে বেশ ভাল লাগে।

পঙ্কজ সাহার কবিতার পরিমণ্ডল রোমান্টিক এবং শুদ্ধ কবিতার লক্ষণগুলি তাঁর কবিতায় বেশ পরিস্ফুট। রোমান্টিকতার কতকগুলি কূললক্ষণ আছে। মাঝে মাঝে লক্ষণগুলি সাহিত্যে খুব বেশিমাত্রায় দেখা যায়। আসলে ঐ লক্ষণগুলি শুদ্ধকবিতাবাদীদের আশ্রয়ভূমি। এই মুহূর্তে বাংলা কবিতাতে এই সব লক্ষণের খুব বেশি মাত্রায় প্রতিফলন অনেকের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে। কয়েকটি লক্ষণ হলো (১) অকারণ দুঃখ বা বিষাদ বা বিষণ্ণতা (২) অকারণ সুখ (৩) প্রকৃতি চিত্রণের সময় প্রকৃতির মায়াময়তার দিকে ঝোঁক, (৪) কেবল সুন্দরতার প্রতি ঝোঁক (৫) দূর থেকে দেখা— ইত্যাদি। মৃত্যুর জন্মদিন কাব্যগ্রন্থে উল্লিখিত সবকটি লক্ষণই দেখা যায়। 'প্রেম' পর্যায়ের কবিতাতে 'এসো ভালোবাসা/দুহাতে জড়াও আমাকে' ইত্যাদি লাইনের পরই কবি বলে ওঠেন 'দুখের দুয়ার খোলা।' 'একজন কথা বলছে আরেকজনের সঙ্গে' এমন লাইনের পরই অনিবার্যভাবে আসতে বাধ্য হয় 'মেঘ খেলছে চাঁদ।' জীবন পর্বের কবিতাতে অনির্দিষ্টের দিকে জীবনের ধাবমানতার রূপকল্প এমনকি গভীর চিত্রও কোন কোন কবিতাতে পাওয়া যায় ; যেমন 'আমার মোটর সাইকেল গড়িয়ে যাচ্ছে উন্মাদ সমুদ্রের দিকে।' অথবা মানুষ সম্পর্কে ভাবনার সুন্দর কবিতাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ; যেমন—

'একজন মানুষ খুঁজছে আরেকজন মানুষের মুখ
হাজার হাজার মানুষের মুখ খুঁজছে একজন মানুষের মুখ'

অথবা

'মানুষকে কথা বলতে দাও/মানুষকে মানুষের কথা বলতে দাও।' কিন্তু এসব তাৎক্ষণিক বা সাময়িক। কারণ মানুষের কথা বলতে গেলে, গভীর জীবনের কথা বলতে গেলে, কবিতাতে বিষয় আনতে হবে। শুদ্ধ কবিতাবাদীদের কবিতায় সাধারণত বিষয় থাকে না। থাকে অনুভূতি, হৃদয়বৃত্তি। কাজেই জীবন পর্যায়ের কবিতাতেও সেই অকারণ বিষণ্ণতা, উদাসীনতা ইত্যাদি। হঠাৎ কবির মনে হয় 'যেন বেঁচে আছি/বড়ো একা একা।' 'ছিঁড়ে যায়' 'কী হয়? কী হয়!' 'বসে থাকা' 'ভয় ডাকছে ভয়কে' ইত্যাদি কবিতা অকারণ বিষাদ বা ভয়ের কবিতা।

'দরজার ওপারে' পর্বের কবিতাগুলি মৃত্যুবিষয়ক বা মৃত্যুচিন্তার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এই পর্বের কবিতাগুলি সামগ্রিকভাবে ভাল কবিতা, যদিও মৃত্যুভাবনাও রোমান্টিক পরিমণ্ডলে লালিত। কবি মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও নারীর হাসি দেখে মরতে চাইছেন অথবা দূর থেকে নিঃশব্দ হাহাকার দেখছেন কিংবা 'জ্যোৎস্নার আঁধারে' পরজন্মের ফুল ঝরে পড়তে দেখছেন এবং সেই পূর্বকথিত অকারণ দুঃখবিলাস—

''দুঃখ যেন ঝরাপাতার/শীত বিকেলের হাওয়া
কাঁপায় ডালে কাঁপায় পাতায়/কাঁপায় অশ্রু নাচন ঘিরে''

'তবু' পর্বের মধ্যে মাত্র দুটি কবিতা। তাতেও আবার সেই দুঃখের কথা। কিন্তু এই কবিতাদুটির বৈশিষ্ট্য এই যে সব কিছু সত্ত্বেও কবি নিজের অবস্থানভূমিটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন। সেই অবস্থানভূমিটি হচ্ছে সৌন্দর্যভূমি। সুন্দরের সাধনা ও সন্ধানই কবির সাধনা ও সন্ধান। খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই পঙ্কজ বলেন — 'আমি ইচ্ছে করলে এখানে গড়ে উঠবে স্বর্গ/ফুল ফুটবে বিনা বসন্তে।'

পঙ্কজ সাহার কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, খুব চমৎকারভাবে কবিতায় ছবি আঁকতে জানেন তিনি। তাঁর নিসর্গ চিত্রগুলি চারটি পর্বেই সুন্দর। কবিতায় সেজন্য চমৎকার একটা প্রশান্তিও আছে, আছে ধীর শান্ত কথা বলার অবকাশ। সেদিক থেকে ভাবলে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির সঙ্গে পঙ্কজের কবিতার মেলবন্ধনকে স্বাগত জানাতেই হয়।

মৃত্যুর জন্মদিন— পঙ্কজ সাহা/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩/ ২৫ টাকা

# ষাটের দশকের তিন কবি

**হাসির মল্লিক**

ষাট দশকের কবি হিসাবে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, দেবী রায় চিহ্নিত হয়ে আছেন। এই সময়সীমা ধরলে আলোচ্য তিন কবির কাব্যচর্চা ত্রিশ বছর অতিক্রম করেছে।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিকে ছন্দ ও অন্ত মিলে কুশলী ছিলেন — প্রমাণ পাওয়া যায় 'তৃষ্ণা আমার তরী' কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু সে রীতি তিনি বদলে ফেলেছেন পরবর্তী সময়ে। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি যথেষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে প্রকাশিত হয়েছে, তাই এক একটি গ্রন্থে ভাবের বদলটাও ভাল করেই টের পাওয়া যায়। দেখা যায় এ কবি কবিতার আকার নিয়ে বড় পরীক্ষা নিরীক্ষায় মেতে রয়েছেন। অক্ষর দিয়েই যেন ছবি আঁকেন। অজস্র কাব্যউপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে টান টান কবিতার বদলে



শুধু যেন কাব্য জগতের রহস্যই মেলে ধরে রাখেন। কবিতায় যেন শুধু ভূমিকাই লিখে, বাদবাকি কী হল তা ভাবার দায়িত্ব দেন যেন পাঠককেই! পাঠক ভাবনায় আক্রান্ত হন।

যেমন ...''আমার মা সারাদিন মালা জপেন/ আর আমি / আমার বোন সারাদিন উল বোনে / আর আমি / আমার বউ সারাদিন আলনায় জামা কাপড় সাজায় / আর আমি / আমার প্রতিবেশীরা সারাদিন বাড়ি তোলে / আর আমি / আমার বন্ধুরা সারাদিন লিফটে চড়ে / আর আমি / আমি সারাদিন শুধু আমি শুধু আমি''।

শব্দ প্রয়োগের কৃতিত্বে ও চিত্রকল্প নির্মাণের সাফল্যে সজল পাঠককে তৃপ্ত করেন। তিনি লেখেন, ''মা, যদি বলো, তোমার চুড়ির আওয়াজ আমি ভ্রমরের মত কৌটো করে ভরে রাখব''-র মতো হার্দ্য লাইন। ''এখন পুকুরের জল মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে''-র মতো অজস্র চিত্রকল্প। আবার তিনি খেয়ালী। খেয়ালেই অন্যদের কবিতা থেকে নিজের কবিতাকে আলাদা করতে শব্দ দিয়েই কবিতাকে বিচিত্রভাবে সাজান। যেখানে তিনি লিখেছেন একটিই লাইন। কিন্তু শব্দ, অক্ষরগুলো যে ভাবে সাজিয়েছেন সাদা কাগজের প্রেক্ষাপটে সেখানে শব্দরা ছবি হয়ে উঠেছে — এ কর্মে তিনি কম্পোজিটারকে যথেষ্ট ঘামিয়ে ছেড়েছেন। 'বৃষ্টি' কবিতাটি যেমন। এসবে খেয়ালী সজল ফুটে ওঠেন, কিন্তু কবি হিসাবে তেমন চমৎকারিত্ব পাই না। মজা লাগে। কিন্তু মনেও হয় এত পণ্ডশ্রমে কী লাভ?

নব্বুইয়ের মধ্যভাগে 'নির্বাচিত কবিতা' পড়তে গিয়ে কবিতাগুলিকে একটি সময়ে বাংলা কবিতাকে বদলানোর জন্য এক কবির প্রয়াস ভাবতে ভাল লাগছে। এ ছাড়া কোন অভিনবত্ব বা স্মৃতি জাগরুক কাব্যিক অনুভব তোলে না। তবে কি সময় কবিতাকে জীর্ণ করে? আর দশকওয়ারি বিচার বুঝি এই ক্ষণিক অমরতার ইঙ্গিত? এক দশকেই স্ফুরণ! এবং তারপর জীর্ণ পাতা ঝরার বেলা? আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করা গেল — সজল বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব রীতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন — যা কম কথা নয়, বিশেষ করে বাংলা কবিতার দুঃসময়ে। তবে বইটি ছাপার অসংখ্য ভুলে কবিতার অর্থই বদলে গেছে। কবিতা নির্ভুল ছাপার ব্যাপারে উদাসীনতা আর কত দিন চলবে?

এপারে যেমন কিছু বাংলাদেশের লেখকদের বই প্রকাশ হচ্ছে, তেমনি ওপারেও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের বই বের হচ্ছে কিছু কিছু। আলোচ্য মঞ্জুষ দাশগুপ্তর 'আগুনের ডানা' ও দেবী রায়ের 'আগুনের গান' কবিতার বই দুটি বাংলাদেশের এক প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। রঙচঙে প্রচ্ছদে, ঝকমকে মুদ্রণে, দামী কাগজে।

১৯৮৪ সালে মঞ্জুষ দাশগুপ্তকে আমি আবিষ্কার করি তাঁর ''স্বর্গ থেকে টেলিফোন'' কাব্যগ্রন্থটি পড়ে। সে কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা, কবিতার লাইন আজও মনের মধ্যে দোলা দেয় যেখানে তিনি লিখেছিলেন 'সুন্দরের কাছে যেতে নেই/ টুকিটাকি ভুল ধরা পড়ে'। 'প্রেমিক রোদ্দুর তার বান্ধবী হাওয়ার সাথে / খেলা করে নদীতে এখন' বা 'মাঝে মাঝে ভুল দরজায় টোকা দিতে ইচ্ছে হয় খুব' — এমত একান্ত কাব্যিক অনুভব কবি সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়েছিল। যদিও মনে হয়েছিল সুনীলের ছায়া যেন রয়েছে। তবু একটি অনুভবময় কাব্যজগত দেখেছিলাম সেই সময় মঞ্জুষের কবিতায়।

এই মঞ্জুষ বদলে গেছেন 'আগুনের ডানা'য় এসে। এখানে সেই শিহরণ জাগানোর মতো তিনি লেখেননি। বক্তব্য প্রকাশের জন্য যথাসম্ভব চিত্রকল্প পরিহার করেছেন। ব্যবহার করেছেন সরল ভাষা। বরং মেতেছেন ছন্দ আর অন্ত্যমিলে। আর ছন্দের ফাঁদেও পড়েছেন। অন্ত্যানুপ্রাসের আগ্রহে লেখেন ''মোষের শিং / মূর্ত করে মুহূর্তেই তোমার সে এচিং / পাহাড়ে শুয়ে মুচকি হাসে তখন দার্জিলিং''। বিভিন্ন ধরনের কবিতায় সহজসরল ভাবে সময়কেই মঞ্জুষ ধরতে চেয়েছেন। অনেক কবিতা সমাজ ও সময়মনস্কতার চাপে কবিতা হয়ে ওঠেনি। আর সারল্যের জন্য অনেক কবিতাই ঢিলেঢালা গোছের হয়ে গেছে। মনে দাগ কাটে না। তিনি লিখছেন 'উত্তরাধিকার' কবিতায় ''যে প্রিয় প্রতিবেশী খুশির ঈদে দিল / আমাকে উপহার এবং ভালোবাসা / আমিও তাকে দিই দশমী পার হলে/ অথচ বাঁকা চোখে এখন দেখি তাকে/ সেও তো দেখে আজ তেমনি আঁকাবাঁকা'। কবি আরও বলেছেন ''হৃদয় পতিত জমি বহুকাল হলো/ এখন খুঁড়লে শুধু কেঁচো কৃমি পাথরের কুচি/ এখানে এনেছ তুমি ফুলচারা পুতে দেব বলে/ হৃদয় পতিত জমি অকর্ষণে এখন অশুচি''; (সম্ভবত 'অকর্ষণে' শব্দটি হবে।) সুন্দরের কাছে কবির যেতে যেন ভয়, 'স্বর্গ থেকে টেলিফোনে' যেমন দেখেছি, এখানে লিখছেন ''সুন্দরের কাছাকাছি এলে/ ঈগলের ডানা/ নড়ে ওঠে মাথার ভিতরে''... ''সুন্দরের কাছাকাছি এলে/চতুর্দিকে ভূমিকম্প হয়''.... কবিতা বিষয়ে একটি কবিতায় মঞ্জুষ লিখছেন ''যে সব বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখার কথা/ সে বিষয়ে এখনকার কথিত কবিরা/ পদ্য লেখে শব্দের কঙ্কালে'' ...বাস্তবিক এটা খুবই সত্য কথন। তাই কবিতা থেকে লাবণ্য বিদায় নিয়েছে। কবি আশা করেছেন ''শব্দের শরীরে কিছু মেঘের সোনালি চাই।'' আমারও সে আশা। যদিও এ কবি সে প্রত্যাশা পূরণে সবটা সক্ষম হননি। তবে এই গোলমেলে সময়ে (কবিতার সময় চিরকালই গোলমেলে?) 'মেঘের সোনালি' সঞ্চার করতে পারা দুরূহ এবং প্রকৃত প্রতিভা-অন্বিষ্ট। সেই আশাতেই তো কবির মুখোমুখি হই।...

দেবী রায়ও ষাটের দশকের এক বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিতায় বারে বারে 'মেঘের সোনালি'র সন্ধান পেতে গিয়ে ধাক্কা

খেয়েছি। রুক্ষভাষা, কঠিন বাস্তব জীবনের কথা কবিতায় ছিল। ৮৬টি কবিতায় বিভিন্ন বিষয়ে দেবী রায় কবিতা লিখেছেন। 'আগুনের কবিতা'য় লিখেছেন "ভিতরে আগুন/ আমাকে শান্ত হতে দেয় না/ বাহিরে সব উল্টোপাল্টা ঘেয়ো অশান্তি/ আগুনকে আরো উস্কে দেয়'। অবশ্য লিখছেন..."বস্তুত, জীবন তো 'তৃণাদপি' 'ক্ষুদ্র' নয়/ সে-ও এক বিরাট গভীর নদী,.../ আর, নদীর কোনো বিরক্তি নেই অপমান—/ জ্ঞানগম্যি নেই, মন রাখারাখি নেই—/ তার আছে শুধু ভেসে যাওয়া'। 'মৃত্যু' কবিতায় দেবী বলেন "এসো মৃত্যু চুপি চুপি— লঘু চরণে কেন—কেন লজ্জা/ লজ্জা কি তোমাকে মানায় ?" আবার 'মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে' কবিতায় বলছেন "তোমার কাছে আসতে হলেও সম্পূর্ণ নিরাবরণ স্বাধীনতা চাই"। এই সব পাঠ করে মনে হচ্ছে তাঁর কবিতা থেকে ষাটের বৈশিষ্ট্য ঝরে যাচ্ছে। বক্তব্য সরাসরি, পেলব কবিতা হোক আর না হোক লিখছেন, "কবিতাকে সামনে রেখে, তুইয়ো কি গোছাতে চাস, আখের / রে নির্বোধ ?/ বাজারে বেবুশ্যেদের দেখে, প্রকাশ্যে নাক কুঁচকোয় মানুষ/ শোধবোধ— / তবে তোর সঙ্গে, তাদের কিসের তফাৎ"। কে জানে কার প্রতি এ ইঙ্গিত ? যাক দেবী রায় আশ্বাস দিয়েছেন "এসো ভুলে যাই তাদের, যাদের দুপকেট, বোঝাই/ খ্যাতি, আমরা শুধু আমাদেরই পদ্য আওড়াই..."। এটাই ভাল। আর কতটুকু চাইব ক্ষুদ্রজীবনে— তার চেয়ে কবিতার স্বার্থে এই ভাল। দেবী রায় বলেন "বেঁচে আছি, সজ্জিত আলোক মালার মতন / নিজেকে জ্বালিয়ে/ আজো ঠিকঠাক বেঁচে আছি!" যদিও কবির প্রশ্ন 'কিন্তু, এ কেমন বেঁচে থাকা ?' আমরা বলব এই তো বেঁচে বর্তে থাকা! এই তো জীবন। আর জীবনই মূর্ত হোক কবিতায় !!

**নির্বাচিত কবিতা** — সজল বন্দ্যোপাধ্যায় / মহাদিগন্ত বারুইপুর, ২৪ পরগনা (দ)/ ৫০ টাকা

**আগুনের ডানা** — মঞ্জুষ দাশগুপ্ত / প্রসূন লিমিটেড, ৫/ক, জুমরাইল লেন, ঢাকা — ১১০০ / ৫০ টাকা

**আগুনের গান** — দেবী রায় / প্রসূন লিমিটেড / ৫০ টাকা

# একটি অভিনব অভিধান

## অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় শব্দার্থ অভিধান বা শব্দকোষ অনেকগুলি সংকলিত হয়েছে। সম্প্রতি অন্য নানা ধরনের অভিধান লেখার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। সমার্থ শব্দাভিধান, উচ্চারণ অভিধান, প্রয়োগ অভিধান, বানান অভিধান প্রভৃতি অভিধান এখন পাওয়া যাচ্ছে। এরই সাম্প্রতিক সংযোজন অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্যের 'লেখক ও সম্পাদকের অভিধান'। সুভাষবাবু অনেকদিন ধরেই অভিধানচর্চা করে আসছেন। তাঁর হাত থেকে আমরা আগেই প্রয়োগ অভিধান, বাগ্‌ধারা অভিধান, ইতিহাস অভিধান, উচ্চারণ অভিধান উপহার পেয়েছি। আলোচ্য অভিধানটি একটু অভিনব। আনন্দবাজার পত্রিকার তরফে যে ব্যবহারবিধি অনুসৃত হয়ে থাকে তা নিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কী লিখবেন কেন লিখবেন' বইখানির অনুসঙ্গী বলা যায় সুভাষবাবুর এই অভিধানকে।

বাংলাভাষা চর্চার ক্ষেত্রে আমরা কেবলই ইংরেজির সঙ্গে তুলনা টানি। আসলে ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজির চর্চা করে আসছি। অপরাপর বিদেশী ভাষা দু-একটির চর্চা করে থাকলেও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রতি আমাদের আগ্রহ অতি সীমিত। তাই ইংরেজিতে যেসব কাজ হয়েছে তাকেই আমরা আদর্শ বলে গ্রহণ করে স্বভাষায় সে রকম কিছু করতে অনুপ্রাণিত হই। ইংরেজিতে হরেক কিসিমের অভিধান আছে, আছে লেখক ও সম্পাদকদের ব্যবহার্য নানা বই। বাংলাতে যেহেতু এই ধরনের একটি অভিধান অপেক্ষিত ছিল সেই হেতু আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ এই বই-এর পরিকল্পনা করেছেন। সত্যি সত্যি, বাংলায় যাঁরা লেখালিখি করেন — বিশেষ করে সম্পাদনা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ — তাঁদের হাতের কাছে রাখার মতো এমন একখানি অভিধানের খুবই দরকার ছিল।

সুভাষবাবুর এই অভিধানটিতে নির্বাচিত বাংলা শব্দের বানানের নির্দেশ তো আছেই, সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে সাহিত্য ও রাজনীতিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দের অর্থ এবং ভারতীয় ও অভারতীয় নানা ব্যক্তিত্বের জন্মমৃত্যু সহ কর্মকৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এছাড়া বিরামচিহ্নের ব্যবহার ও অনুচ্ছেদের নিয়ম নিয়েও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বানান সম্বন্ধে গৃহীত নীতিসূত্রও বিবৃত হয়েছে। কাজেই সব মিলিয়ে বইটি খুবই কাজের হয়েছে।

এই ধরনের একটি অভিধান সংকলনের কাজটি যে কত দুরূহ তা বাংলা ভাষার কারবারি মাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য। যতই দিন যাচ্ছে বাংলার শব্দসম্ভার নানা দিক থেকে বেড়ে উঠছে। আবার পুরনো অনেক শব্দ আপনাআপনি বর্জিত হচ্ছে। সাহিত্যের সদরমহলে চলতিভাষার ব্যবহার সর্বাত্মক হওয়ার ফলে শব্দে ও বানানে ব্যাপক রদবদল ঘটে গেছে। প্রমথ চৌধুরী মশায় যে চলতি ভাষায় লিখতেন আজকের লেখকরা ঠিক সেইভাবে লেখেন না। একদা আচার্য সুনীতিকুমার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানের শব্দাবলি বিশ্লেষণ করে তৎসম ও অতৎসম শব্দের যে অনুপাত হিসাব করেছিলেন আজ আর তা সে-জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। এখন পরিসংখ্যান নিলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে তদ্ভব ভগ্নতৎসম ও অন্যান্য সূত্র থেকে আহৃত বাংলা শব্দের সংখ্যা তৎসমকে ছড়িয়ে গেছে। তাছাড়া সংস্কৃত শব্দের মূল বানানের বাংলা রূপে বেশ কিছু পরিবর্তনও গৃহীত হয়ে গেছে। এই অবস্থায় বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ করতে গিয়ে অভিধানকারকে অবশ্যম্ভাবী রূপেই কতকগুলি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সুভাষবাবুও তার থেকে রেহাই পাননি। ব্যাকরণসম্মত অথচ সরল বানান — সাধারণভাবে এই নীতি গ্রহণ করলেও একদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের আনুগত্য অন্যদিকে খাঁটি বাংলা রীতি অনুসরণ এই দু-এর টানাপোড়েন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মধ্যেও লক্ষ করা যায়। বাংলাভাষায় নিজস্ব স্বভাবের মধ্যেই এটি নিহিত। আমরা একই সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও শরদিন্দু লিখি। মন্ত্রিত্ব মন্ত্রিসভা রক্ষিবাহিনী লিখলেও গুণীজন বা শিল্পীগণ বানানে ইন্-ভাগান্ত সংক্রান্ত বিধান শিথিল করতে আগ্রহী। মাসি পিসি লিখলেও শাশুড়ী ননদিনী লিখতে চাই। পুজারি পূজারিনি পাশাপাশি লিখে ফেলি। এক সময় রাত্রী জটীল প্রতীকার বানান লেখা হত। এখন এইসব শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার বর্জিত হয়েছে। অথচ শ্রেণি তরণি সরণি প্রভৃতি বানান বিকল্পে সিদ্ধ হলেও এগুলি হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লিখতে দ্বিধান্বিত। আবার ইতোমধ্যে ইতোপূর্বে ধরনের শব্দ বর্জন করলেও বহুপ্রচল আগামীকাল-এর জায়গায় আগামিকাল লিখতে উৎসাহী। স্থায়িরূপ না স্থায়ীরূপ কোন্ বানান বাংলায় সিদ্ধ এ নিয়ে মন ঠিক করতে পারি না। বিদেশী ব্যক্তিদের নাম লিপ্যন্তর করার সময় কী নীতি নেওয়া হবে সে নিয়েও বিভ্রান্তি আছে।

এই অভিধানে সুভাষবাবু খাঁটি বাংলার ই-প্রত্যয় গ্রহণ করে অতৎসম শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ই-কার দেওয়ার বিধান দিয়েছেন। এমনকি নির্বাহি পঞ্চমুখি বৈশাখি নীলাম্বরি পুঁজিবাদি পলায়নি সাথি মানি প্রভৃতি বানান স্বীকার করেছেন। এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতাও এই দিকে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই সূত্রের প্রবক্তা।

পরদা ভরতি মরজি বরগা গোরখা সারকিট ফরসা প্রভৃতি বানান এই অভিধানে প্রাপ্তব্য, সেইসঙ্গে কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে ফর্মা সর্দি গির্জা। আবার অগুনতি আলপনা পালকি ডেলকি অটপসি থাকলেও অক্টেভ-কে ভাঙা হয়নি। এ ধরনের বানান কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভাঙা যেতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসা বেশ কষ্টকর।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী অসিদ্ধ হলেও বাংলায় ইতিপূর্বে ইতিমধ্যে মুহ্যমান পক্ষীরাজ প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি শব্দ বহুল ব্যবহৃত। এগুলিকে সুভাষবাবু নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। এমনকি অপসৃয়মাণ বা অপম্রিয়মাণের মতো অপশব্দ গ্রহণেও তাঁর আপত্তি নেই। নিম্ন অর্থে নিচ বানানও তিনি মেনে নিয়েছেন। অথচ আপত্তি তুলেছেন ভ্রাম্যমাণ চলৎশক্তি আকর্ষণীয় প্রার্থনীয় সেনাধ্যক্ষ সম্মানীয় প্রভৃতি শব্দে। ঠিকই, এসব শব্দের মূল অর্থের কিছুটা প্রতিসরণ ঘটে গেছে। কিন্তু প্রচলিত অর্থে এগুলির ব্যবহার আজ মেনে নেওয়াটাই তো সংগত। অনুভা শব্দটিকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। মনিয়র উইলিয়ামস-এ কিন্তু অণুভা-র পাশাপাশি অনুভাও পাওয়া যাচ্ছে, অর্থ to shine after another। বরং উর্ধ্ব শব্দের ব-ফলাহীন বানান যদি সংস্কৃত ব্যাকরণমতে শুদ্ধ হয়ে থাকে তবে তা এখনই স্বীকার করে নেওয়া হোক।

সুভাষবাবুর কাছে হস্‌চিহ্নহীন পৃথক স্বক গরীয়ান গ্রহণীয়, দিক সম্বন্ধে বলে দিয়েছেন 'দিক্ বর্জিত'। আবার আশিস্ এর ক্ষেত্রে 'হসন্ত অপরিহার্য'। কেন এই বিধান ?

সুভাষবাবু 'দায়ি নয় দায়ী' বলেছেন। কিন্তু মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা বানান' গ্রন্থে বলেছেন, দায়ক অর্থে দায়ী শব্দ তৎসম হলেও responsible অর্থে শব্দটি সংস্কৃত নয় বাংলা এবং ফলে শেষোক্ত অর্থে দায়ি বানান ভুল নয়। তাহলে তো দায়ি চালানো যায়।

নতুন নোতুন শব্দদুটির মধ্যে প্রথমটি অধিকতর প্রচলিত হলেও দ্বিতীয়টি অধিকতর সংগত বলে সুভাষবাবু উল্লেখ করেছেন। তাঁর দিকে সুনীতিকুমার আছেন। নৌতুন হল এর অব্যবহিত আগের রূপ। কিন্তু এখন নতুনকে আবার ও-কার ধারণ করিয়ে কী সুবিধা হবে। বিশেষ করে উচ্চারণে যখন তফাত কিছু হচ্ছে না। গোরুর কথা আলাদা, এর কলেবরবৃদ্ধি অনেককাল আগেই মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য গরু এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। আর একই শব্দের রূপভেদ তো বাংলা বানানের বৈশিষ্ট্য। আর সেখানেই বিপত্তি।

তৎসম শব্দের অন্ত্য বিসর্গ বর্জনের নীতি স্বীকার করলেও সুভাষবাবু দুটি ক্ষেত্রে বিসর্গ রক্ষা করার পক্ষপাতী। পুনঃপুনঃ আর শনৈঃশনৈঃ। তাহলে ইতস্তত-র বেলায় কী হবে ?

সুভাষবাবু বেশ কিছু শব্দের জন্য হাইফেন অবশ্য ব্যবহার্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণ, কেউ-কেউ ঘুরে-ফিরে চলতে-চলতে আস্তে-আস্তে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি শব্দকে না জুড়ে লিখতে বলেছেন, যেমন অঘোষ ধ্বনি। এ সম্বন্ধে একটা ধরাবাঁধা নীতি হয়ত ঠিক করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা কতটা চালু করা যাবে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

কিছু কিছু স্থাননামের প্রচলিত বাংলা বানানের জায়গায় ঈষৎ পরিবর্তিত বানানের বিধান এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। অজমিড় খজুরাহো গাংতোক প্রভৃতি। কোনো কোনো অভ্যস্ত ইংরেজি উচ্চারণেও ভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন আইরন ইংগট। অনেক ব্যক্তিনামের, বিশেষ করে ফরাসি ইতালি, প্রচলিত বাংলা বানানের বদলে মূলানুগ বানানের বিধানও আছে। এই ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে অভিধান ব্যবহারকারীকে তাঁর উদ্দিষ্ট শব্দটি খুঁজে পেতে একটু অসুবিধা হতে পারে। Jespe-

rsen-এর লিপ্যন্তর য়েসপেরসেন কিংবা ইয়েসপেরসেন (জেসপারসেন নয়), আবার Jesus এর বেলায় জিশু-ই সংগত (যিশু বা যীশু প্রচলিত হলেও) বলে বলা হয়েছে।

সুভাষবাবু ওআটার ওআর ওআরিশ ওআকিবহাল কোআলিশন কোআর্টার্স জানুআরি প্রভৃতি বানানের বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ সুপ্রচলিত য়া-র জায়গায় আ বসাতে চান।

লেখক ও সম্পাদকদের জলদি রেফারেন্সের জন্য এই অভিধানে দেশবিদেশের বেশ কিছু রাজনীতিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিখ্যাত মানুষের জন্মমৃত্যু সাল সহ তাঁদের কর্মকৃতিত্বের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এমনি নামের মধ্যে নেহরু জওহরলাল কিংবা জিন্না মহম্মদ আলি থাকলেও গান্ধী মোহনদাস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহাত্মা গান্ধীও নেই। আছে গান্ধি, গান্ধিজি, গান্ধীজি। কিন্তু সেখানে জন্মসাল মৃত্যুসালের উল্লেখ নেই। চমস্কি নোআম এনট্রিতে তাঁর জন্মসাল, পরিচয় ও রচিত গ্রন্থের কথা বলা আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে শুধু তাঁর জন্মমৃত্যু সালটুকুই দেওয়া হয়েছে। সুকুমার সেনকে শুধুই ভাষাতাত্ত্বিক বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাঁর মৃত্যুসাল থাকলেও জন্মসাল নেই। সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মমৃত্যুসাল বঙ্গাব্দে দেওয়া হয়েছে, যদিও অন্যসব ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় সালই পাওয়া যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র অনুপস্থিত, যদিও বন্দেমাতরম্ বঙ্গদর্শন লভ্য। নট ও নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে হুকাকাশি-র লেখক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহর্ষি মনোরঞ্জন আর শিশুসাহিত্যিক মনোরঞ্জন কিন্তু এক ব্যক্তি নন।

কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই অভিধানে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি খুবই কাজের। যেমন আলোকবর্ষ-এর যথার্থ ও অব্যর্থ সংজ্ঞা 'এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে'। তেমনি উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন। তবে এই অতি সংক্ষিপ্ত অর্থে মন ভরে না, যিনি ওই শব্দগুলির মানে খোঁজার জন্য হাতড়াবেন তাঁকে আর একটু খবর দিতে পারলে ভালো হত।

সুভাষবাবুর বইখানি 'আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি' হিসাবে চিহ্নিত। এই ব্যবহারবিধির আগের বইখানি হল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন'। স্বভাবতই দুখানি বই এর মধ্যে মিল অমিলের প্রসঙ্গটি উঠতে পারে। নীরেনবাবুর দেশি বিদেশি পরদেশি সুভাষবাবু মেনে নিলেও চীন-কে হ্রস্ব করতে রাজি নন। উহ্য সম্পর্কে সুভাষবাবুর মন্তব্য হল, 'অনুমেয় বা অনুল্লিখিত বা অনুক্ত অর্থে প্রয়োগ ভুল'। নীরেনবাবু বলেন কোনও, সুভাষবাবু চান কোনো। ইঞ্জিনিয়ার এঞ্জিনিয়ার, খ্রিস্ট খ্রিষ্ট, নামি নামী, থুরথুরে থুড়থুড়ে, ঈর্ষা ঈর্ষ্যা, অন্তরিক্ষ অন্তরীক্ষ, চর্ব্যচুষ্য চর্ব্যচোষ্য, তরজমা তর্জমা, ধরনা ধর্না, ভালো ভাল, ভারি ভারী, আপোশ আপস, আপশোস আফসোস, টেলিভিসন টেলিভিশন, ট্যাঁশ ট্যাঁস, তফশিল তফসিল, শাল্মলী শাল্মলি, হাবশি হাবসি প্রভৃতি দুরকম বানানে দুজনের আলাদা আলাদা পক্ষপাত লক্ষ করা যায়। টুঁ আর টুঁটু বানানে নীরেনবাবু চন্দ্রবিন্দু বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, সুভাষবাবু প্রথমটিকে অধিকতর প্রচলিত এবং দ্বিতীয়টিকে গ্রহণীয় বলে রায় দিয়েছেন। নীরেনবাবু যেখানে ঢোক লিখতে বলেন সুভাষবাবু সেখানে ঢোঁক শব্দটিই লেখ্য বাংলায় প্রচলিত বলে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

একই সংস্থার দুই ব্যবহারবিধিতে বিভিন্ন বিধান থাকার ফলে এই বিধি ব্যবহারকারীরা সংশয়ের মধ্যে পড়বেন। এই দুটি বই- এর সঙ্গে যদি অরুণ সেনের 'বানানের অভিধান' মেলানো যায় তাহলে সেই বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যাবে। এর থেকে একটা সত্য বেরিয়ে আসে, তা হল — আধুনিক বাংলায় বহু শব্দের একাধিক রূপ আছে। একটা বিশেষ পর্যায়ে কোনও ভাষার ক্ষেত্রে এমনটা হতেই পারে। একই শব্দের এই বিভিন্ন রূপের থেকে বাছাই করে এখন একটা সমতা বিধানের প্রয়াস নেওয়া আবশ্যক। নইলে লেখক পাঠক শিক্ষার্থী সব মহলেই বানান নিয়ে বিশৃঙ্খলা থেকে যাবে। কোনো সংবাদপত্র গোষ্ঠী কিংবা কোনো বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট নিয়মসূত্র মেনে স্টাইলশিট তৈরি করে তাঁদের প্রকাশনায় সেই বিধি অনুসরণ করতে পারেন। অন্তত তাঁদের বইপত্রে তাহলে একই শব্দের একটাই নির্ধারিত বানান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল আনন্দবাজার গোষ্ঠীর নিজস্ব নিয়মবিধিই তাঁদের দৈনিক বা পাক্ষিকে পুরোপুরি অনুসৃত হয় না। অলংকার সংকট প্রকৃতি বানান সুভাষবাবুর ব্যবহারবিধিতে থাকলেও আনন্দবাজার বা দেশে ওই বানান লেখা হয় না। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রকাশনাতেও সবজায়গায় বানানের একরূপতা দেখা যায় না। মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ কিংবা রাজ্য পুস্তক পর্ষদের বইগুলিতেও কোনো নির্দিষ্ট বানাননীতি লক্ষিত হয় না। এই অবস্থায় এইসব প্রতিষ্ঠানের একযোগে একটি নিয়মসূত্র রচনা এবং তা অনুসরণের উদ্যোগ নেওয়ার সময় এসেছে।

আলোচ্য অভিধানটির বিশেষ কার্যোপযোগিতা আছে বলেই এসব কথা বলতে হল। মনোহর বইখানির ছাপা বেশ ঝকঝকে। তবে জ-এর বর্ণানুক্রমটি একেবারে বিপর্যস্ত। মুদ্রণে কিছু অনবধানতার ভুল আছে, যেমন নিজস্ত। পরবর্তী সংস্করণে একটি সুপরিমার্জিত অভিধান পাওয়া যাবে — এ আশা অবশ্যই করা চলে।

**বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান— সুভাষ ভট্টাচার্য/ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯/ ৫০ টাকা**

## সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

# রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞানমানস প্রসঙ্গে একটি আলোচনা

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যন্ত্রসভ্যতার বিজয় বৈজয়ন্তী নিয়েও মানুষ আজ বড় অসুখী ও অসহায়। অনেক পাওয়া সত্ত্বেও মনের গভীর অসুখ থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি। বিজ্ঞান যে হারে বাহ্যিক পরিবেশের উন্নতি ঘটিয়েছে — সে হারে মানবিক উন্নতি ঘটাতে পারেনি। তাই বিশ্বব্যাপী চলছে মূল্যবোধের অন্বেষণ! 'বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের' (scientific humanism) আন্তর্জাতিক শিবিরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। উন্নয়ন ও উচ্ছ্বাসের ডালি নিয়ে তেরশ সাল বিদায় নিয়েছে — শুরু হয়েছে চোদ্দশ সাল।

বিগত শতকের মূল্যায়নে অবতীর্ণ হয়েছেন একাধিক বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। সমাজের সীমাবদ্ধতা কারো দৃষ্টিই এড়িয়ে যায়নি। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন— অধুনার সমাজে মূল্যবোধের ঘটেছে ভয়ঙ্কর অবক্ষয়! এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখনীতে সে চিত্র বড়ই নিখুঁত: "...শতাব্দী শেষে আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব নেই; বাহু বল ও বুদ্ধিবল আছে, চরিত্রবল নেই, সাফল্য আছে, সার্থকতা নেই; পরিশীলিত জীবনচর্যা আছে কিন্তু মহৎ জীবনাদর্শ নেই; চিৎকার আছে, চিন্তা নেই; আস্ফালন আছে, আনন্দ নেই। এই কারণেই বস্তুগত সাফল্যের এক সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে এসে মানব সভ্যতা আজ এক চরম সংকটের সম্মুখীন।"

এ যন্ত্রণা কেবল এদেশের নয়— বিশ্বের সর্বত্রই এই দীর্ঘশ্বাস। বিজ্ঞানীপ্রবর জুলিয়ান হাক্সলি বলেন— 'বিজ্ঞান ও মানবমনের এই বিরোধের নিরসন হবে তখনই, যখন মানুষ বিজ্ঞানকে ব্যবহারের সঙ্গে 'বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ'কে তার শিক্ষার ও চর্চার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করবে।' হাক্সলির এই বক্তব্য ব্যক্তির 'বিজ্ঞান মনস্কতার' কথাই স্মরণ করায়। 'বিজ্ঞান মনস্কতা'র অর্থ বিজ্ঞান বিষয়ে পঠন-পাঠন নয়। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেন, "যন্ত্রপাতির ব্যবহাররত বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত সকলকে আমি বৈজ্ঞানিক বলে ধরি না। আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই আসল।" সেই মন অবশ্যই যুক্তিবাদ, আধুনিকতা, সংস্কারমুক্ত চেতনার ধারক।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজজীবনের চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের পথ ও পন্থা তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডে নিহিত। এবং সেই কর্মকাণ্ড অনুধাবন করলে সেখানে বিস্ময়কর ভাবে বিজ্ঞানচেতনার সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রচেতনায় নিহিত 'বিজ্ঞান মানস'কে চিহ্নিত করা — যাতে সেখান থেকে এ ক্ষতদগ্ধ সমাজমানস পুনরুত্থানের কোন পরিকাঠামো পায়।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের লেখনী অনুসরণে বিবিধ ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা যায়। সেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার নিবিড় সন্নিবেশ বর্তমান।

### পদার্থবিদ্যা

তাঁর রচনায় পদার্থবিদ্যার 'আলোক বিজ্ঞান' ও 'স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানের' প্রসঙ্গ অত্যন্ত তথ্যবাহুল্যে সমুপস্থিত। আলোক তরঙ্গের প্রকৃতি ও বিস্তার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "সূর্যের আলো সাদা। এই সাদা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। ...তিন পিঠওয়ালা কাঁচের ভিতর দিয়ে রোদ্দুর এলে তার থেকে সাত রঙের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে— বেগনি (violet), অতি নীল (indigo), নীল (blue) সবুজ (green), হলদে (yellow), নারাঙি (orange) আর লাল (red) । এই সাতটা রঙ চোখে দেখা যায় কিন্তু এদের দুই প্রান্তের বাইরে তেজের আরো অনেক ছোট বড়ো ঢেউ আছে, তারা আমাদের সহজ

চেতনায় ধরা দেয় না। সেই জাতের যে ঢেউ বেগুনি রঙের পরের পারে তাকে বলে ultra-violet-light । সহজ ভাষায় বলা যায় বেগনি-পারের আলো। আর যে আলো লাল এলাকায় এসে পৌঁছায়নি, রয়েছে তার আগের পারে তাকে বলে infra-red-light, আমরা বলতে পারি লাল-উজানি-আলো।'' আলোর বিচ্ছুরণ এবং বিভিন্ন আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনামূলক মনোজ্ঞ আলোচনার সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থের আলোক শোষণ ক্ষমতার কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর লেখনীতে বস্তু বর্ণ প্রকৃতি ও বিবর্ণতার বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বর্তমান: ''সব রঙ মিলে সূর্যের আলো সাদা, তবে কেন নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রঙ নিজের মধ্যে নেয় না, কোন কোনটাকে বিনা ওজরে বাহিরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরত দেওয়া রঙটাই আমাদের চোখের লাভ। চুনি পাথর সূর্য কিরণের আর সব রকম ঢেউকেই মেনে নেয়, ফিরিয়ে দেয় লাল রঙকে। তার এই ত্যাগের দানেই চুনির দ্যুতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোন খ্যাতি নেই....সূর্যের সব ঢেউকেই পাকা চুল ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাঁচা চুল কোন ঢেউ ফিরে দেয় না, অর্থাৎ আলোর কোন অংশই তার কাছ থেকে ছাড়া পায় না; তাই সে কালো।''

মহাকর্ষ বল বোঝাতে তিনি লিখলেন: ''বস্তুমাত্র যে আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমন কি আলোকেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়।....ইংরেজিতে যাকে গ্রাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না বলে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।''

স্থিরতড়িৎ তথা 'Statical Electricity'-র তত্ত্ব বলে, বিদ্যুতের সুপরিবাহী দুই পদার্থ পরস্পর ঘর্ষণের পর তাদের পরস্পরকে পৃথক করলে একটির মধ্যে ধনাত্মক আধান (Positive Charge) এবং অপরটির মধ্যে ঋণাত্মক আধান (Negative charge) সঞ্চালিত হয়। প্রাথমিক অবস্থানে বস্তুকণা নিস্তড়িৎ কারণ তাতে সমান সংখ্যক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান থাকে। ঘর্ষণজনিত বল পরমাণুর আধান কণার বিচ্ছিন্নকরণ ঘটায় এবং পরিবাহী বস্তু বিদ্যুৎ আধানে আহিত হয়। এই সত্য রবীন্দ্রনাথ প্রাঞ্জল ভাষায় রেশম ও ঘষা কাঁচের ঘর্ষণ বক্তব্যে পেশ করেছেন: ''এক টুকরো রেশম নিয়ে কাঁচের গায়ে ঘষা গেল। ফল হল এই যে ঘষড়ানিতে কাঁচের থেকে কিছু ইলেকট্রন এল বেরিয়ে, সেটা চালান হল রেশমে। কাঁচে নেগেটিভ কমতেই পজিটিভ বিদ্যুতের প্রাধান্য হল, ওদিকে রেশমে নেগেটিভ বিদ্যুতের প্রভাব বাড়ল, সেটা হল নেগেটিভ বিদ্যুতের দ্বারা চার্জ করা। ইলেকট্রন-খোয়ানো কাঁচ তার পজিটিভ চার্জের ঝোঁকে টেনে নিতে চাইল রেশমটাকে, আবার নেগেটিভ ভিড়-বাহুল্যওয়ালা রেশমে টান পড়ল কাঁচের দিকে। কাঁচ ও রেশমে সাধারণতন্ত্র যখন অক্ষুন্ন ছিল তখন আপনাতে আপনি ছিল সহজ, ছিল শান্ত। শান্ত অবস্থায় এদের মধ্যে বৈদ্যুতের অস্তিত্ব জানাই যায়নি। বাহিরে বৈদ্যুতিক গৃহবিপ্লবের খবর তখন বেরিয়ে পড়ল যেমনি ভাগাভাগির অসমানতায় ক্ষোভ জন্মিয়ে দিলে।'' কেবল বৈদ্যুতিক তত্ত্বই নয় — তার প্রয়োগও রবীন্দ্রমানসে প্রোথিত ছিল। সে প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, ''আজকাল ইলেকট্রিসিটি শব্দটা খুব চলতি — ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক মশাল, ইলেকট্রিক পাখা, এমন আরো কত কী। সকলেরই জানা আছে ওটা একরকম তেজ। এও সবাই জানে মেঘের মধ্যে থেকে আকাশে যা চমক দেয় সেই বিদ্যুৎও ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বিদ্যুৎই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রবল প্রতাপে ইলেকট্রিসিটিকে, আলোয় এবং গর্জনে ঘোষণা করে। গায়ে লাগলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ইলেকট্রিসিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বৈদ্যুত।''

### রসায়ন

পদার্থবিজ্ঞানের আঙিনা ছাড়িয়ে কবির মন যখন রসায়ন বিজ্ঞানের আলোচনায় আসে তখন আমাদের আনন্দও যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বিস্ময়ও তেমনই কম হয় না। পরমাণুর গঠন প্রকৃতি রসায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এই কৌতূহলী বিষয়ের সন্ধানে কবিও এগিয়ে এসেছিলেন: ''হাইড্রোজেনের চেয়ে হালকা গ্যাস আর নেই। এর পরমাণু কেন্দ্রে বিরাজ করছে একটি মাত্র বৈদ্যুত কণা, যাকে বলে প্রোটন। তার টানে বাঁধা প'ড়ে চার দিকে ঘুরছে অন্য একটি কণিকা যার নাম ইলেকট্রন। প্রোটন-কণায় যে বৈদ্যুতের প্রভাব সে পজিটিভ ধর্মী; আর ইলেকট্রন কণা যে বৈদ্যুতের বাহন সে নেগেটিভ ধর্মী; নেগেটিভ ইলেকট্রন, চটুল চঞ্চল, পজিটিভ প্রোটন রাশভারী। ইলেকট্রনের ওজনটা গণ্যের মধ্যেই নয়; পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভার তার কেন্দ্রবস্তুতে জমা থাকে। ...পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল কেন্দ্রস্থলে প্রোটনের এক সহযোগী। সে হ্যাঁ ধর্মীও নয়, না ধর্মীও নয়। অতএব সে বৈদ্যুতধর্মবর্জিত। সে আপন প্রোটন শরিকের সমান ওজনের কিন্তু ইলেকট্রনকে টানতে পারে না। এই কণার নাম দেওয়া রয়েছে ন্যুট্রন।''

বিজ্ঞানের রহস্যসন্ধানী কবি কেবল পদার্থের পরমাণুতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। পরমাণু থেকে পদার্থের রূপে— সরল থেকে তার জটিল ব্যাখ্যাতেও প্রয়াসী হলেন। পদার্থের মৌল ও যৌগ প্রকৃতির বিবরণ দিলেন এক অনুপম কাব্যিক ছন্দে: ''পদার্থের একভাগের নাম মৌলিক আর এক ভাগের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থে কোন মিশেল নেই, আর যৌগিক



পদার্থে এক বা আরো বেশি জিনিসের যোগ আছে। সোনা মৌলিক, ওকে সাধারণ উপায়ে যত সূক্ষ্ম ভাগ কর সোনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। জল যৌগিক, ওকে ভাগ করলে দুটো মৌলিক গ্যাস বেরিয়ে পড়ে, একটার নাম অক্সিজেন আর একটার নাম হাইড্রোজেন। এই দুটি গ্যাস যখন স্বতন্ত্র থাকে তখন তাদের এক রকমের গুণ; আর যেই তারা মিশে হয় জল, তখনই তাদের আর চেনবার জো থাকে না, তাদের মিলনে সম্পূর্ণ নূতন স্বভাব উৎপন্ন হয়। যৌগিক পদার্থ মাত্রেই এই দশা। তারা আপনার মধ্যে আপন আদি পরিচয় গোপন করে।'' কেবল মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি মিশ্র পদার্থের স্বরূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানের সঠিক বিচারে। বললেন, ''বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশেল জিনিস। তাতে মিশেছে নানা গ্যাস কিন্তু মেলেনি, একত্রে আছে, এক হয় নি। বাতাসে যে পরিমাণ অক্সিজেন তার প্রায় চারগুণ আছে নাইট্রোজেন। কেবলমাত্র নাইট্রোজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবল মাত্র অক্সিজেনে আমাদের প্রাণবস্তু পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। এই প্রাণবস্তু কিছু পরিমাণ জ্বলে, আবার জ্বলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা দুই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।''

### জ্যোতির্বিজ্ঞান

এবার তাকানো যাক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের দিকে। এই বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার বিজ্ঞাননিষ্ঠ বর্ণনায় তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ সমৃদ্ধ। নক্ষত্রলোকের বর্ণনায় কবি বললেন, ''রাতের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের কতকগুলি সুদূর বিস্তৃত অতি হালকা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। এই নক্ষত্রপুঞ্জ নীহারিকায় যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভুত দ্রুত তাদের গতি। ....দূরবীনের ভিতর দিয়ে খুব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যান্ড্রোমিডা নামধারী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মত। সেই চাকা ঘুরছে। এক পাক ঘোরা শেষ করতে তার সময় লাগে প্রায় দু কোটি বছর। নয় লাখ বছর লাগে, এর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে।''

তাঁর 'সৌরজগৎ' সম্পর্কিত বিবরণ যেমন সরস তেমনই সরল। তিনি জানালেন, ''সূর্যের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরলরেখায় রাখলে সূর্যের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছাতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশি। তাই নিজের দিকে সে টান দিতে পারে সেই পরিমাণ ওজনের জোরে। সেই টানের জোরে সূর্য পৃথিবীকে আপন আয়ত্তে বেঁধে রাখে। কিন্তু দৌড়ের জোরে পৃথিবী আপন স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছে।''

সৌরজগৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিবরণের তথ্যভাণ্ডারও কোন অংশে নগণ্য নয়: ''সূর্যের সমস্তটাই গ্যাস (হিলিয়াম);.....সূর্যের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্য ভাগ গ্রহগুলিতে ঠেকে। অনেকখানিই চলে যায় শূন্যে, সেকেন্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে; কোন নক্ষত্রে পৌঁছায় চার বছরে, কোন নক্ষত্রে ন'লক্ষ বছরে।'' চাঁদের বিবরণও সেখানে বর্তমান: ''চাঁদ পৃথিবীর কাছের উপগ্রহ....পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই কম বলে একে এত উজ্জ্বল ও আয়তনে এত বড় দেখায়। আশিটা চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। ....চাঁদের বড়ো বড়ো গর্তের উৎপত্তি একদা-উৎসারিত অগ্নি-উৎস থেকেই। যে গলন্ত পদার্থ ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া-জল না থাকায় এত যুগ ধরেও তাদের কোনো বদল হতে পারেনি। ছাই ঢাকা আছে ব'লে সূর্যের আলো এই আবরণ ভেদ করে খুব বেশি নীচে যেতে পারে না, আর নীচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না। ....চাঁদের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ে তার উত্তাপ প্রায় ফুটন্ত জলের সমান, ...আর যেখানে আলো পড়ে না তা এত ঠাণ্ডা হয় যে বরফের শৈত্যের চেয়ে তা প্রায় ২৫০ ফারেনহাইট ডিগ্রি নীচে থাকে।''

রবীন্দ্রনাথের জ্যোতির্বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট আলোচনার বিস্ময়কর সংযোজন শুক্রগ্রহের প্রসঙ্গ। অধুনা জ্যোতির্বিদগণ যে ভাবছেন, 'এ মহাবিশ্বে মানুষ নিঃসঙ্গ নয়' — অর্থাৎ গ্রহান্তরেও জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব! এই আশার আলো অর্ধশতক পূর্বে রবীন্দ্রমানসেও অনুরণিত হয়েছিল: ''শুক্রের (শুক্রগ্রহের) ২২৫ দিন লাগে সূর্য ঘুরে আসতে....; শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন শুক্রগ্রহের যে উত্তাপ তাতে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই ওখানে জলাশয় ও মেঘ দুইয়ের অস্তিত্বই আশা করতে পারি....ক্রমশ জীবজন্তুর পালা হবে শুরু সেখানে।''

### জীব বিজ্ঞান

জীবনের সৃষ্টি ও ব্যাপ্তি নিয়েই জীববিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আজকের মানুষ, উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণী জৈব বিবর্তনের ধারাপথেই জটিল জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পৃথিবীর আদিতে প্রাণের চিহ্ন ছিল না — পৃথিবী সৃষ্টির সময় সেখানে ছিল কিছু অজৈব ও জৈব উপাদানের মেলা। সেই উপাদানের স্মরণীয় সন্নিবেশ ও সংঘর্ষ একদিন প্রাণের সূচনা ঘটিয়েছিল। নির্জীব থেকে সজীবতার অভিমুখে জীবনের অভিযান! তারপর

দীর্ঘসময় অভিব্যক্তির অব্যর্থ অভিযাত্রা উন্নত জীবকে এনে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। এই সত্য সামনে রেখে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, পৃথিবীতে জীবনের প্রথম প্রকাশ উদ্ভিদরূপেই — কারণ সে-ই কেবল নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে নিতে সক্ষম এবং জীবন চালনাকারী গ্যাস অক্সিজেন উৎপাদনের সে একক অধিকারী। রবীন্দ্রপ্রত্যয়ে সেই সত্যের বাণীমূর্তি লক্ষ্যের বিষয় : ''গাছের সবুজ পাতায় থাকে গোলাকার অণুপদার্থ, তাদের মধ্যে ক্লোরোফিল বলে একটি পদার্থ আছে — তারাই সূর্যের আলো জমা করে রাখে গাছের নানা বস্তুতে। গাছের শক্তিতেই তৈরী হচ্ছে ফলে-ফসলে আমাদের খাদ্য, আর গাছের ভালোতে গুঁড়ির কাঠ। ....গাছ আপন ক্লোরোফিলের যোগে এই অক্সিজেন আঙ্গরিকে (কার্বনডাইঅক্সাইড) ও জল মিশিয়ে ধানে গমে আমাদের জন্য যে খাবার বানিয়ে তোলে সেই খাদ্যের ভিতর দিয়ে সূর্যতাপের শক্তিকে আমরা প্রাণের কাজে লাগাতে পারি। এই শক্তিকে আকাশ থেকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, গাছের আছে।''

প্রাণীজগতের আদি প্রাণী অ্যামিবার কথা উল্লেখ করতে কবি ভুলে যাননি। তাকে প্রকাশ করলেন 'প্রাণের নীহারিকা' নাম দিয়ে। বললেন, ''পৃথিবীতে জীবলোকে প্রথম যা প্রকাশ পেল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম অপরিস্ফুট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গভাগহীন — তখনকার ঈষৎ-গরম সমুদ্রজলে ভেসে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজম্। যেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আয়েয়বাষ্পে, তেমনি বহুযুগ লাগল এর মধ্যে একটি একটি পিণ্ড জমতে। সেইগুলির এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অ্যামিবা; আকারে অতি ছোটো; অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। পঙ্কিল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের চোখ মুখ হাত পা নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিণ্ডের এক অংশ প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের কাজ করিয়ে নেয়।''

জীববিজ্ঞানের জৈব অভিব্যক্তির চিন্তা ও বাস্তুতন্ত্রের ধারণা রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি ছিল। জৈবঅভিব্যক্তিতে ডারউইন প্রবর্তিত 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) তত্ত্বে বলা হয়েছে জীব পারস্পরিক জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং সেই সংগ্রামে জন্মী প্রতিনিধিরাই 'যোগ্যতম' বলে চিহ্নিত। সেই 'Survival of fittest' প্রতিনিধিরাই পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য সহযোগে নবতর প্রজাতির জন্ম দেয়। এই তত্ত্ব জীববিজ্ঞানে স্বীকৃত। বাস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বলা হয় পৃথিবীতে জীবসমূহ পরস্পর খাদ্য-খাদক সম্পর্কের মাধ্যমে 'শক্তিস্রোত' (Energy Flow) রচনা করে — যা পৃথিবীতে জীবের বসবাসে ও জীবনধারণের ভিত্তি। এখানে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন অবান্তর।

বিসর্জন নাটকে রাজগুরু রঘুপতির মুখ দিয়ে জয়সিংহকে শিক্ষা দেওয়া কালে রবীন্দ্রনাথ যা শুনিয়েছেন তা বাস্তুতন্ত্রের 'শক্তিস্রোতে'রই কথা।

''কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষ কোটি প্রাণী
চির-আঁধি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা ?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধুলি
প্রতিবাদে চরণে দলিত শত কীট
তাহারা কি জীব নহে ? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে,
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমে,
মৃগসম, মুহূর্তে দাঁড়াতে নাহি পারে।''

## নৃবিজ্ঞান

রবীন্দ্রমানস নৃবিজ্ঞানের আঙিনায়ও পরিভ্রমণ করেছে। মানব সমাজের বিকাশে 'বংশগতি ও পরিবেশ' প্রভাবের কথা উচ্চারণ করেন সকল বিজ্ঞানীই নির্দ্বিধায়। বংশগতি যদিও কেন্দ্রীয় শর্ত তথাপি তার পরিবর্ধন ও পরিপোষণে পরিবেশের বিশাল ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গেই এসে যায় জিন ও সংকরায়নের কথা — যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট। জীব পরম্পরায় পরিবর্তিত জীবসৃজনে সংকর জীবের বিশেষ ভূমিকা সর্বত্রই স্বীকৃত। মানব সমাজে এই 'সংকর জীব' চেতনার প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-লেখনীতে খুব সুন্দরভাবে আলোচিত : ''নৃতত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকের মধ্যে এক একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই রূপ নাগ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্যদলকে বশ করিয়াছিলেন, তাহারাও যে এই রূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ....মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণ সংকর ও ধর্মসংকর



উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণীয় শক্তি বারংবার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁধাইতে চেষ্টা করিয়াছে। মনুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তিপূজা ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিক প্রয়াস কোনও দিবার নিরস্ত হয় নাই।''

## আধুনিকতা

রবীন্দ্রমানসে আধুনিকতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পাশ্চাত্য শিক্ষাচেতনায় পুষ্ট হয়ে দেশীয় সমাজ সংস্কৃতিকে যুক্তি ও বোধের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতেই তিনি বিরামহীন শ্রম নিয়োজিত রেখেছিলেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রবাহে। তাঁর চোখে আধুনিকতার উৎকৃষ্টতম মডেল বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর চরিত্রের শ্রদ্ধার্তপণের মাধ্যমে আধুনিকতার এক উৎকৃষ্ট পরিষ্কাঠামো তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যম— ''বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। ...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চির নবীনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব চেয়ে পূজনীয়।'' কবি এখানেও থামলেন না, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিবিধ উপকরণকে বরণ করে দেশীয় সমাজ যাতে বিশ্বের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে তার উদ্যোগেও তিনি ছিলেন সতত যত্নবান। তিনি বলেছেন, ''যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে, যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোন মতেই পেরে উঠবে না। ....এযুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলেই জিতব, তাহলেই বাঁচব।'' বুদ্ধিজীবীগণ রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার মধ্যে দেখতে পান আধুনিক সভ্যতাকে দৃষ্টি দিয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভবের কবির তীব্র ব্যাকুলতা। সুশীল জানা 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নবজাগরণ' প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'বিলাত যাত্রায় নোবেল প্রাইজ ছাড়াও কবির লাভ হল নতুন অভিজ্ঞতা। তাঁর 'কাঁচা চিত্ত' 'জাগাচিত্ত' পাশ্চাত্যের প্রাণ-চাঞ্চল্য থেকে যেমন নতুন জীবনরস সংগ্রহ করেছে — তেমনি তাঁর কথিত সেই Ideal ও Real-এর দ্বন্দ্বভূমি থেকে নতুনতর উপলব্ধি আরও গাঢ়তর গভীরতর হয়েছে, তাঁর সেই 'মিলনতত্ত্ব' আরও দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে।'

## সংস্কারমুক্ত চেতনা

ভারতীয় সমাজকাঠামোয় নানাবিধ সংকট দীর্ঘ দিনের। এ সংকট যেমন অতীতেও ছিল — আজও সে ধারা ভিন্নরূপে অব্যাহত। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক ভারত-সমাজকাঠামোর এ অন্ধকার অধ্যায়কে জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল তাদের বিচিত্র কূটকৌশলে। তারই ফলে ঐ সমাজব্যাধির আত্মপ্রকাশ ঘটছে বিচিত্র পথে। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদপ্রথা, ধর্মান্ধতা, অস্পৃশ্যতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপ্রাদেশিকতা এমন বহুবিধ কুসংস্কারের নাম করা যায় যাদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি আজ সুস্থ সমাজজীবনের অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবৎকালে এ সংকট দেখেছেন — তার বিরোধিতা করেছেন এবং তার মূলোৎপাটনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন।

উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পবিত্রতা-অপবিত্রতা এমন বহু ভেদনীতি স্বচক্ষে দেখেছেন। দেখেছেন শুচি ব্রাহ্মণ পরিচালিত দেবমন্দিরে তথাকথিত অশুচি শূদ্র প্রবেশাধিকার পায়নি। ব্যথিত চিত্তে কবি তাঁর ক্রোধ আরোপ করেছেন ঈশ্বরের বয়ানে :

''যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা।''

ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ; সেই কারণে ধর্মধ্বজীরা কুসংস্কারগুলো ধর্মাচরণ বলে চাপিয়ে দিয়েছে এদেশের হাজার হাজার ধর্মভীরু মানুষদের ওপর আর তার মাধ্যমেই নিজেদের শাসন ও শোষণকে বজায় রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন, ''দেখলুম- যে ঘোরতর বুদ্ধির অন্ধতা হিন্দুর আচারে হিন্দুদের পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে, সেই অন্ধতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার আর যোগাচ্ছে। এ কি মাটির গুণ? এই রোগে বিষে ভরা বর্বরতার হাওয়া এদেশে আর কত দিন চলবে?''

এদেশে হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর প্রভৃতি সম্প্রদায়কে অচ্ছুৎ ও অস্পৃশ্য করেই রেখেছিল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা। রবীন্দ্রনাথ এই মানবঘৃণার বিরুদ্ধে বার বার ফেটে পড়েছেন। একবার শ্রীনিকেতনে সাম্বৎসরিক উৎসবে অস্পৃশ্যতা বিরোধী সভায় বক্তাগণ 'অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজ সম্মত নয়' প্রসঙ্গে বক্তব্য উদ্ধৃত করলে পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ জানান— ''আমার লজ্জাবোধ হয় যে, মানুষ মানুষে ভালবাসবে এই সহজ কথাটি এত শাস্ত্র বচন ও তর্ক দিয়ে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশকে এখনও বলতে হয়। হাজার হাজার বৎসর ধরে এরা এদের পিছনে ফেলে রেখেছি, সব দেশকে অন্ধকারে মগ্ন করে রেখেছি, আমরা শিক্ষিতেরা।

আজ সময় এসেছে মিলবার। ভগবানের আকাশের দিকে চেয়ে পরস্পর পরস্পরকে বুকে তুলে নিতে হবে।''

শতযুগলাঞ্ছিত এই কুসংস্কারকে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বলতে চাননি। একে বলেছেন 'ধর্মতত্ত্ব'। তিনি বলেন, ''মনে রাখা দরকার ধর্ম আর ধর্মতত্ত্ব এক জিনিস নয়। এ যেন আগুন আর ছাই.... ধর্ম বলে, মানুষকে শ্রদ্ধা করার কথা আর ধর্মতত্ত্ব বলে নির্দয় অশ্রদ্ধার কথা....ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতত্ত্ব বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ যে যত বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। ....মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতত্ত্ব।''

### মুক্তমতি

উদারনৈতিক চেতনা বা মুক্তমতি মানসিকতা বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের বিশেষ লক্ষণ। এই মানসিকতা ব্যক্তিকে একদেশদর্শিতা বা ডগ্‌ম্যাটিজম্-এর প্রভাব থেকে রক্ষা করে বিশ্বের সমস্ত কিছুকে যাচাই করে দেখার ধৈর্য দেয়। আমাদের দেশে কি রাজনীতির ক্ষেত্রে কি ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তির এই ডগ্‌ম্যাটিজম্ সমাজমানসকে বিপন্ন করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখনী আমাদের যে কোনও রকম ডগ্‌ম্যাটিজমের ঊর্ধ্বে মুক্তমনা হওয়ার শিক্ষা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দিলীপ কুমার রায়ের এক সাক্ষাৎকারে বিজ্ঞানীদের ডগ্‌ম্যাটিজম্ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন: ''বিজ্ঞানীরাও এখন আর বলছেন না যে, কোন নিয়মই শেষ নিয়ম। এ বিষয়ে অন্য অন্য জিজ্ঞাসায় মানুষের ধারণাজগতে যে সব অদল বদল দেখা যায় বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় অদল বদল ঘটছে অন্ততঃ তার দশগুণ বেশি বেগে। সেদিন পড়লাম এক বৈজ্ঞানিক বলছেন যে সব law-ই man made law. হয়তো দু চারজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এখনো সেকেলেয়ানার মনোবৃত্তি প্রবল— কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনের মূল প্রবণতা যে dogmatismএর বিরুদ্ধে এবং উদার পরীক্ষা তথা জিজ্ঞাসুতার দিকে— একথা বোধ হয় জোর করেই বলা যায়।''

### সত্যান্বেষা

রবীন্দ্রনাথের সত্যানুন্ধান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প ও গানে এই সত্যের বিচিত্র প্রকাশ অনুরণিত হয়েছে। তাঁর কাছে সত্য গতি ও মুক্তির মূর্তিমান প্রকাশ রূপে প্রতিভাত। তিনি বলেছেন, ''সত্য বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশমান। তাই সত্য অস্থির।'' তাঁরই কথা— ''When we follow truth in its points which are near, we see truth moving. When we know truth as a whole, which is looking at it from a distance, it remains still.''

সত্যকে কৃত্রিম নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে, মননকে অভ্যাসের মোহ থেকে উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়েছিলেন জীবনের অভিমুখে। জীবনের দিকে তাকানোর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেই প্রতিভাত সত্যের বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যের অধিকার আয়ত্ত করার অর্থ সত্যের চলিষ্ণুতায় বিশ্বাস করা। এটা সম্ভব হয় ব্যক্তির আত্মিক চেতনায়। এই চেতনা বিভিন্ন দিক থেকে খণ্ডকে অতিক্রম করে যেতে পারে। অবশেষে জীবনের অখণ্ড চঞ্চল রূপপ্রবাহের সমগ্রতাকে ধারণ করা সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, ''যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে — নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি।''

### উপসংহার

রবীন্দ্রমননে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ পর্যালোচনায় আমরা লক্ষ করেছি বিজ্ঞানীগণ প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের সকল আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনে যেমন অনুশীলন করেছেন — ভাবী কালের জন্য তার পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে। রবীন্দ্রনাথ অবিসংবাদী কবি। তিনি সাহিত্যিক শিল্পী ঋষি সংগ্রামী যোদ্ধা যাই-ই বলি না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিজ্ঞান চেতনা ও বিজ্ঞান নিষ্ঠায় তিনি পুরোমাত্রায় সচেতন ও সজাগ! বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতি অঢেল তাঁর বৃহত্তর চেতনার একটি দিক। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রশান্ত মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার সখ্য বিশেষ তাৎপর্যবহ। ভাবরাজ্যে বিচরণ — যে কোন কবিরই সঙ্গত অভিব্যক্তি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানেও ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। মানবসমাজ হতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে নিরপেক্ষ তথাকথিত বিশুদ্ধ শিল্পীর মতো কোনও সৌখীন মজদুরিতে মশগুল থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এবং সেরকম না হওয়া এই বিশেষত্বের নেপথ্য কারণ তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। এই প্রত্যয়ই তাঁকে সমাজ, জীবন ও ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি। তিনি যেমন মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-সাফল্যের মধ্যে নিজেকে অন্তর্লীন রাখতে চেয়েছেন, তেমনই মানুষকে খণ্ডিত, বিকৃত ও বিনষ্ট রূপেও দেখতে চাননি। চেয়েছেন পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপেই দেখতে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য।

## সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

# সাহিত্যিক কিন্নর রায়ের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বয়সে তরুণ হলেও তাঁর ভাঁড়ারে যে কটি গ্রন্থ রয়েছে তাতে গ্রন্থকর্তা হিসাবে কিন্নর রায়কে আজ প্রবীণ বলা চলে। প্রত্যেক তরুণ লেখককেই প্রথম জীবনে তার লেখাগুলি নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকসমাজের কাছে নিয়ে আসতে এবং তার কিছু কাল পরে দুই মলাটের মধ্যে গ্রন্থিত করে পেশ করতে যে বিক্ষোভসংকুল পথ পাড়ি দিতে হয় কিন্নর রায় লেখক জীবনের সেই তিক্ত-মধুর পর্ব পার হয়ে এসেছেন। বাংলাভাষায় প্রকাশিত নানা জাতের পত্রে নিয়মিত তাঁর গল্প পড়তে পান পাঠকরা। এখন প্রত্যেক বছরে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত এবং কখনও বা নামজাদা প্রকাশকরা তাঁর বই বের করেন।

সম্ভবত কবি গল্পকার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দুটো জাত আছে — নাট্যকার বা প্রাবন্ধিকদের মধ্যেও এরকমটা দেখা যায়। এক জাতের লেখকরা নিয়ম করে লিখে যেতে পারেন। দিন মাস বছর ভর কিংবা বছরের পর বছর তাঁরা স্বচ্ছন্দে কিছু না কিছু লিখে চলেন। লেখাটা তাঁদের কাছে নেশার মতো। অনেক সময় লেখাটাই যেখানে জীবিকা, না লিখে তাঁদের গত্যন্তর নেই — সে লেখা কোনও প্রেরণা, খামখেয়ালিপনা, শিল্পীমনের মর্জির তোয়াক্কা করে না বললেই চলে। নিয়মের নিগড়ে বাঁধা হয়ে বাধ্যতাবশত এবং অভ্যাসবশে লিখে লিখে ক্রমশ এ জাতের লেখকরা তাঁদের গ্রন্থতালিকা বৃদ্ধি করে যান। এই বিপুল শ্রম, অধ্যবসায় এবং একঘেয়েমিজাত হাজার হাজার পৃষ্ঠার মধ্য থেকে লেখকের নশ্বর দেহ নষ্ট হবার পর কটি পৃষ্ঠা ভাবীকালের পাঠকের জন্য অম্লান ও সপ্রাণ হয়ে টিকে থাকবে এ নিয়ে ভাববার মতো বিন্দুমাত্র ফুরসতও এই জাতের লেখকরা পান কিনা সন্দেহ।

অন্য জাতের কবি লেখকরা হন ঠিক এর বিপরীত। তাঁরা যে বিশুদ্ধ প্রেরণাবাদী তা নন কিন্তু নিয়মিত লেখা তাঁদের আসে না। লেখাটা তাঁদের অভ্যাস নয়, ব্যাধ্যতা নয়। জীবিকা অর্জনের উপায় নয় বলেই যে তাঁরা স্বল্প পরিমাণে এবং বিরতি দিয়ে লেখেন তা বলা চলে না। লিখে নিয়মিত অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিলেও এই জাতের লেখকরা দিন মাস বছর ভর মগজ ও হাত সক্রিয় রাখতে পারবেন বলে বিশ্বাস হয় না। আসলে তাঁরা তাঁদের লেখা দিয়ে জীবনের ও সৃজনের গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করতে চান। যে সাহিত্যের স্রোত প্রবল বেগে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে বহমান সেই স্রোতে ভাসতে পারেন না এঁরা। এই লেখকদের এক একজন এক একটি অভিনব প্রস্রবণের মতো। মাটি ফুঁড়ে একটি নতুন জলধারা উচ্ছল হয়ে বেরিয়ে আসে। একটি ভাষার সাহিত্যে তা নতুন প্রাণবেগের এবং অনাস্বাদিতপূর্ব আলোড়নের সঞ্চার করে দেয়। কিন্নর রায়ের তিনটি উপন্যাস, একটি গল্পের এবং একটি রম্যরচনা জাতীয় বই এক সংগে পড়ার সুযোগ পেয়ে আমার মনে লেখকদের এই দুই জাতের কথা উদয় হল। একজন তরুণ লেখকের কয়েকটি গল্প উপন্যাস একাধিক্রমে পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমার মতো এক তরুণ মনোযোগী পাঠক কী পেলাম? একজন তরুণ লেখকের কাছ থেকে নতুন প্রজন্মের এক পাঠক কী আশা করে জানাতে পারলে বিষয়টা অনেক স্বচ্ছ হবে বলে মনে হয়।

তরুণ ঔপন্যাসিক নিশ্চয় এক নতুন ভাষায়, নতুন বিষয় বা বিষয়কে দেখার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাজির হবেন। তাঁর ভাষা ব্যবহার এবং বিষয়কে দেখার দৃষ্টিতে এমন কিছু থাকা চাই যা সেই তরুণ লেখকের পূর্ব যুগের জানা ছিল না। পাঠকের চিরাচরিত সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতায় তিনি নতুন কোনও বিস্ময়

নিয়ে আসবেন। মনে হবে এমন জিনিস তো আমি পড়িনি এতকাল। এমন ভাষায় এমনভাবে মানুষের কথা বলা যায়! মানুষের জীবনের এমন দিক নিয়ে যে গল্প হতে পারে তাও তো জানতাম না! গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক বলতে সাধারণত যা বোঝা হয় সেই মেনে নেওয়া ধারণাকে আঘাত করে, পাঠকের গতানুগতিক চাওয়ার মুখে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একজন লেখক যদি না তাঁর জন্য নতুন গোত্রের পাঠক তৈরি করে নিতে পারলেন তবে আর তিনি লিখতে এলেন কেন, এমন প্রশ্ন তো মনে জাগতেই পারে। প্রশ্ন মানে নতুন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কিন্নর রায়ের উপন্যাস তিনটি আগ্রহ সহকারে পড়তে শুরু করে আমার সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এই তিনটি উপন্যাসের নানা স্থলে ভাষা, চরিত্র চিত্রণ, পরিবেশ-পরিস্থিতি বর্ণনে চমৎকারিত্ব রয়েছে— বুঝতে অসুবিধা হয় না যে একজন সম্ভাবনাময় লেখক কলম ধরেছেন কিন্তু তিনি পুরো ব্যাপারটাকে একটা সংহত সমগ্র রূপ দিতে কোথায় যেন ব্যর্থ হয়েছেন। উপন্যাস মানে তো জীবন ও জগৎকে প্রকাশের এক মহৎ শিল্পরূপ — উপন্যাস মানে তো শুধু গল্প বলে যাওয়া বা কয়েকটা চরিত্র কী কী করে চলেছে, বলে চলেছে তাদের জীবনে কী কী ঘটনা ঘটছে কার সংগে দেখা হচ্ছে তার রিপোর্ট দিয়ে যাওয়া নয়। জোরদার একটা কাহিনীর বাঁধুনি তথা একটা নিটোল গল্প নির্মাণ করেই অধিকাংশ লেখক উপন্যাস রচনা করতে চান। গল্পটিকে আশ্রয় করে তাদের উপন্যাসের জগৎ গড়ে ওঠে। পাঠককে কাহিনীর বাঁধুনি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা না করে অন্যভাবে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন খুব অল্প ক'জন এবং এই পথে সাফল্যের অর্থাৎ গুণগ্রাহী বৃহৎ সংখ্যক পাঠকের সন্ধান পেয়েছেন নাম মাত্র কিছু লেখক— কি বাংলা ভাষায় কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে। কিন্নর রায় দ্বিতীয় পথের পথিক নন। উপন্যাসে তিনি গল্পই বলতে চান, গল্পের বাঁধুনি দিয়ে চরিত্র আঁকতে চান। বেশির ভাগ লেখকের চর্চিত পথেই তাঁর যাত্রা। তাঁর ভাষাটিও সহজ সরল বরং বলা চলে সাদামাটা। ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তৈরি ছোট ছোট পরিচ্ছেদ। স্বতন্ত্রতা প্রকাশের জন্য বা ভাষার মধ্যে দিয়ে লেখকের নিজস্বতা ঘোষণার আগ্রহে তিনি কোনও কারিকুরি দেখাতে যাননি। ভাষাকে নিয়ে খেলেননি। স্বল্পশিক্ষিত, সকলের পক্ষে গ্রহণীয় তাঁর ভাষা। স্বচ্ছন্দে পাতার পর পাতা পড়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সারা বইয়ে যেহেতু এই ভাষা একই রকম গতিতে বেগবান তাই মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগে — মনে হয় ভাষাটি কিছুটা ফ্ল্যাট। এতে কোন মোচড় নেই, ঢেউ নেই, পর্বত নেই। পাঠক-চিত্তকে উস্কে দেবার জন্য মাঝে মাঝে শিহরিত বা উদ্দীপিত করার জন্য, লেখকের ভাষায় যে বিদ্যুৎ থাকা দরকার — 'কাছেই নরক', 'আগুনের সিঁড়ি' বা 'নিরপেক্ষ'র লেখকের ভাষায় তার যেন অভাব রয়েছে।

> সুলালের গলায় স্মৃতি ভাঙছিল। বলাই তো এর পরেরটুকুও জানে। বহুবার শোনা তার। খুলনা থেকে বনগাঁ ট্রেনে এসেছিল সুলাল। টিকিট লাগে নি। স্টেশন মাস্টারমশাইই বলে দিলেন এই গাড়িটায় উঠে পড়ুন। টিকিট লাগবে না। (নিরপেক্ষ/৮৪ পৃষ্ঠা)

> ম্যাজিস্ট্রেট এসে বসল চেয়ারে। পেশকারবাবু এক এক করে ফাইল এগিয়ে দিতে লাগল ওর সামনে। এক একজন আসামীর নাম। তর্কবিতর্ক যুক্তির জাল। উকিলের তর্জনগর্জন। তারপর হয় জামিন, নয়তো নয়। আর কিছু থাক বা না থাক কায়দাটা ঠিকই আছে। (কাছেই নরক/পৃষ্ঠা ৮৮)

> আকবরের কিলার পাশ থেকে যমুনায় নৌকো ভাসিয়ে সঙ্গমে যাওয়া। দুপাশে শুধুই রঙ। লাল, হলুদ, বেগুনি। শাড়ি, সালোয়ার-কুর্তা। নদীর পাড়ে রঙিন উৎসব বুঝি। খগেশ এত সব দেখতে পায় না। সে জামা-কাপড় নৌকোতে ছাড়ে, তারপর কাঠের চৌকিতে নেমে আরও নিচে বুকজলে গিয়ে দাঁড়ায়। যমুনা পেছনে ফেলে এসেছে। এখানে গঙ্গা যমুনায় মিশেছে। সামনে গেরুয়া জল, স্থির। (আগুনের সিঁড়ি/পৃষ্ঠা ১০৫)

'কাছেই নরক' তিন বন্ধুর জেল বাসের দিনগুলির বর্ণনা। অভিজিৎ প্রাক্তন নকশাল কিন্তু সে তার দুই বন্ধু পরশুরাম আর অনিকেত সহ জেলবন্দী হয়ে রয়েছে কোনও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার জন্য নয়। স্থানীয় নেতাদের এক পক্ষের হয়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য বোমাবাজি করতে গিয়ে প্রতিপক্ষে থাকা তাদেরই বন্ধু রুদ্রাক্ষ মারা পড়ে এবং তারা তিনজন ধরা পড়ে যায়। সন্তোষদা তাদের জামিনের জন্য চেষ্টা করছে। অভিজিতের নকশাল জীবনের স্মৃতি এবং জেলের মধ্যেকার নানা অপরাধে বন্দী বিচিত্র চরিত্রের মানুষগুলির কথা রয়েছে এই উপন্যাসে। সত্তর দশকের প্রথমার্ধের একটা আভাস পাওয়া যায়। ওই যুগের বিপ্লবব্যর্থ, বিভ্রান্ত ও পরবর্তী সময়ে দিগভ্রষ্ট যৌবনের এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন ঔপন্যাসিক তাঁর প্রথম যৌবনের লেখা প্রথম উপন্যাসে। উপন্যাস লেখার কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ, হাত পাকাতে যাওয়া এই লেখায় তাই ছবিগুলি খাপছাড়া— একত্র সন্নিবেশিত ও সংলগ্ন হয়ে একটা সমগ্র চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন সংস্করণ প্রকাশের ভূমিকা থেকে দেখছি এই সংস্করণ প্রকাশের আগে তিনি আগের লেখাটির যথেষ্ট কাটাকাটি করেছেন, কয়েকটি অংশ নতুন লিখেছেন। তবুও বলতে হয় যেন কোথায় ফাঁক থেকে গিয়েছে — ঠিকমতো দানা বাধেনি। পূর্ণাঙ্গ একটি



চিত্ররূপ প্রকাশের বদলে স্কেচ হয়ে রয়েছে। অথচ কবিচরিত্রের একজন যুবার সমাজবিপ্লবে যোগ দিয়ে পরে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে জেনে স্থানীয় মস্তান রাজনীতির ক্রীড়নক বনে গিয়ে কিছুদিন জেল বাসের পর শেষ পর্যন্ত অসীমানন্দজী নামের এক সন্ন্যাসীর শরণ নেওয়ার ঘটনাধারার মধ্যে চমৎকার একটি উপন্যাসের সম্ভাবনা ছিল। লেখক যা এবং যেরকম ভাবে লিখেছেন তা না হয়ে একটু অন্যরকম হলে উপন্যাসটি কী দাঁড়াতে পারত—এরকম অনুমান করতে যাওয়া অসমীচীন জেনেও এ কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

১৯৭০-৭১ সময়কালের এলাহাদাবাদ শহরকে চিত্রিত করে রাখার প্রেরণায় 'আগুনের সিঁড়ি' লেখা। অনুমান করি এই প্রাচীন নামজাদা শহরে জীবনের কোন পর্বে বসবাসের ফলে লেখক শহরটিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই শহরটিকে তার আহির, চামার, পাশি, খটক, মুসলমান ও প্রবাসী বাঙালি বাসিন্দাদের জীবনধারা এবং ঋতু বদলের প্রেক্ষাপটে ধরে রাখতে চেয়েছেন। বাংলার বাইরের একটি শহরকে নিয়ে এই উপন্যাস আকর্ষণীয় হয়েছে। মূলচন্দ আহির, চুনিলাল, খগেশ, লালজি (কবি নীরজ), ডক্টর ব্যানার্জি, অনন্ত খারে, সরবতিয়া, হামিদা, গুড্ডি, সুরতিয়া—ইলাহাবাদী এই মানুষগুলির জীবননাট্যের খণ্ডখণ্ড দৃশ্য বিধৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজ নিজ দোষে গুণে আকাঙ্ক্ষায় হতাশায় সকলের মধ্যে মিশে থেকেও যেন বা স্বতন্ত্র মানুষ। এলাহাবাদের নানা অলিগলি মহল্লা গঞ্জ প্রান্তর লেখকের বর্ণনায় জীবন্ত। এলাহাদাবাদ মানেই তো গঙ্গা যমুনার সঙ্গম— হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে সহজ মেলামেশা। গঙ্গা ও যমুনা এবং দুই নদী তীরের বর্ণনা উপন্যাসে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। তেমনই রয়েছে সঙ্গমস্থলকে ঘিরে বৎসরভর নানা উৎসবের কথা। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম শহরের মানুষদের মনে ছায়া ফেলে গেছে— উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তৎকালীন সুপার হিট হিন্দি সিনেমাগুলির মনকাড়া গানের নানা কলি ছড়িয়ে থেকে যেন উপন্যাসটির আবহ সঙ্গীত রচনা করেছে।

উপন্যাসটির নামকরণ কেন 'আগুনের সিঁড়ি' হল ঠিক বুঝলাম না। বরং, একটা বিপজ্জনক বা ভয়ংকর কিছুর দ্যোতনাবাহী এমন নামকরণের চেয়ে কোমল-মনোরম কিছুর ব্যঞ্জনা মনে আনা নাম হলেই উপযুক্ত হত নাকি?

এক অন্ধ কেরোসিন তেলের ডিলার বলাই, তার দোকানে তেল নিতে আসা যাওয়া করা খদ্দের, ওই পাড়ার চায়ের দোকানে বসা লোকজন, বলাইয়ের ছেলে বাচ্চু, ভাই কানাই— এদের নিয়ে উপন্যাস 'নিরপেক্ষ'। লেখক চেয়েছেন অন্ধ কেরোসিনওয়ালার পরিপার্শ্বে যেভাবে ক্রমশ বিষাক্ত মৌলবাদ ঘনিয়ে উঠছে তার স্বরূপ চিত্রিত করতে। কিন্তু এই মূল বিষয়টার চারপাশে তিনি আরও এমন সব অসংলগ্ন চরিত্র ও বিষয়ের অবতারণা করেছেন যে মূল বিষয়টির গুরুত্ব ম্লান হয়ে পড়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কয়েকটা বড় সমস্যা চিন্তা উদ্রেককারী ব্যাপারকে তিনি একটা উপন্যাসে ধরতে গিয়ে ঠিক মতো সংগঠিত করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। যেমন বছর কয়েক যাবৎ পাড়ায় পাড়ায় ভিডিও দৌরাত্ম্য, ঘরে ঘরে কেবল্ টি ভি কালচার। বাচ্চু এই ব্যবসা ফেঁদে বসেছে — খদ্দের বাড়ানো, খদ্দেরদের নিত্য নতুন ছবি দেখানোর আগ্রহে উদ্বেগে সে অস্থির, এমনকি সে ঘুমিয়েও খদ্দেরদের সন্তুষ্ট করার বিষয়ে কথা বলে, স্বপ্ন দেখে। একদিকে ছেলে বাচ্চুর কেবল্ ব্যবসা আর অন্যদিকে ভাইপো সুদামের স্বয়ং সেবক সংঘের সক্রিয় সদস্য বনে গিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান। হিন্দু জাগরণের জন্য সে জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে একগাদা চরিত্র আর সমস্যা ধরতে গিয়ে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে বেশি বিবরণ দেবার ফলে উপন্যাসটি শিথিল হয়ে গিয়েছে। কোন্ কোন্ ব্যাপারে বেশি বিবরণ দিলে পাঠকের মনোযোগ নষ্ট হতে পারে এবং তাতে করে আসলে উপন্যাসটিই তার মূল লক্ষ্য থেকে সরে গিয়ে এলোমেলো হয়ে যায়— এই পরিমিতিবোধ অর্জন করা বেশ কঠিন কাজ সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক ধর্মোন্মত্ত এবং মৌলবাদ-কণ্টকিত ভারতের উদ্বেগজনক রূপ ফুটে উঠেছে 'ধর্মসংকট' নামের গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে। উপমহাদেশ, ভারতবর্ষ- ১৯৯০, আলি আসগর, জয়ন্তী এবং ধর্মসংকট গল্প চারটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ বইয়ের গল্পগুলি ৯০-৯২ সালে লেখা এবং প্রধান কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, যে সময়পর্বে হিন্দু মৌলবাদ তার সমস্ত দানবিক ও অমানবিক শক্তি নিয়ে এ দেশের বুকে ফেটে পড়েছিল। শুধুমাত্র মুসলমান নামের জন্য মানুষ কীভাবে আর ভারতবাসী বা ভারতীয় হিসাবে পরিগণিত হয় না — তাকে সংখ্যাগুরুরা সন্দেহের এবং হীন চোখে দেখে তার নির্মম চিত্র আঁকা রয়েছে উপমহাদেশ, ধর্মসংকট অথবা তারার আলোর নিচে গল্পে। বিগত কয়েক বছরে হিন্দু মৌলবাদের অভ্যুত্থান এবং বেপরোয়া হিংস্র প্রসারলাভের ফলে ভারতীয় শব্দটির দ্যোতনা কেমন সংকুচিত হয়ে গিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজসচেতন প্রত্যেক ভারতীয়ই তা মর্মে মর্মে জানেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কম বেশি এমন অভিজ্ঞতা আছে যেখানে, তারার আলোর নিচে গল্পের মতো বাড়িতে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ার সময় মুসলমানের উপস্থিতি আমরা এড়িয়ে চলতে চাই কিম্বা একজন যুবা যত যোগ্যই হোক যেহেতু সে মুসলমান তাই কোনও হিন্দু তরুণী সহপাঠী তাকে প্রেমিক বা পতি রূপে বরণ করতে পারে না বা মুসলমান সহকর্মীকে কখনও ঠারেঠোরে কখনও বা জোরালো গলাতেই শুনতে হয় ধর্মের দম্ভ। আমাদের

প্রায় প্রতিদিনকার কদর্য অভিজ্ঞতাগুলিকে, ধর্মের নামে ধর্মের ছলে মানুষকে পীড়ন করার ঘটনাগুলিকে গল্পের রূপে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন কিন্নর রায়। ভারতবর্ষ ১৯৯০—বলগর্বী ধর্মের হিংস্র রূপ প্রকাশের এক মর্মান্তিক উপাখ্যান। এই গল্পটিতে লেখকের পারদর্শিতা সংহত হয়ে দেখা দিয়েছে।

বহুকালের নামকরা একটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার করুণ পরিণতিতে সংস্থার এক কর্মচারীর সেই প্রতিষ্ঠানের অট্টালিকায় আত্মহত্যা এবং ফলে বাকি সহকর্মিদের ভিতরে আতংকের সঞ্চার—এ বইয়ের মনে রাখার মতো একটি গল্প লঘিষ্ঠ, সাধারণ। ধর্মসংকট বইয়ের গল্পগুলি নিজস্ব গুরুত্বে এমন উজ্জ্বল যে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি বাহুল্য মনে হয়। বইটি পাঠকসমাজে আদরণীয় এবং বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আশা করি।

লুপ্ত জীবিকা নামকরণ থেকেই ছোটমাপের বইটির বিষয় আঁচ করা যায়। যে সমস্ত জীবিকা ইতিমধ্যেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বা হারিয়ে যাবার পথে যেমন পুকুরের ডুবুরি, নাপতিনী, সাজো-ধোপা, কুয়োর ঘটি তোলা, বহুরূপী, দাইমা, টোলের পণ্ডিত— তাদের বিষয়ে অল্প কথায় আলোচনা। সংবাদপত্রে ফিচার লিখতে গিয়ে এই চমৎকার লেখাগুলির জন্ম। পড়তে ভাল লাগে এবং পাঠকের স্মৃতিকে উস্কে দেয়। একটি সংবাদপত্রের সাহিত্য পাতার কর্মীদের অনুরোধে ও উৎসাহে ভিন্নস্বাদের এমন লেখাগুলি পাওয়া গেছে। সেই টুকরো লেখাগুলিকে বই আকারে পাঠকসমাজে পেশ করার জন্য প্রতিক্ষণ পাবলিশার্সকে ধন্যবাদ— তা না হলে নিশ্চয় এগুলো খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় চাপা পড়ে হলুদ হয়ে কোথায় হারিয়ে যেত। বইটি সাধারণ পাঠক রসবোধের দিক দিয়ে পড়ে আনন্দ পেলেও, সমাজ বিজ্ঞানীরাও এ বই থেকে তাদের চিন্তার খোরাক পাবেন।

সব শেষে সবিনয়ে একটা প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এ আলোচনার ইতি টানতে চাই। নিরপেক্ষ উপন্যাসটির পেছনের মলাটে লেখকের সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে দুটি কথার সঠিক অর্থ আমি উদ্ধার করতে পারিনি। বলা আছে — ''তাঁর 'প্রকৃতি পাঠ' উপন্যাস লেখা হয়েছিল পরিবেশ দূষণকে সামনে রেখে।'' একথার মানে কী? কোনও বিষয়কে সামনে রেখে যেমন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রচনা লিখতে হয় বা লেখা হয় তেমনি করে কি উপন্যাসও লেখা যায় বা লেখানো হয়? প্রবন্ধ বা রচনা লেখার মতো করে কি উপন্যাস লেখা সমীচীন, যে আচ্ছা, এবার অরণ্য রক্ষা বা ড্রাগের কুফল বা মৌলবাদের প্রসারকে সামনে রেখে উপন্যাস লেখা যাক!

মলাটের দ্বিতীয় কথাটি হল একটা ঘোষণা — ''কোনো বাঁধা চাকরি না করে শুধু লিখে, ভালো লিখে বাঁচার ব্রত নিয়ে এই লেখক সংবাদপত্রের চারটি বড় চাকরি প্রত্যাখ্যাত করেছেন।'' প্রথম কথা, সংবাদপত্রের চাকরি নেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা কি একজন লেখকের কোন বিশেষ যোগ্যতার মধ্যে পড়ে? একজন লেখক তো সমাজের আর পাঁচটা লোকের মতোই সামাজিক জীব — তাঁকেও নিজের এবং সংসারের ভরণপোষণ করতে হয়, নানা জাতের রুজিরোজগারে ব্যস্ত থাকতে হয়। সংবাদপত্রের চাকরির সংগে যেহেতু ভাষার ব্যাপারটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে তাই সাম্প্রতিককালে অনেক লেখক সংবাদপত্রের চাকরি পছন্দ করেছেন। তাতে তাঁদের বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার বিঘ্ন ঘটেছে বা ঘটতে পারে এমন আশংকা করেন অনেকে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনও ধরনের ও পদের চাকরিই লেখকের ক্ষতি করতে পারে, তাঁর প্রতিভার ক্ষয় ও অপচয় ঘটাতে পারে—এ ক্ষেত্রে শুধু সংবাদপত্রের চাকরিকে আলাদা চিহ্নিত করে দেখা বাতুলতা।

'শুধু লিখে, ভালো লিখে বাঁচার ব্রত' উচ্চারণ করতে ও শুনতে যতই মনোরম লাগুক, কথাটি কিন্তু জটিল এবং মোটেই নিরীহ নয়। শুধু লিখে বাঁচতে গেলে, শুধু লেখার থেকে উপার্জন করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হলে কি সর্বদা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভাল লেখা যায়? শুধু লেখার শ্রমে বাঁচার উদ্যোগ নিলে তো এ বাংলায় বছর বছর এক বা একাধিক উপন্যাস লিখতে হয়, প্রতি বছর বিক্রি হবার উপযোগী উপন্যাসের বই বের করতে হয়, আরও হাবিজাবি কত কী-ই না লিখতে হয়, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হাতকে ক্লান্ত হতে না দিয়ে লিখেই যেতে হয় — এমন নজির তো আমাদের চারপাশে রয়েছে। কাজেই শুধু লিখে বাঁচার সংকল্প নিয়ে ভাল লেখা, নিজের মতো লেখা কতদূর সম্ভব এ বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। দুটোকে মেলানো বড়ই দুষ্কর।

[লেখাটি কিন্নর রায় লিখিত কাছেই নরক, আগুনের সিঁড়ি, নিরপেক্ষ, ধর্মসংকট, লুপ্ত জীবিকা গ্রন্থগুলির ওপর ভিত্তি করে রচিত।]

## সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

# বাংলার কারিগরি শিল্পের অবক্ষয়ের একটি অধ্যায়

## দুটি গ্রামের কারিগরদের কথা

অচিন্ত্য কুমার দত্ত

বর্ধমানের কাঞ্চননগর ও বনপাশ দুটির নাম অনেকের হয়ত জানা আছে। বর্ধমান জেলার কারিগরি শিল্প কেন্দ্র হিসাবে এরা একসময় প্রসিদ্ধ ছিল। বিদ্যালয়ে ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকেও আমরা অনেকে কাঞ্চননগর কোথায় ও কিজন্য বিখ্যাত এ সম্বন্ধে পড়েছি। কাঞ্চননগর প্রসিদ্ধ ছিল ছুরি-কাঁচি শিল্পের জন্য। এ সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে কাঞ্চননগর সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেওয়া বোধহয় সমীচীন হবে।

বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে দামোদর ও বাঁকা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কাঞ্চননগরের ভৌগোলিক অবস্থান। উত্তরদিকে কাঞ্চননগরের গা ঘেঁষেই প্রবাহিত বিখ্যাত ইডেন ক্যানেল (বর্তমানে দামোদর ক্যানেল)। বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে এর দূরত্ব পাঁচ মাইল। বর্ধমান জেলার বাণিজ্যের একটি অন্যতম কেন্দ্র ছিল কাঞ্চননগর। ''কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল''।[১] এক সময় এ শহরতলি ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এর ইমারতির ধ্বংসাবশেষ, প্রশস্ত রাস্তা, বারদ্বারী রাজতোরণ, প্রাচীন টেরাকোটার মন্দির প্রভৃতি কাঞ্চননগরের ভূতপূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। প্রকৃতির শুভেচ্ছায় কাঞ্চননগরের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বাণিজ্যোপযোগী। উপকণ্ঠস্থ দামোদর নদে তখন বাণিজ্যের পণ্যবহনকারী বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত এবং উভয়দিকে কাঞ্চননগরের সঙ্গে দূরবর্তী স্থানের বাণিজ্যিক লেনদেন চলত।[২] কাঠ, লবণ, গুড়, তেল, ইত্যাদি পণ্যকে কেন্দ্র করে চলত সে বাণিজ্য। কাঞ্চননগরের বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বলাই দেবশর্মা তাঁর বর্ধমানের ইতিহাস নামক গ্রন্থে বলেছেন ''কাঞ্চননগরের বণিক ধুস দত্তর পিতৃশ্রাদ্ধে য়ুরোপ হইতে নিমন্ত্রিত বহু বণিক দামোদরের জল প্রবাহ বাহিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় এত অধিক অর্ণবপোত কাঞ্চননগরের নিকট সমবেত হইয়াছিল যে পারাপারের পথ ছিল না। নৌযানের উপর দিয়া লোকে দামোদর পার হয়েছিল।'' সে সময় অর্থাৎ তের শতকে কাঞ্চননগরে অগ্রিফুলী বস্ত্র তৈরি হত। তখনকার দিনে এই বস্ত্র উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ বলে বিবেচিত হত। ইওরোপের বণিকরা কাঞ্চননগরের এই বস্ত্র কিনে ইওরোপে বাণিজ্য করত।[৩] কিন্তু তিনি তাঁর বর্ণনার কোন গবেষণামূলক প্রমাণ দেখাননি। তবে কাঞ্চননগর যে উৎকৃষ্ট বাণিজ্যের স্থান ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাঞ্চননগরের কয়েকটি মহল্লার নাম থেকেও এর পরিচয় পাওয়া যায়— যেমন, তেলিপাড়া, লবণগোলা, গুড়ে হাটা, পাথরমহল, ইত্যাদি। তাছাড়া কাঞ্চননগরের কয়েকজন প্রভাবশালী বণিকেরও পরিচয় পাওয়া যায়— যেমন, কালী দে, কালী দত্ত, রাজকৃষ্ণ দত্ত, বৈদ্যনাথ দত্ত, ইত্যাদি। বর্ধমানের বাণিজ্যমহলে তাঁদের যথেষ্ট নামডাক ছিল।

বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সঙ্গে কাঞ্চননগরের শিল্পের ঐতিহ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এক সময় (নির্দিষ্ট সময় জানা যায় না) এখানেই গড়ে ওঠে পিতল-কাঁসা শিল্প।[৪] এখানকার তৈজস বাংলাদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হত। এখানেই তৈরি হত বাংলাদেশের বিখ্যাত কাঞ্চন থালা। এখনও কাঞ্চননগরে দুয়েকটা পরিবারে এ থালা দেখতে পাওয়া যায়। কাঞ্চননগরের পুরোন বাসিন্দা গোবিন্দলাল দাসের সাক্ষাৎকার নেবার সময় জানা গেল যে আনুমানিক দেড়শো বছর আগেও এখানে তাদের পিতল-কাঁসার ব্যবসা ছিল।[৫] সে সময় প্রায় প্রত্যেক পরিবারে পিতল-কাঁসার বাসনের চল ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে (যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ইত্যাদি) এগুলো উপহার দেবার রীতিও ছিল। ফলে এগুলোর চাহিদা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মহামারীর প্রকোপ কাঞ্চননগরের বাণিজ্য ও শিল্পসমৃদ্ধিকে পঙ্গু করে দেয়।[৬] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই এ শহরতলি ক্রমশ

ম্যালেরিয়ার কবলে পড়তে থাকে। ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বর্ধমানে ম্যালেরিয়ার (Burdwan Fever নামে বহুল পরিচিত) কালগ্রাসে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। অনেকে আতঙ্কে দেশত্যাগী হয়।

কিন্তু ম্যালেরিয়া কাঞ্চননগরের শিল্প পরম্পরাকে সমূলে ধ্বংস করতে পারেনি। বিগত শতকের শেষ দিকে অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পর থেকে কাঞ্চননগরে আর এক শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় — ছুরি কাঁচি শিল্প।[৭] ঠিক কোন সময় থেকে এর সূচনা হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে শিল্প কেন্দ্র হিসাবে কাঞ্চননগরের ঐতিহ্য যে অনেক প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি শিল্পের প্রধান ধারক ও বাহক ছিল কর্মকার সম্প্রদায়। তবে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যাঁর কারিগরি কৌলিন্যে এ শিল্পের সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাম প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী। অনেকের কাছে তাঁর কথা অজানা হলেও কাঞ্চননগরের প্রায় সকলেই তাঁর নাম আজও স্মরণ করে। কাঞ্চননগরের প্রবেশ পথের সম্মুখে প্রেমচাঁদ মিস্ত্রীর জীর্ণ কুটির ও কারখানার দিকে আঙুল তুলে লোকে এখনও তাঁর নাম উচ্চারণ করে। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকের শেষ দিকে লন্ডন থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকাও সেদিনের প্রেমচাঁদ মিস্ত্রীকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ঐ পত্রিকার সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করছি: "Of late, one Premchand Mistri of Kanchannagar has succeeded in turning out good knives and other articles, which he occasionally supplies to the Government Stationery office".[৮]

প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী নিজেই ছিলেন নিজের শিক্ষক।[৯] কারও কাছে কারিগরি শিক্ষা লাভ না করেই তিনি কাঞ্চননগরে ছুরি-কাঁচি তৈরির একটি কারখানা চালু করেন। ছুরি-কাঁচি শান দেওয়া ও পালিশ করার জন্য তিনি স্বয়ং একাধিক হাতে চালানো বিশেষ ধরনের লেদ মেশিন তৈরি করেন। শুধু তাই নয়, সেগুলি চালানোর জন্য তাঁর কারখানায় একটি সঞ্চালক তেলের ইঞ্জিনও ছিল। বিদ্যুৎ তখন কাঞ্চননগরের শিল্পে প্রবেশ করেনি। কিন্তু বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রশক্তি ছাড়াই প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী'র কারিগরি প্রতিভার পরিচয় ভারতে, এমন কি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। দুয়েকজন ইংরেজ আধিকারিক (যেমন E. W. Collin) কাঞ্চননগরে তাঁর কারখানা পরিদর্শন করতেও এসেছিলেন।

কাঞ্চননগরে ছুরি-কাঁচি তৈরির মুখ্য প্রতিষ্ঠান ছিল প্রেমচাঁদ মিস্ত্রীর কারখানা। তাঁর কারখানায় তৈরি ছুরি ও কাঁচি শুধু স্থানীয় বাজারে নয়, বাংলা ও বোম্বাই এর সরকারি দপ্তরেও সরবরাহ হত।[১০] এমন কি শল্য চিকিৎসার জন্য উন্নত মানের ছুরিও তিনি তৈরি করতেন। কাঞ্চননগরে এক কারিগর, তারাপদ দে-র কাছে জানা গেল যে বর্ধমানের একজন শল্য চিকিৎসককে তিনি এমন একটি চমৎকার ছুরি উপহার দিয়েছিলেন যে ঐ চিকিৎসক তাঁর কারিগরি নিপুণতায় মুগ্ধ হয়ে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে (সম্ভবত ১৮৮৯ সালে) প্রেমচাঁদ মিস্ত্রীর হাতে তৈরি ছুরি ও কাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকার প্রেমচাঁদ মিস্ত্রীর শিল্প-নৈপুণ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে মানপত্র ও পদক দিয়েছিলেন।[১১] প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী এমন উন্নত মানের ছুরি-কাঁচি তৈরি করতেন যে সেগুলি শেফিল্ড এবং বার্মিংহামে তৈরি ঐ সব জিনিষের সমগোত্রীয় বলে পরিগণিত হত। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে তাঁর কারখানায় তৈরি ছুরির দাম বার্মিংহামের ছুরির চেয়ে সস্তা ছিল।[১২]

বাস্তবিক প্রেমচাঁদ মিস্ত্রীর সময় থেকে কাঞ্চননগরে ছুরি-কাঁচি শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর পরও বেশ কিছুদিন (আনুমানিক ১৯৩০ সাল পর্যন্ত) এই শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। তাঁর কারখানায় প্রশিক্ষণ পাওয়া কারিগরেরা এখানে নতুন কারখানা গড়ে তুলে এই ধারা বজায় রাখেন। এরকম একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল পপুলার ইঞ্জিনিয়ারিং।[১৩] প্রেমচাঁদ মিস্ত্রীর পরবর্তীকালে যে সমস্ত কারিগর কাঞ্চননগরের শিল্পের খ্যাতি ও ঐতিহ্য ধরে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গৌরচাঁদ মিস্ত্রী, রাখাল মিস্ত্রী, গদাধর মিস্ত্রী (প্রেমচাঁদের পুত্র), মৃগেন্দ্রনাথ দে, পি.সি. দে, ইত্যাদি।[১৪] এই সমস্ত দক্ষ কারিগরদের আমলে কাঞ্চননগরে ছুরি-কাঁচির মান ও বৈচিত্র্য দুই-ই বজায় ছিল। বেশ কয়েক রকমের ছুরি এখানে তৈরি হত — যেমন, পেন নাইফ, ডেস্ক নাইফ, পকেট নাইফ, গার্ডেন নাইফ, ইত্যাদি; দু-ফলা, চার ফলা, ছোট, বড় মিলিয়ে অনেক রকম। সেই সঙ্গে কাঁচি ও ক্ষুরও তৈরি হত।[১৫] এমন কি অর্ডার দিলে শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতিও বানিয়ে দেওয়া হত। স্থানীয় বাজারে কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচির যথেষ্ট চাহিদা ছিল, কারণ দৈনন্দিন জীবনে এগুলি প্রায় প্রত্যেক পরিবারে প্রয়োজনীয় পণ্য হিসাবে বিবেচিত হত। বর্ধমান শহরের খোসবাগানে বর্মন এন্ড কোম্পানি ছিল কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি বিক্রির এজেন্ট[১৬]। কলকাতা এবং অন্যান্য মফঃস্বল বাজারেও এগুলির চাহিদা ও কদর ছিল। কলকাতায় ক্যানিং স্ট্রিটে সরসিজানন্দ এন্ড সন্স এবং মুনুলাল শাহ'র প্রতিষ্ঠানে এ সমস্ত দ্রব্য বিক্রি হত।[১৭] শুধু তাই নয়, বোম্বাই-এর একজন ব্যবসায়ী, কে. এন. আজানী কাঞ্চননগর থেকে ছুরি কিনে বোম্বাই-এ বিক্রি করতেন।[১৮]

কাঞ্চননগরে ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর সবই তৈরি হত কারিগরদের দক্ষ হাতে, ছুরির পাত তৈরি থেকে পালিশ পর্যন্ত। একটা ছুরি অথবা কাঁচি সম্পূর্ণ হত নয়জন কারিগরের হাত ঘুরে (কারণ এক একজন কারিগর আলাদা আলাদা অংশ তৈরি



করত)। একমাত্র শান দেওয়ার যন্ত্র ছাড়া অন্য যন্ত্রপাতি বিশেষ কিছু ছিল না বললেই হয় এবং সেটিও ছিল হাতে চালাবার। এইভাবে কোনরকম উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই কাঞ্চননগরের কর্মকার কারিগররা এখানে এই শিল্পের জন্ম দেয় এবং ভারতের বুকে বর্ধমানকে সুপরিচিত করে তোলে।

শিল্প ও বাণিজ্যই ছিল কাঞ্চননগরের অর্থনীতির ভিত্তি। এ দুইয়ের উপর নির্ভর করেই এখানকার মানুষ জীবন ধারণ করত। চাষের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না বললেই নয়। এখানে চাষযোগ্য অর্থাৎ ধান চাষের উপযুক্ত জমিও বিশেষ ছিল না। কাঞ্চননগরে ছুরি-কাঁচি শিল্পের এতই প্রসার ছিল যে এখানকার প্রায় সমস্ত কর্মকার পরিবার এর উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত। এতে নিযুক্ত কারিগররা যে রোজগার করত তা দিয়ে তাদের খাওয়া পরার অভাব হত না। আবার অনেকে ছুরি-কাঁচির কারবারে আর্থিক সমৃদ্ধিও অর্জন করেছিল। এ শিল্প এতই সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় ছিল যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন ও পত্রিকায় তা প্রশংসিত হয়েছে। বর্ধমান জেলার কুটির শিল্পগুলির মধ্যে এটি অন্যতম উৎকৃষ্ট শিল্প বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং কাঞ্চননগর বাংলার শেফিল্ড বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার (১৯২৯-৩০ সাল) সময় থেকে। এর পর থেকে কাঞ্চননগরের শিল্পের অগ্রগতি বিভিন্ন কারণে শিথিল হয়ে পড়ে। জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, একদিকে বিদেশি ছুরি-কাঁচির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অন্যদিকে কাঞ্চননগরের ছাপ দেওয়া নকল ছুরি-কাঁচির ব্যাপক প্রচলনের ফলে এখানকার শিল্প অবনতির দিকে যেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। ফলে কারিগরদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে ওঠে।[১৯] তারা অনেকেই এই শিল্প ছেড়ে দিয়ে জীবনধারণের জন্য অন্যান্য কাজে যোগ দেয়; আবার অনেকে একে অন্যতম বৃত্তি হিসাবে ধরে রাখে। এই পরিস্থিতিতে তারা তাদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনও রকম আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য পায়নি। সরকারি তরফে এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে তাদের উৎপাদন পদ্ধতি অপরিবর্তিত থেকে যায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়ে। তথাকথিত প্রভাবশালী জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীরা এ জেলার সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর স্তম্ভ বলে বিবেচিত হলেও এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কোন চেষ্টা করেননি। খাজনা আর পণ্য শস্যেই তাঁরা ছিলেন অধিক উৎসাহী। শিল্পের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ নেননি। এমনকি বর্ধমানের মহারাজাও এ ঐতিহ্যকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা করেননি (তবে যোগ্য কারিগরদের তিনি পুরস্কৃত করতেন)। এভাবে কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি শিল্প অবহেলিত হয়েছিল বলা যায়। তাই এটি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়।

দেখতে দেখতে দেশ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হল। কাঞ্চননগরের এই শিল্প তখনও টিমটিম করছিল। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি তরফে এটিকে পুনর্জীবিত করার কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। কাঞ্চননগরের কথা উঠলে লোকে তেমন গুরুত্ব দিত না। কারিগরদের অবস্থা তখন ছন্নছাড়া। এভাবে প্রায় সাত বছর কেটে গেল। অবশেষে নিকুঞ্জ বিহারী সিংহ মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও উদ্যমে কাঞ্চননগরের বিলীয়মান দু-চারটি কারখানা, যন্ত্রপাতি ও কারিগরদের একত্র করে গড়ে উঠল সমবায় সমিতি।[২০] উদ্দেশ্য কাঞ্চননগরের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা। ১৯৫৪ সালের শুরুতে ১৫ জন সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি নথিভুক্ত করা হল। সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেল এবং আবার ছুরি-কাঁচির উৎপাদন শুরু হল। অনেক বাধার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও সমবায় কারখানার ক্রমবিকাশ ঘটল; কারিগরদের সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। ১৯৬৩-৬৪ সালে সমবায়ের কারিগরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০-৭৫ জন এবং বছরে প্রায় ৫০-৬০ হাজার টাকার ছুরি-কাঁচি এ সময় প্রস্তুত হয়।[২১] যে সমস্ত কারিগর বেকারে পরিণত হয়েছিল বা অন্যান্য কাজ করে কোনরকমে বেঁচে ছিল, সমবায় সমিতি আবার তাদের পৈতৃক কাজে ফিরিয়ে আনল। কলকাতার বাজারে আবার কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচির চাহিদা বাড়ল। কলকাতার ব্যবসায়ীরা কাঞ্চননগরের সমবায় সমিতির কাছ থেকে ছুরি-কাঁচি কিনতে বেশি আগ্রহ দেখাল।[২২] এভাবে কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি শিল্পের পুনর্জন্ম হল বলা যায়। কিন্তু এই পুনর্জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অল্প দিনের মধ্যেই দ্রব্যমূল্য বিশেষত কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, বাজারে বিদেশি কারিগরির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সমবায় সমিতির কর্ণধারদের গাফিলতি, ইত্যাদি কারণে কাঞ্চননগরের কর্মচাঞ্চল্য উল্কার মতো হারিয়ে গেল। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর এই শিল্পের মানোন্নতির জন্য কাঞ্চননগরে একটি সেন্ট্রাল কাটলারি সার্ভিসিং স্টেশন বা সহায়ক সমিতি গড়ে তোলার প্রস্তাব করছিল;[২৩] কিন্তু তা রূপায়িত হয়নি। এখনও কাঞ্চননগরের দু-চারজন কারিগর— অধীর কুমার দে, সাধন কর্মকার, ভবতারণ মালিক, ধনঞ্জয় মালিক— তাদের পরিবারগত পরম্পরা রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু তা নামমাত্র। কাঞ্চননগরের অতীত গৌরব এখন নিছক গল্প।

কাঞ্চননগরের তথা বর্ধমানের মানুষ এই দেশীয় শিল্পের পুনর্বাসনের স্বপ্ন আর দেখে না। নামকরা দৈনিক পত্রিকাতে মাঝে মধ্যে কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি শিল্পসংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখা গেলেও তাদের মনে আর কোন আশার আলো জাগে না। সরকারও এ ব্যাপারে উদাসীন। এ শিল্পের অবক্ষয়ের পর বিশেষত সমবায় সমিতির ব্যর্থতার পর কারিগরেরা অন্য

জীবিকায় জড়িয়ে পড়ে। অনেকে ছোটখাট ব্যবসার পথেও পা বাড়ায়। তবে কারিগরি কর্মের ধারা আজও একেবারে লুপ্ত হয়নি, কামারের হাতুড়ির আওয়াজ এখনও শোনা যায়।

এবার আসি বনপাশের কথায়। বর্ধমান শহর থেকে আট মাইল উত্তরে অবস্থিত সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বনপাশও কাঞ্চননগরের মতো বর্ধমানের এক অন্যতম কারিগরি শিল্প কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। গ্রামের নাম বনপাশ হলেও কামারপাড়া ঐ নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কামারপাড়ার কারিগরি কৌলিন্যের জন্যই বনপাশ গ্রামের পরিচিতি। তাই লোকমুখে বনপাশ-কামারপাড়া নামেই গ্রামটি পরিচিত। একসময় বাংলার বাইরেও এ গ্রামের যথেষ্ট নামডাক ছিল। এই গ্রামের নামানুসারেই খানা-সাঁইথিয়া লুপ লাইনে প্রতিষ্ঠিত হয় বনপাশ রেল স্টেশন। এখান থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ন' কিলোমিটার দূরে বনপাশ গ্রাম। ট্রেনের চেয়ে এখানে বাসে যাতায়াত করা অনেক সহজ। গ্রাম হলেও ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট বেশ উন্নত। এমনকি বর্ষাকালেও এ গ্রামের রাস্তায় কাদা প্রায় থাকে না বললেই হয়। গ্রামের এখানে সেখানে টেরাকোটার নকশা করা ভাঙ্গা দেউলের ছড়াছড়ি। এ গ্রামে হাটের প্রচলন নেই। আছে শহরের মতো দৈনিক বাজার যেটা প্রায় একশো বছর ধরে টিকে রয়েছে।[৭] নাম থেকেই বোঝা যায় এটি কামারদের গ্রাম। এক সময় এখানে প্রায় ছ'শো কর্মকার পরিবার বাস করত এবং কর্মকারদের দক্ষতার জন্যই বনপাশ-কামারপাড়া ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।[৮]

বাংলায় নবাবী আমল থেকে অর্থাৎ আঠারো শতক থেকে বনপাশ-কামারপাড়ার কারিগরি শিল্প এবং কর্মকারদের কারিগরি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময় লোহার অস্ত্রশস্ত্র তৈরির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বনপাশ কামারপাড়ার পরিচিতি পাওয়া যায়। সরকারি ও বেসরকারি নথিপত্রেও এর উল্লেখ আছে।[৯] এ প্রসঙ্গে নিচের প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় :— "From time immemorial, iron elements and weapon are being manufactured and used in this province and some of the Bengal village smiths namely Janardan Karmakar of Jahangirnagar (Dacca) and other of Kamarpara (Burdwan) became famous in history for their super-excellence in the manufacture of guns and swords of historic fame. These smiths were highly patronised by the Hindu and Musilm Courts of Bengal and traces of their fine workmanship may yet be found in the ancient houses of the Rajahs and Nawabs of Bengal."[১১]

কামারপাড়ার অস্ত্র গড়ার কারিগরদের এবং তাদের তৈরি লোহার অস্ত্রের খ্যাতিকে কেন্দ্র করে একটা কিংবদন্তী আছে :— আঠারো শতকের শুরুতে কামারপাড়ার এক কারিগর বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ রায়ের কাছে একটা তরবারি বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে। কর্মকারের ঐ অস্ত্রের দাম শুনে রাজা বিদ্রূপ করে তাকে ফিরিয়ে দেন। রাজপ্রাসাদ থেকে বের হওয়ার পর ঐ কর্মকার ক্ষোভেও ক্রোধের বশে রাজপ্রাসাদের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা বড় গাছের গোড়ায় ঐ তরবারি দিয়ে এক কোপ বসায়। গোড়াটি এমনভাবে কাটে যে গাছটি গুঁড়ির উপর আগেই মতোই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে গাছটি শুকিয়ে যায়। অনুসন্ধান করে রাজা এর কারণ জানতে পারেন এবং ঐ কারিগরের কাছ থেকে তার চাওয়া দামে তরবারিটি কিনে নেন।[১২] অনেক ক্ষেত্রে কিংবদন্তীটি মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারকে কেন্দ্র করে লেখা ও বলা হয়েছে। এতে জানা যায় যে রাম মাথুর ও অনন্ত মাথুর দু-ভাই ঐ তরবারিটি তৈরি করেছিলেন এবং কারিগরি দক্ষতার জন্য নবাব তাদের ডেকে এনে 'রায়' উপাধি এবং চোদ্দশ চুয়াশি বিঘে জমি দান করেছিলেন।[১৩] মুখে মুখে গল্পটার নানা পরিবর্তন হয়েছে। সত্য-মিথ্যা যাই হোক, এর থেকে বোঝা যায় যে একসময় কামারপাড়ায় নামকরা অস্ত্রশিল্পী ছিল। তারা অনেকে নবাবের এবং বর্ধমান রাজের অস্ত্রাগারে অস্ত্র গড়ার কাজে লিপ্ত ছিল।[১৪]

বনপাশ-কামারপাড়ার অস্ত্রশিল্পীরা 'গাদা বন্দুক', তরবারি ইত্যাদি তৈরি করত। এগুলো যথেষ্ট উন্নত মানেরও ছিল। যে সময় বাংলাদেশে নবাব ও স্বাধীন রাজার সেনাবাহিনী কামারপাড়ার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। ১৭৬১ সালে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের কাছে সংগত গোলায় বর্ধমান মহারাজার সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর যে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল তাতে বর্ধমান রাজের সেনারা কামারপাড়ার তৈরি বন্দুক ব্যবহার করেছিল।[১৫]

কামারপাড়ার অস্ত্র শিল্পে এক উল্লেখযোগ্য নাম ননী মিস্ত্রী। কথা হচ্ছিল ৮৪ বছর বয়স্ক গণেশ দাসের (ননী মিস্ত্রীর জ্ঞাতি-পুত্র) সঙ্গে। তিনি জানালেন ননী মিস্ত্রীর পিতা, কালী মিস্ত্রী বনপাশ-কামারপাড়ায় একটি কারখানা গড়ে তোলেন। এখানে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি ও মেরামত হত। কালী মিস্ত্রীর দু' পুত্র, ননী মিস্ত্রী ও গোবিন্দ মিস্ত্রীর আমলে ঐ কারখানার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শুধু বর্ধমান জেলাতেই নয়। ননী মিস্ত্রীর কারিগরি দক্ষতা ও নৈপুণ্য সারা বাংলায় পরিচিতি লাভ করে। বনপাশ-কামারপাড়ার লোহা শিল্পের কথা উঠলে আজও ঐ অঞ্চলের মানুষ ননী মিস্ত্রীর নাম উচ্চারণ করে। তাঁর আমলে অস্ত্র শস্ত্র তৈরির চেয়ে মেরামতের কাজই বেশি হত। কলকাতা, বহরমপুর, প্রভৃতি স্থান থেকে তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র মেরামত করতে লোক আসত। তবে তরবারি তখনও অল্প বিস্তর তৈরি



হত। অনেক ক্ষেত্রে শুধু তরবারি শান দেওয়ার (tempering) জন্য তাঁর কাছে অনেকে আসত এবং বাকি কাজ অর্থাৎ পালিশ করা, হাতল লাগানো, ইত্যাদি তারা অন্যত্র করিয়ে নিত। ননী মিস্ত্রী'র আমলে তাঁর কারখানায় আখমাড়া কল, ঢাল এবং অন্যান্য কাজে (যেমন অলংকার তৈরির কাজে) ব্যবহৃত ছোটখাট যন্ত্রপাতিও তৈরি হত। আগ্নেয়াস্ত্র মেরামতের কাজে পারদর্শী থাকায় ননী মিস্ত্রীর সঙ্গে কোন পুলিশ কর্মচারীর যথেষ্ট হৃদ্যতাও ছিল।

বনপাশ-কামারপাড়ায় তৈরি লোহার অস্ত্র বিদেশে তৈরি অস্ত্রের চেয়ে গুণে ও স্থায়িত্বে কোন অংশেই হীন ছিল না।[১৬] তবু পরিস্থিতি ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কামারপাড়ার অস্ত্রশিল্প হারিয়ে যায়। বাংলায় ইংরেজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই শিল্প ক্রমে দুর্বল হতে থাকে।[১৭] কিন্তু কামারপাড়া থেকে কারিগর ও কারিগরি শিল্প বিলুপ্ত হয়নি। কর্মকাররা তাদের কারিগরি প্রতিভা বজায় রাখতে গিয়ে অন্য শিল্পে আত্মনিয়োগ করে। "কামারের শিল্প নষ্ট হল, সুতরাং তাকে অন্য শিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করতে হল।"[১৮] ফলে সেখানে জেগে ওঠে পিতল-কাঁসার বাসন শিল্প।

কোন্ সময় থেকে বনপাশ-কামারপাড়ায় পিতল-কাঁসা শিল্প গড়ে ওঠে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে উনিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে সরকারি নথিপত্রে এর উল্লেখ ও পরিচয় পাওয়া যায়।[১৯] এখানে মূলত পিতল ও ভরণের (নকল কাঁসা) জিনিস তৈরি হয়। গ্লাস, ঘটি, ছোট বাটি ও বদনা (জলপাত্র) ছিল প্রধান উৎপাদিত দ্রব্য। সেই সঙ্গে পিতলের কবজা, তালা এবং বল্টুও এখানে তৈরি হত।[২০] ধীরে ধীরে বনপাশ-কামারপাড়া বর্ধমান জেলায় পিতল ও ভরণের জিনিস তৈরির এক অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক পরিবার এ শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সরকারি তথ্য থেকে জানা যায় যে বিগত শতকের শেষ দিকে ২০০ জন কারিগর কামারপাড়ায় এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল এবং সে সময় এখানে বছরে ৪৩০০০ টাকার জিনিস উৎপাদিত হত।[২১] "বর্তমান শতাব্দীর প্রথমেও বনপাশ, দাঁইহাট প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে কাঁসা পিতলের বাসন তৈয়ার হইত। বনপাশের বাসনের সমাদর ছিল ইহার সূক্ষ্ম কাজ ও আকর্ষণীয় পালিশের জন্য।"[২২]

গ্রামের প্রায় সমস্ত কর্মকার এই শিল্পকে অবলম্বন করে এবং এর উপর নির্ভর করেই তাদের পরিবার প্রতিপালিত হত। কর্মকার ছাড়া কিছু তফশীল সম্প্রদায়ের মানুষও (যেমন বাউরি, বাগদি) বাসন বানানোর কাজে নিযুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, মহিলা কর্মীরাও এ শিল্প থেকে দূরে সরে যায়নি। বাসন তৈরির জন্যে যে ছাঁচের কাজ করতে হত তাতে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল গ্রামের বিধবা মহিলাদের। তাদের কাছে এটাই ছিল জীবিকার প্রধান অবলম্বন।[২৩] ঘরে বসে এ কাজ করে তারা অনায়াসে জীবন যাপন করত। কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি শিল্পের মতো কামারপাড়ায় বাসন তৈরির সম্পূর্ণ কাজটাই হত হাতে; যন্ত্র বলতে কুঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হাতে তৈরি হলেও কাজ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত। তাই সারা বাংলায় (অবিভক্ত বাংলায়) এর যথেষ্ট সমাদর ছিল। তবে পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৯৩০-এর দশকে জ্ঞান দাস ও ভূষণ দাস নামে দুজন কারিগর কলকাতা থেকে দুটি ইঞ্জিনচালিত যন্ত্র (সম্ভবত বিদেশি যন্ত্র) আমদানি করেন। পালিশ করার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হত।[২৪]

বনপাশের তৈরি বাসনের চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। উত্তর ও পূর্ব বাংলায় মালদহ, রঙপুর, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ইত্যাদি শহরে এখানকার বাসন প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত। তাছাড়া ঐ সমস্ত শহরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় এখানে থেকে ব্যবসায়ীরা বাসন নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। কলকাতার বাজারেও এখানকার বাসন সরবরাহ করা হত। তাছাড়া অনেক ফেরিওয়ালা এ গ্রাম থেকে বাসন কিনে পাশের গ্রাম ও শহরে বিক্রি করত। বনপাশ গ্রামেও কয়েকটি বাসনের দোকান গড়ে ওঠে। কোন কোন ব্যবসায়ী এখানে বাসনের বেশ বড় ধরনের কারবার গড়ে তোলেন। এরকম একটি কারবার ছিল গ্রামের পত্তনীদার রায় বংশের। কামারপাড়ায় বাসনের 'বড় দোকান' ছিল তাঁদেরই। কাটোয়াতেও তাঁদের বাসনের কারবার ছিল। আজও সে কারবার টিকে আছে। কামারপাড়া থেকে বাসনপত্র কাটোয়ায় যেত এবং সেখানে থেকে গঙ্গায় জলপথে যেত পূর্ববাংলায়।[২৫]

এভাবেই চলত বনপাশ-কামারপাড়ার বাসন শিল্প। মোটামুটিভাবে ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত এর অগ্রগতি ছিল অব্যাহত। গ্রামের পত্তনীদার রায় বংশের সন্তান পার্বতী চরণ রায় জানালেন যে ১৯৪১ সালে যখন তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখনও এখানে বাসনের কারবারের রমরমা ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বাজারে অন্য ধাতব দ্রব্যের বাসনের চলন হয় এবং পিতল-কাঁসার বাসনের চাহিদা কমতে থাকে। সেই সঙ্গে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঘাত। ফলে বনপাশের বাসন শিল্প ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এতে কামারপাড়ার কারিগররা পঙ্গু হয়ে পড়েনি। কারণ বাসন ছাড়াও পিতল শিল্পের আর একটি শাখা এখানে গড়ে উঠেছিল — পিতলের অলংকার শিল্প। শুধু তাই নয়, সুন্দর জার্মান সিলভারের নানা রকম গয়নাও এখানে তৈরি হত। চাকচিক্য ও শিল্পকৌশলে এসব বিদেশি জার্মান সিলভারের জিনিসের চেয়ে সরেস ছিল।[২৬] কামারপাড়ার কারিগররা বাসনের মতো পিতলের গয়না তৈরির কারখানাও গড়ে তোলে। এই সমস্ত

কারখানায় অনন্ত, চুড়ি, বালা, মাকড়ি, ইত্যাদি নানা রকম গয়না এবং মাদুলি, তাবিজ, গলার তক্তি তৈরি হত। বড় ও মাঝারি মিলিয়ে প্রায় দশ-পনেরটি গয়নার কারখানা এখানে চালু ছিল। "গাঁয়ে এমন কোন কারখানা ছিল না যেখানে রোজ হাজার জোড়া মাকড়ি তৈরি না হত"।[৪৩] কামারপাড়ায় দোলগোবিন্দ দে-র কারখানায় সপ্তাহে আট-দশ কাহন (এক কাহন = ১২৮০ টি) মাদুলি তৈরি হত।[৪৪] কলকাতা এবং পূর্ববাংলায় এখানকার তৈরি গয়নার যথেষ্ট চাহিদা ছিল। কলকাতার আবিদ আলি এন্ড কোম্পানি ছিল কামারপাড়ার গয়নার অন্যতম এজেন্ট। মুসলমান সম্প্রদায়ের মহিলারাই এ সমস্ত গয়না বেশি ব্যবহার করত। তাই কামারপাড়ায় তৈরি গয়না শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বিক্রি হত পূর্ব বাংলার বিভিন্ন মেলায়।

বনপাশ-কামারপাড়ার অলংকার শিল্পে উল্লেখযোগ্য কারিগরদের মধ্যে মদন মোহন রায়, গঙ্গাধর রায়, বিভূতিভূষণ দে, গোপালচন্দ্র দাস, গৌরীশঙ্কর দাস প্রভৃতি ব্যক্তির নাম আজও এ গ্রামের মানুষ উল্লেখ করে। কামারপাড়ায় কেমিক্যাল সোনা ও তামা-পিতল এবং জার্মান সিলভারের অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম মুকুন্দ মুরারী দে। ১৯২৮-২৯ সাল থেকে তিনি একাজে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত মাসে প্রায় কুড়ি হাজার টাকার গয়না তার কারখানায় তৈরি হত এবং এ গুলোর অধিকাংশই বিক্রি হত পূর্ববাংলার বিভিন্ন মেলায়।[৪৫] এই কাজের জন্য তিনি কলকাতা থেকে দুয়েকটি যন্ত্রপাতি (যেমন, কাটিংও পাঞ্চিং মেশিন) এবং মহারাষ্ট্রের থানে থেকে কিছু ডাইস কিনেছিলেন। এভাবে বাসনের পাশাপাশি অলংকার শিল্পও বর্ধমানের এই শিল্পকেন্দ্রে চালু ছিল। দেশভাগ হওয়ার পর বনপাশ-কামারপাড়ার পিতল শিল্প ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ল। অনেক কারখানা ও দোকান উঠে গেল। অনেকে পৈতৃক পেশা ছেড়ে দিয়ে রোজগারের আশায় অন্য বৃত্তি নিল। তবে শুধু দেশভাগই নয়, অ্যালুমিনিয়াম ও চীনামাটির তৈরি বাসন এবং মেশিনে তৈরি রকমারি চকচকে হালফ্যাশনের গয়নার আবির্ভাব, কাঁচামালের অভাব, প্রভৃতি কারণে কামারপাড়ার পিতল শিল্পের ক্রমাবলুপ্তি ঘটল। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে মানুষের নির্ভরতা বাড়ার ফলে হয়ত মাদুলি, তাবিজের চাহিদা কিছুটা হ্রাস পেল। পিতলের অলংকার ও বাসন আজ আর এ গ্রামে তৈরি হয় না। ডাইস ও মাদুলি তৈরির দুয়েকটা ছোট প্রতিষ্ঠান টিমটিম করছে মাত্র। কিন্তু বনপাশ-কামারপাড়ার পিছিয়ে পড়া শিল্প সরকারি ও বেসরকারি তরফে কোন সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। ফলে এ শিল্প হারিয়ে গেল। জানি না কর্মকারদের হাতুড়ির গমগমে আওয়াজ এ গ্রামে আবার শোনা যাবে কি না।

বনপাশ-কামারপাড়ার পিতল শিল্পে নিযুক্ত অনেকেই ছিলেন নির্মাতা ও বিক্রেতা। এ প্রসঙ্গে গোরাচাঁদ রায়, ভূপতি চরণ রায়, কৃষ্ণধন দাস, ভূষণ চন্দ্র দাস, ইত্যাদি ব্যক্তি স্মরণীয়। নিজেরা কারিগর হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কারখানায় তাঁরা কারিগরদের দিয়েই কাজ করাতেন। তবে এই শিল্পে নিযুক্ত কারিগর, কারখানার মালিক—কারও অবস্থা খারাপ ছিল না। কারিগর অথবা শ্রমিকরা যা রোজগার করত তা দিয়ে তারা ভালভাবেই দিন কাটাত। সঙ ছিল তাদের বিনোদনের একটি অঙ্গ। এরই রূপান্তর হয়ে ধীরে ধীরে এ গ্রামে জেগে ওঠে যাত্রা ও থিয়েটার।[৪৬] অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা পিতল-কাঁসা ব্যবসায়ে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।[৪৭] শিল্প থেকেই এ গ্রামের মানুষের সমৃদ্ধি। বাসনের কারবার থেকে এত অর্থাগম হয়েছিল যে গ্রামের ব্যবসায়ী অদ্বৈত চরণ রায় বনপাশ, বিঘড়া, মন্দারবাটি প্রভৃতি গ্রামে পত্তনী কেনেন এবং বনপাশের জমিদার হন।[৪৮]

একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে শিল্প কেন্দ্র হিসাবে বনপাশ-কামারপাড়া বর্ধমান জেলার গৌরব। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে এখানে কারিগরি শিল্পেরও রূপান্তর ঘটেছে—লোহার শিল্প থেকে পিতল শিল্প এবং তারপর (স্বাধীনোত্তর যুগে) সোনা-রুপোর শিল্প। আজও এখানে কামারের ঠুকঠাকের আওয়াজ পাওয়া যায়, তবে এখন তারা সোনা-রুপোর গয়না তৈরির কাজে ব্যস্ত। ঝরিয়া, ধানবাদ, আসানসোল, বর্ধমান, কলকাতায় সোনা-রুপোর দোকানে এখানকার কারিগররা কাজ করে।[৪৯] কর্মকার কিভাবে স্বর্ণকারে পরিণত হয়েছে তার সম্পূর্ণ চিত্র না পাওয়া গেলেও এটা বোঝা যায় যে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে দক্ষ ও পরিশ্রমী কারিগররা ধাপে ধাপে তাদের বৃত্তি বদল করছে। বস্তুত, বনপাশ-কামারপাড়ায় এমন এক শ্রেণী কারিগর জন্মগ্রহণ করেছিল যাদের প্রতিভা ছিল সারা বাংলায় সুপরিচিত এবং আজও স্মরণীয়। কারিগরি নিপুণতার পরিচয়েই বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এখানকার কারিগররা কাজের সুযোগ পায়।

এ গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল শিল্প। অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল হস্তশিল্পের অনুরাগী। কর্মকাররা প্রায় সকলেই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই কারও ঘরে অন্নাভাব ছিল না।[৫০] এখানে চাষী ও পেশাভিত্তিক মানুষের সংখ্যা ছিল খুব কম। কারবার যখন রমরমা ছিল তখন প্রত্যেকের সংসার ছিল সচ্ছল। আজকের কামারপাড়ায় যেটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি দেখা যায় তা সেই শিল্পযুগেরই ফসল। গ্রামের অর্থনৈতিক বনিয়াদ মজবুত ছিল বলেই সাংস্কৃতিক প্রগতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা নাটক, থিয়েটারের অনুরাগী ছিল এবং তাদের মধ্যে



অভিনয়েরও রেওয়াজ ছিল। এখানে যাত্রা ও নাটক এত জনপ্রিয় ছিল যে গ্রামের শিক্ষিত ও উদ্যোগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এখানে একটি পাঠাগার গড়ে ওঠে এবং হাতে লেখা পত্রিকা 'অর্ঘ' প্রকাশিত হয়।[৫১] জনসাধারণের অকুণ্ঠ দানে তৈরি হয় শিক্ষা নিকেতনের নতুন ভবন এবং প্রগতি পাঠাগার, যা আজও বর্তমান (১৯৩৭ সালে এই শিক্ষা নিকেতনের জন্ম হয়)। গ্রামের মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকার ফলেই আনুমানিক একশো বছর আগে থেকে এখানে দৈনিক বাজার বসতে শুরু করে। গ্রামের মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখান থেকেই কিনত। আজও সে বাজার রয়েছে এবং তা বর্ধিষ্ণু হয়েছে। এ গ্রামের কারও চাষযোগ্য জমি ছিল না বললেই হয়। শিল্প ও শিল্পভিত্তিক কারবার থেকে রোজগার এতই ভাল হত যে শিল্পে বিনিয়োগকারীরা চাষযোগ্য জমি কেনার দিকে মনোনিবেশ করেনি। তবে চাষ ছিল না বলে খাদ্যের অভাব ছিল এমন নয়। পাশের গ্রামগুলো থেকে বিক্রেতারা এখানে খাদ্যদ্রব্য (যেমন চাল, গুড়, কলাই, ইত্যাদি) বিক্রি করতে আসত। কিন্তু সবকিছুরই অবক্ষয় শুরু হল শিল্পের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে। অতঃপর গ্রামের শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কৃষিযোগ্য জমি কেনার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং অনাবাদী জমিকে আবাদী করে তোলে। ফলে কারখানার মালিক হয়ে ওঠে জমির মালিক এবং কারিগর চাষী। আজ গ্রামের অনেক কারিগর ও ব্যবসায়ীর চাষ হয়ে উঠেছে একমাত্র ভরসা। শিল্পনির্ভর হওয়ার ফলে দারিদ্র্য এ গ্রামে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। শিল্পকর্মে যুক্ত থাকার জন্যই আজও গ্রামের অনেক কর্মকার পরিবারের আর্থিক ভিত কিছুটা দৃঢ়। আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল বলেই স্বাধীনোত্তর পর্বে এখানে প্রায় সমস্ত পরিবারে শিক্ষার প্রসার ঘটে। অনেকে আধুনিক কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের ফলে এখানে কৃষির প্রসার ঘটে ঠিকই কিন্তু শিল্পকে এ গ্রামের মানুষ বর্জন করেনি ; সেই ঐতিহ্যও তারা ধরে রেখেছে। অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় থাকার ফলেই এখানকার মানুষ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। আধুনিক শিক্ষা এ গ্রামকে যথেষ্ট স্পর্শ করেছে। শিল্প কেন্দ্র হিসাবে বনপাশ-কামারপাড়া ছিল চিরকালই বহির্মুখী। সে কারণেই আধুনিক শিক্ষার আলোক স্বাভাবিকভাবেই এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামে এ ছবি পাওয়া সম্ভবত দুষ্কর।

পরিশেষে বলা যায় ভূমিসংস্কার করে ছিটে ফোঁটা জমি ছিটিয়েও জমিতে উদ্বৃত্ত অক্ষৌহিণীকে পায়ের তলায় মাটি দেওয়া যাবে না। গ্রামীণ সমাজকে শিল্পনির্ভর করতেই হবে। গ্রাম বাংলায় যেখানে এই শিল্পের ঐতিহ্য সুবিদিত সেটাকেই অনুদানে, অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত করা প্রয়োজন। গ্রামের কুটির শিল্পকে বড় না হোক, মাঝারি আকার দিতে পারলে গ্রাম্য বেকার বা ভবঘুরে কাজ পাবে। দুয়েকটা আন্তর্জাতিক বা জাতীয় ভারী শিল্প স্থাপন করে বেশি মানুষের বিনিয়োগ সম্ভব নয় এবং তার লাভের সিংহভাগ বাইরেই চলে যাবে। কাঞ্চননগর-কামারপাড়া-বনপাশের পথ ধরেই আমাদের এগোতে হবে বড় মাপের ভারী শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে।[৫২]

### নির্দেশিকা


১। নগেন্দ্রনাথ বসু, **বর্ধমানের ইতিকথা**, কলকাতা, ১৯১৫, পৃ: ১৬

২। মণীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, **কর্মকার কুল**, দীননাথ দাস (পাণ্ডুলিপি) কাঞ্চননগর, পৃ: ৫

৩। বলাই দেবশর্মা, **বর্ধমানের ইতিহাস**, বর্ধমান, ১৩৬৫, পৃ: ১৩-১৪, ২৩

৪। কে. এম. মল্লিক, এ ব্রিফ হিস্ট্রি অভ বেঙ্গল কমার্স, ২য় ভাগ, কলিকাতা, ১৮৭২, পৃ: ১৮-২৩; **দি জার্নাল অভ ইন্ডিয়া আর্ট**, ১ম খণ্ড, নবম সংখ্যা, লন্ডন, ১৮৮৬, পৃ: ৩

৫। গোবিন্দ লাল দাসের সাক্ষাৎকার, কাঞ্চননগর, ৩১/১০/১৯৯০

৬। মণীন্দ্র নাথ কুণ্ডু, **কর্মকার কুল**, পৃ: ৫ ; গোবিন্দ লাল দাসের সাক্ষাৎকার ; অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী, **বর্ধমান পরিচিতি**, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ: ২২৪

৭। **দি জার্নাল অভ ইন্ডিয়া আর্ট**, ১ম খণ্ড, নবম সংখ্যা, লন্ডন, ১৮৮৬, পৃ: ৩

৮। **দি জার্নাল অভ ইন্ডিয়া আর্ট**, পৃ: ৩

৯। ই. ডব্লু কোলিন, **রিপোর্ট অন দি এগজিস্টিং আর্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বেঙ্গল**, কলিকাতা, ১৮৯০, অনুচ্ছেদ-১৫।

১০। ঐ, অনুচ্ছেদ-১৫

১১। গোবিন্দলাল দাস ও তারাপদ দে-র সাক্ষাৎকার, কাঞ্চননগর, ৩১।১০।১৯৯০ এবং ২।১১।১৯৯১

১২। ই.ডব্লু কোলিন, উপরিক্ত রিপোর্ট, পরিশিষ্ট - ২, অনুচ্ছেদ- ২৫

১৩। শক্তিপদ নায়েকের সাক্ষাৎকার, কাঞ্চননগর, ২৬।৩।১৯৮৯

১৪। অধীর কুমার দে-র সাক্ষাৎকার, কাঞ্চননগর, ৫।৩।১৯৮৯

১৫। ই.আর.ওয়াটসন, **এ মোনোগ্রাফ অন আয়রন এন্ড স্টিল ওয়ার্কস ইন দি প্রভিন্স অভ বেঙ্গল**, কলিকাতা, ১৯০৭, পৃ: ৩২

১৬। **পল্লীবাসী**, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯০৮

১৭। শক্তিপদ নায়েক ও তারাপদ দে-র সাক্ষাৎকার

১৮। তারাপদ দে-র সাক্ষাৎকার
১৯। রিপোর্ট অভ দি বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটি, কলিকাতা, ১৯৪৮, পৃ: ২৯-৩০
২০। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডাক বাংলার ডায়েরী, কলিকাতা, ১৯৭৭ (২য় সংস্করণ), পৃ: ৬৩ এবং অধীর কুমার দে ও শক্তিপদ নায়েকের সাক্ষাৎকার
২১। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, উপরিউক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৬৪
২২। কাটলারি ইন্ডাস্ট্রি ইন বার্জোয়ান: এ টাইপ স্টাডি, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ: ৪
২৩। ঐ, পৃ: ৬
২৪। শেতবাহন রায়ের সাক্ষাৎকার, বনপাশ-কামারপাড়া, ৪।৮।১৯৯৩
২৫। দি জার্নাল অভ ইন্ডিয়া আর্ট, ১ম খণ্ড, নবম সংখ্যা, লন্ডন, ১৮৮৬, পৃ: ৩
২৬। এ প্রসঙ্গে ই. আর. ওয়াটসন-এর উপরিউক্ত রিপোর্ট এবং প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়-এর বঙ্গ পরিচয়, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য
২৭। এস.এন. রায়, কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ইন রিলেশন টু বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোগ্রেস, কুচবিহার, ১৯৪১, পৃ: ১০৪-১০৫
২৮। ই.আর.ওয়াটসন, উপরিউক্ত রিপোর্ট, পৃ: ৭
২৯। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, উপরিউক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৫৭-৫৮
৩০। ই.আর.ওয়াটসন, উপরিউক্ত রিপোর্ট, পৃ: ৭ এবং শেতবাহন রায়ের সাক্ষাৎকার
৩১। ই.আর.ওয়াটসন, উপরিউক্ত রিপোর্ট, পৃ: ৭
৩২। কৃষক, ভাদ্র ১৩১৬, পৃ: ১২০
৩৩। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২০
৩৪। ঐ, পৃ: ৫২০
৩৫। ই.ডব্লু. কোলিন, উপরিউক্ত রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ-১২
৩৬। ঐ, অনুচ্ছেদ - ১২ এবং শেতবাহন রায় ও বিমলাকান্ত দাসের সাক্ষাৎকার, বনপাশ-কামারপাড়া, ৪।৮।১৯৯৩ এবং ২৫।২।১৯৯৩
৩৭। ই.ডব্লু কোলিন, উপরিউক্ত রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ-২৩
৩৮। অনুকুল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী, উপরিউক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২২৪
৩৯। শেতবাহন রায়ের সাক্ষাৎকার
৪০। বিমলাকান্ত দাসের সাক্ষাৎকার
৪১। পার্বতীচরণ রায়ের সাক্ষাৎকার, বনপাশ-কামারপাড়া, ১৬।১০।১৯৯৩
৪২। কৃষক, ভাদ্র ১৩১৬, পৃ: ১২০
৪৩। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, উপরিউক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৬০
৪৪। ঐ, পৃ: ৬০
৪৫। মুকুন্দ মুরারী দে ও বংশ গোপাল দে-র সাক্ষাৎকার, বনপাশ-কামারপাড়া, ৪।৮।১৯৯৩
৪৬। শেতবাহন রায়ের সাক্ষাৎকার
৪৭। সুভাষ সমাজদার, বাণিজ্যে বাঙালী : সেকাল ও একাল, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃ: ২১২
৪৮। পার্বতীচরণ রায়ের সাক্ষাৎকার
৪৯। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, উপরিউক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৫৮
৫০। কৃষক, ভাদ্র ১৩১৬, পৃ: ৫৮
৫১। পরিমল রায়, 'অর্ঘের ইতিকথা ও একাল', অর্ঘ, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৫
৫২। চিত্রব্রত পালিত, 'পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার', প্রকাশিতব্য গ্রাম বাংলার রূপান্তর থেকে।

স্মরণে

# কেন ছেড়ে যাবে ?

সুমিতা চক্রবর্তী

মৃত্যু। জীবনের পরিণাম— যার কোন অন্যথা নেই। জীবনের আবশ্যিক অঙ্গ। জীবন আর মৃত্যু মিলেই জীবন। যে কবি জীবনকে ছুঁয়ে থাকেন— তাঁকে মৃত্যুও ছুঁয়ে থাকতে হয়। কারও লেখায় তা থাকে প্রচ্ছন্ন — হয়ত বা পরোক্ষ। কখনও বা কবির লিখনকর্মের গতিমুখটিই নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবার ফলে মৃত্যুবোধের দিকটা সামনে চলে আসার অবকাশ পায় না। বিশেষ ভাবে সমাজ-প্রগতি ভাবনার কবিতা এবং প্রতিবাদী কবিতা লিখে থাকেন যাঁরা — অত্যাচারীর শোষক হাতের চাপে দুর্বলকে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবার প্রতিবাদেই তাঁদের কবিতা জন্ম নেয় বলে মৃত্যু তাঁদের শিল্পে তেমন স্বাভাবিক রূপ নেয় না। কিন্তু যে কবিদের লেখার ধরন আলাদা— যাঁরা জীবন উপলব্ধির সমগ্রতাটুকুই কাব্যে ধরে দিতে চান — তাঁদের লেখায় খুব স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবোধ ভেসে আসে — জীবনবোধ থেকে মৃত্যু-অনুভবকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলেই।

বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে মৃত্যুচেতনার স্থান অনেক গভীরে। সব দেশেই প্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্ম — অন্তত, লেখায় ও ভাষ্যে— সর্বত্রই পরলোকমুখী। কিন্তু সাহিত্য জীবনেরই ফুল। তাই বোধহয় দেখা যায় — যাকে বলি ধর্মীয় সাহিত্য — সেখানেও ধর্ম-প্রভাবে মানুষ পরলোকমনস্ক হবার পরিবর্তে দেবতারাই হয়ে উঠেছে ইহলোকের মৃত্তিকাস্পর্শী মানব-প্রতিমা। আমাদের প্রথম আধুনিক কবি মধুসূদনের কাব্যে স্বর্গ ইত্যাদির প্রসঙ্গ অনেক থাকলেও প্রবল ইহবাদই তাঁর রচনার প্রধান সুর।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কয়েকজন বিশিষ্ট কবির অন্যতম যাঁদের লেখায় ইহবাদ আর লোকোত্তর উপলব্ধি এক অবিচ্ছিন্ন সাম্যে সংলগ্ন। একটি থেকে অপরটিকে ছাড়ানো যায় না। এই লোকোত্তরতার অনুভবকে কেবলই মৃত্যুবোধ বললে ছোট করা হয়। জীবন শেষ হবে — সেই সমাপন যেন এক মহিমান্বিত মহাজীবনে খণ্ডজীবনের বিলীন হয়ে যাওয়া। 'মহাসুন্দর শেষ' — এভাবেই মৃত্যুকে দেখেছেন তিনি— 'তবুও শান্তি তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে'। তাই মৃত্যু তাঁর কাছে আরাধ্য রূপে কখন কখনও বা প্রিয় রূপে দেখা দিয়েছে। জীবনধারার সমাপ্তির খণ্ডতাবোধ সেখানে নেই কোথাও। মৃত্যুর একটি অজানা দিক আছে, সেই অপরিচয়ের পথ ধরে মৃত্যু সম্পর্কে একটি শঙ্কারসমিশ্রিত বিস্ময়োপলব্ধি জাগতে পারে কবির মনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে ঐশিকতাবোধ, আধ্যাত্মিকতার বোধ এত সু-স্থিত ছিল যে রহস্যময়তার অনুভূতিকে সরসময়েই ছাপিয়ে গেছে চরিতার্থতার উপলব্ধি — 'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে—'

রবীন্দ্রনাথ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিমানসের কতখানি কাছাকাছি ছিলেন ? মনে হয়, ছিলেন অনেকখানিই। কিন্তু সেই নৈকট্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য, প্রেম, কল্পনার উৎক্রমণ, নিসর্গচেতনা, বিস্ময়মুগ্ধতার পথ ধরেই এসেছে প্রধানত ; শক্তি চট্টোপাধ্যায় রাবীন্দ্রিক মৃত্যুবোধের শরিক ছিলেন — এমন বোধ হয় বলা যায় না। ঈশ্বরের কথাও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আছে অনেকবার। সেখানেও পার্থক্য আছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর প্রভু ও পিতৃস্বরূপ— করুণাময় হলেও তিনিই শেষ বিষয়ক। পরীক্ষাচ্ছলে হলেও মানুষকে দুঃখ দেবার ব্যাপারে তৎপর। সেই দুঃখদহনের ভিতর দিয়েও মানুষ ঐশী করুণায় এবং প্রাণ-সত্তার সমুত্তীর্ণ পূর্ণতাবোধে পৌঁছতে পারে — অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষেরা পারেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঈশ্বর-ভাবনা তুলনায় সহজ সরল। আমাদের মনে হয় মানবতারই অন্য নাম 'ঈশ্বর' —তাঁর কবিতায়।

বাংলার অপর যে-কবি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবোধের গহনে আচ্ছন্ন — তিনি জীবনানন্দ দাশ। মানবমনে মৃত্যুবোধের বহুবিচিত্র উপলব্ধির রূপকল্প তাঁর কবিতায় আমরা অবিরল পেতে থাকি। মৃত্যু আছে জেনে মানুষ কখনও গভীরভাবে জীবনকে বুকের মধ্যে টানে (মৃত্যুর আগে) ; আবার কখনও জীবনকে জানার ভারে ক্লান্ত বিষণ্ন মানুষ একা একা এক গাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থ গাছের দিকে চলে যায় (আট বছর আগের একদিন)।

সম্প্রতি প্রয়াত (মৃত্যু ২৩ মার্চ ১৯৯৫) কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণে এই বিশেষ নিবন্ধটি মুদ্রিত হল।

মানুষের মৃত্যু তাঁর কাছে কখনও 'আঁধার ঘুঁজির বুকে' 'থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো' ঘুম (আট বছর আগের একদিন) ; আবার কখনও ধানসিড়ি নদীর কিনারে পউষের রাতে 'কোনোদিন জাগব না জেনে' শুয়ে থাকা (অন্ধকার)। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো মৃত্যুকে প্রিয় রূপে কল্পনা করতে দেখা যায় না তাঁকে — মৃত্যু যে কোনও মহিমামণ্ডিত চিরপূর্ণতার পথে যাত্রা — এরকম আধ্যাত্মিকতা জারিত দার্শনিকতার কবিও ছিলেন না জীবনানন্দ। তিনি মৃত্যুকে বহু রূপে দেখলেও ব্যক্তি-মানুষের জীবনে তাকে অবসান বলেই মেনেছিলেন। তবে 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'-এর অধিকারী জীবনানন্দ মানব-সভ্যতার ধারাকে অনন্ত বলেই জানতেন। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব / থেকে যায়' (মানুষের মৃত্যু হলে, শ্রেষ্ঠ কবিতা)।

জীবনানন্দকে পার হয়ে এসে আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমরা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুবোধের মুখোমুখি এসে দাঁড়াই। তাঁকে 'মৃত্যুমনস্ক' কবি আখ্যাও দিতে পারেন কেউ কেউ। এই মৃত্যুমনস্কতা তাঁকে কখনই 'মরবিড' করে দেয়নি। মৃত্যু তাঁর কাছে জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ, কিন্তু স্বাভাবিক হলেও তা অবসান। মৃত্যুমনস্কতা তাঁর কবিতার জীবনরসকে প্রগাঢ়তা দিয়েছে — সেই সঙ্গেই মৃত্যুকে মোটের উপর সহজভাবে গ্রহণ করবার প্রেরণা জুগিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা — এই মৃত্যুচেতনা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনচেতনায় এনেছে এক প্রসন্ন ঔদাস্য— যেখানে ভালবাসা বুক ভরা, কিন্তু আঁকড়ে থাকার তীব্র সংরাগ নেই। নেই মুঠোয় ভরবার বাসনা। কোনও একজন কবিকে বাউল বৈরাগীর মতো মনের অধিকারী বলে যদি মনে হয় কারোর তাহলে সেই ভাবনার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় কবির নিজেরই প্রাত্যহিক জীবনের আচরণ। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করতেন যদি বলি, তারপরেই কেউ দেখিয়ে দেবেন কোথায় কোথায় তিনি ব্রাহ্মণত্বের সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এক বৈরাগী-দৃষ্টির অবলোকন দেখি — একথা বললেই তীক্ষ্ণ হবে প্রতিবাদ — জীবিকা ও জীবনযাপনে তেমন কোনও নিদর্শন তো তাঁর ছিল না! অথবা ছিল কি? ঠিক জানি না। কবিকে প্রধানত তাঁর কবিতাতেই পাই। মানুষের জীবনযাপন এক বহুস্তরিত প্রক্রিয়া। প্রাত্যহিকতার দিন-অতিবাহন আর মনের বেঁচে থাকার তল বহু ক্ষেত্রেই হয় ভিন্ন। আবার মানুষের মনন-জীবন তার থেকেও কিছুটা আলাদা। সব সময়েই এসবের সামঞ্জস্য পুরোপুরি রক্ষিত হয় না। কিন্তু সব সময়েই যে তা প্রতারণা — তা-ও নয়।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পরিকীর্ণ মৃত্যুবোধ তাঁর সেই সহজ জীবনবোধেরই অপর রূপ বলে মনে হয় — যেখানে মানুষ জীবনপথের এক উদাসী পথিক— যে জানে জীবন যেমন জড়িয়ে থাকে পায়ে পায়ে — মৃত্যুও তাই। আজ আছে, কাল নেই। জীবন আর মৃত্যু নিয়ে জীবনের চলা। যখন তিনি ঘোষণা করেন — 'একাকী যাবো না অসময়ে' — সেই একই ক্ষণে পংক্তির অনুরণনে অব্যক্ত অথচ অভিপ্রেত উক্তিটিও শ্রুত হয় — যে কোনও দিকেই শুধু নয়, যে-কোনও মুহূর্তেই তিনি চলে যেতে পারেন। কেবল ইচ্ছেটুকু হলেই হয়। যেন জীবন ও মৃত্যু দুদিকেই তাঁর বন্ধন — দুদিকেই তাঁর মুক্তি। তাই মৃত্যু তাঁর কাছে অস্তিত্বেরই এক গভীর প্রচ্ছায় — চেতনার এক দ্যুতিস্ফুরিত বিদ্যুৎ। সেই বোধে মিশে আছে জীবন ছেড়ে যাবার গাঢ় বেদনা, তবু আছে কী এক অপরূপ রহস্যময় টান। আর, সব কিছুর কেন্দ্রে আছে এই গহন উপলব্ধি — জীবন-মৃত্যুর দু' দিকের মায়া নিয়েই জীবনের খেলা—

সমস্ত দিন সমস্ত রাত এই খেলাটির কাছে
আমার হৃদয় ভাগ করে দুই শূন্যে বসে আছে।
(দুই শূন্যে, প্রভু নষ্ট হয়ে যাই)

এই শূন্যে বসে থাকা কবিকেই জীবন-পথের উদাসী পথিক বলে জানি।

মৃত্যুর সাংসারিক অভিঘাত, ব্যক্তিগত ভালবাসার বৃত্তে মৃত্যুজনিত শূন্যতায় মানুষের কষ্টের বোধ সব সময়েই সত্য। নিতান্ত বাস্তব সেই মরলোকের যন্ত্রণাই শিল্পলোকের অমর লিপি রচনা করে। শৈশবে পিতার মৃত্যু এবং আরও অনেক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন তিনি তাঁর স্মৃতিলিখনে (এই সব পদ্য, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৯৭২)। আত্মীয়, বন্ধু, প্রিয় বা স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে কিছু কিছু শোক-কবিতা সবসময়েই লেখা হয়। কিন্তু একটা সময়ে 'এলেজি' নামে যে বিশেষ ধরনের লিরিক মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অজস্র লিখতেন কবিরা — ঠিক সেই ধরনটি এখন আর ততটা জনপ্রিয় নয়। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায় এত মৃত্যুস্মৃতি-বেদনা-নিষিক্ত কবিতা লিখেছেন যে খুব সঙ্গতভাবেই তাঁর একটি স্বতন্ত্র এলেজি-সংকলন হয়ে যায়। তাঁর এই শোক-কবিতাগুলিতে কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীর অধিকার অনেক বেশি। যাঁকে মনে করে লেখা হচ্ছে কবিতা তাঁকে আবৃত করে দিয়ে প্রায় প্রতিটি এলেজি-তেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনও-না-কোনও জীবন-মৃত্যু বিষয়ক উপলব্ধি প্রতিবিম্বিত। প্রতিটিরই স্বাদ স্বতন্ত্র।

দুটি কবিতা নেওয়া যাক। 'এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' (সোনার মাছি খুন করেছি) এবং 'ঐ যে তিনি : সতীনাথ ভাদুড়ী স্মরণে' (প্রভু নষ্ট হয়ে যাই)। দু'জন অগ্রজ কথাশিল্পীর স্মরণে রচিত কবিতা। কারও সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রগাঢ়তা ছিল না। কাজেই প্রত্যাশিত ছিল দুই সাহিত্যিকের কিছুটা পরিচয় থাকবে কবিতাদুটিতে এবং থাকবে প্রথাসিদ্ধ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। কিন্তু



সেরকম কিছুই নেই। দুটি কবিতাই কবির নিজস্ব মৃত্যু-ভাবনা থেকে জাত। মানিক বা সতীনাথ কেবলই উপলক্ষ।

তবে দুটি কবিতাতেই আছে এমনতর স্বীকৃতি যে এই দুজন মানুষ খুব তাৎপর্যময় হয়ে বেঁচে ছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলে যাওয়া যেন কবির জীবনীশক্তিরও কিছুটা অংশ নিয়ে গেছে — ''কোথাও কেউ নেই — যাকে দেখতে দেখতে — আমরা / অফুরন্ত জীবনের দিকে যেতে পারি,''...। সতীনাথ ভাদুড়ীকে কবি চলে যেতে দিতে চান না—

শ্মশানের কোনো দরজা নেই— তাহলে বন্ধ করে দিতুম
শ্মশানের নেই তালাচাবি — তাহলে হারিয়ে ফেলতুম
... ... ...
আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে যেতে পারোনি
তুমি এখনো।

নিকটতর ও ঘনিষ্ঠতর বন্ধুজনের মৃত্যুস্মৃতিতে রচিত কবিতাগুলিতে অনুভূতির তাৎক্ষণিক চাপ আরও কিছুটা বেশি। যেমন 'অনাময়ের স্মৃতি' (পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি), 'তার মৃত্যু : নবেন্দুর স্মৃতি' (প্রভু নষ্ট হয়ে যাই)। ব্যক্তিগত শোক টাটকা থাকতে থাকতে রচিত এই কবিতাগুলি — কবিতা হিসাবে তৃতীয় পক্ষ পাঠকের মনে খুব বেশি দাগ কাটবে বলে মনে হয় না। তবে মনে হয়েছে একটি কবিতায় কবির একান্ত নিজের শোকাবেগ ক্রমে তরল থেকে কঠিন হয়ে— স্বচ্ছ স্ফটিক হয়ে উঠেছে। সেই কবিতাটিই কেবল উদ্ধার করি—

এবার চুনকাম হবে, আমার স্মৃতির সব
লুকিয়ে পালাবে, সে তো রক্ষণীয় নয়!
রক্ষণীয় দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে এই বাসায় এসেছি
প্রথমটি চলে গেছে, বলেও যায়নি—
ঠিক কী কারণে কাকে যেতে দিতে হয়!
(যেতে দিতে হয়, মানুষ বড়ো কাঁদছে)

ব্যক্তিগত এলেজিগুলির মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

কিছু ভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য দুটি এলেজি। একটি লিখিত কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য স্মরণে 'কবির মৃত্যু' (ঈশ্বর থাকেন জলে), অন্যটি 'এলেজি : বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি' (পাতাল থেকে ডাকছি)। দুটি কবিতাতেই অগ্রজ কবির প্রতি অনুজ শিল্পীর শ্রদ্ধা ও সম্মান ছাড়াও গভীর একটি আত্মিক বন্ধন অনুভব করা যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নিঃসঙ্গ মৃত্যু দেখে এখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমব্যথী হয়েছেন, সেই উদাস বিষাদে বলেছেন—

ময়দানের ঘাস
গভীর আগুনে যায় উড়ে পুড়ে...
দেখে মনে হয়
কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে।

বুদ্ধদেব বসু-র স্মরণে রচিত কবিতাটিতেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ও প্রয়াত কবির ব্যক্তিত্বের তাপের ঘনিষ্ঠতম পরিচয় পাই — যা সাধারণত থাকে না শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর গৃহে সান্ধ্য আমন্ত্রণ, তরুণ কবিদের আশ্রয় বুদ্ধদেব বসুর ছবিটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। এই কবিতায় প্রকৃতই শ্রুত হয় ব্যথিত কবির আর্তি—

একি অকস্মাৎ যাওয়া ঘর ছেড়ে পরের দুয়ারে
স্বর্গ তো আপন নয়, তোমার নিজস্ব স্বর্গ ছিলো
ছেড়ে গেলে, কিন্তু, কেন গেলে?

প্রসঙ্গত মনে পড়ে— ছন্দে-মিলে রচিত শক্তির প্রথম কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (চৈত্র, ১৩৬২)। সনেটটির নাম 'যম'। কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি ছিল মৃত্যু-দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত।

কিন্তু 'এলেজি' নামে চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্টভাবে মৃত্যুর কবিতা নয় — শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যু জীবনের অঙ্গ, বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত। আবার মৃত্যু জীবনের অবসানও — জীবনের এক ব্যথাচিহ্নিত সত্য। এতই অবশ্যম্ভাবী — যে উদাসী বৈরাগ্যে এবং পরিহাসের সুরে বাজিয়ে তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ও নেই। মৃত্যুর এই চেহারাই সবচেয়ে বেশি তাঁর কবিতায়। মৃত্যু বোঝাতে গিয়ে কবি প্রায়ই পথিক ও যাত্রার চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। জীবন ও মৃত্যুর দুই পারেই গতিবিধি এমন একজন যাত্রী প্রায়ই তাঁর কবিতায় এসে দাঁড়ায়। সে-ই হল তাঁর কবিতায় ডাইনে-বাঁয়ে জীবন-মরণের মন্দিরা বাজিয়ে চলা মানব-সন্তান। এই সুরের বহু কবিতা আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। মৃত্যুকে প্রিয় বলে বা প্রভু বলে বরণ করা যেমন নেই, তেমনই ভীতি ও বিরাগও দেখা যায় না। মানুষ মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। তাই মর্যাদা না হারিয়ে তাকে মেনে নেওয়া— এই মনোভাবের ফলেই যেন উদাসী এক পথিক-বাউলের মূর্তিকে প্রতীক বলে বেছে নেন কবি— পথ-চিত্রকল্প হয়ে ওঠে প্রধান। কবিতা-রচনার প্রথম পর্ব থেকেই এজাতীয় লেখা লিখে আসছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আমরা সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেখব—

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।
(চতুরঙ্গে, হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য)

প্রথম কবিতা-সংকলনের কবিতায় এই সহজ মৃত্যু-কামনা আসলে জীবন সম্পর্কে মুগ্ধতাবোধেরই এক রোমান্টিক উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলেন — 'যাবার আগে এই কথাটি বলে যেন যাই / যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই' — এই গানে যেমনভাবে আছে চলে যাবার কথা — সেভাবেই

যেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বলা— 'বাঁচতে চাই না'। তবু মনে হয়— রবীন্দ্রনাথের রচনাটিতে চরিতার্থতাবোধের সুর প্রধান ; শক্তির লেখায় সুরটি প্রসন্ন ঔদাস্যের।

অনিবার্য মৃত্যু সংসারে বাস্তবের শূন্যতা নিয়েও আসে। কিন্তু সেই শূন্যতার মধ্যেও কবি জীবনের ছন্দটিই দেখেন। 'চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ'-তে আছে এমন কয়েকটি রচনা। যে মানুষ মা, বোন, অপোগণ্ড ভাই বোনদের ভাসিয়ে চলে যায় তার সম্পর্কেও তাঁর বাণী—

মায়ায় ধরেছে যাকে শেষ হল তার রাজ্যপাট।
পলাশে বিরক্ত লোকটা পুড়ে পুড়ে চন্দনের কাঠ।

জীবনের সুখে ও দুঃখে প্রায় একই মায়ার বন্ধন অনুভব করেছেন তিনি। আধুনিক কবিদের মধ্যে এই মনোভঙ্গি খুব সুলভ নয়। প্রাচ্য দর্শনে জীবন ও মৃত্যুকে বহুকাল থেকেই এর সহজ সমদৃষ্টিতে দেখা হয়ে এসেছে। এ যেন তারই উত্তরাধিকার।

জীবন ও মৃত্যুর তোরণ দুই পাশে রেখে মানব-পথিকের অনন্ত চলার দৃশ্য-প্রতীক হয়ে কবিতা জেগে ওঠে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে। কবিতার থীম-এর এই ব্যাপ্তির কারণে বেশ কিছু দীর্ঘ কবিতা লেখেন তিনি। প্রতিটি কবিতারই অন্তরের কথাটি হল জীবনধারার উপলব্ধি।

ভারতীয় বাউলের স্মৃতি এবং ঐতিহ্যও খুব সহজেই ঢুকে পড়ে সেই মানুষটির গড়নে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীর্ঘ কবিতা 'অতিদূর দেবদারু বীথি' (প্রভু নষ্ট হয়ে যাই) থেকে একটি ছোট স্তবক—

জীবনের কাছে আজ মরণের কাঠুরে এসেছে
'কাঠ চাই– 'হলুদ কর্কশ কাঠ–পাইনাজ সেগুন ও শাল–'
গেরস্থের দ্বারে ফেলা যাবতীয় স্মৃতির জঞ্জাল
নেবে ওরা
পরখ করেনি কেউ ঘোড়া।
ব্যবসা-বাণিজ্য দ্যাখেনি সে–
জীবনের কাছে মরণের কাঠুরে এসেছে।

এরকম অজস্র পঙক্তি ও স্তবক ছড়িয়ে আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। যেমন — 'দুদিকের মৃত্যু তাকে টান দেয় — দুদিকেই যাবে' (ধ্বনি, ভাত নেই, পাথর রয়েছে) ; 'মৃত্যুর অমূল চাপ মৃত্যুতেই আছে' (সুখে আছি) ; জন্ম কোনো মৃত্যুকেই পরোয়া করে না' (জন্ম কোনো মৃত্যুকেই, জ্বলন্ত রুমাল) ; 'মৃত্যুর সম্ভাব্য কাঁটা মৃত্যুকে সরিয়ে রাখে দূরে' (ছিন্ন বিচ্ছিন্ন)।

কোনও কোনও সময়ে এমন নিদর্শনও পাই যেখানে কবির এই মৃত্যুভাবনা খানিকটা তত্ত্বকথা হয়েই থেকে গেছে, প্রাণের অনুভবে আলোড়িত হয়ে কবিতা রচিত হয়নি। বিশেষ একটি ভাবনা শিল্পীর মননে জারিত হয়ে উপলব্ধিতে পরিণত হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার পথে অনেক ভাবনাই আবদ্ধ থেকে যায় মাননিকতার স্তরে। শিল্পী তাঁর ভাবনাটিকে অবিরাম প্রকাশ করবার চেষ্টা করে যান। কোনও কোনও সময় এমন হতেই পারে যে ভাবনাটি হৃদয়মূলে প্রবেশ করল না। মাননিকতাকে কাব্যে উপলব্ধির অঙ্গ করে তুলতে চেয়েছেন যে সব কবি তাঁদের সকলেরই হয়েছে এমন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতাকে কেবলই তত্ত্ব-কবিতা বলতে পারি, তার সবগুলিই প্রাণে সমান ঢেউ তোলে না। জীবনানন্দ সহ ত্রিশের কবিদের মধ্যে— সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র লেখায় এমন নিদর্শন দেখা যাবে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতাংশ দেখি—

চলেছে প্রতিদিন এ চলচ্ছবি, জীবন-মৃত্যুর
কাঁধে কাঁধ দিয়ে এই ছোটাছুটি বাহিরে ও ঘরে—
কখন কাহারে মনে পড়ে, তার, যদি মনে পড়ে ?
যেতে হয় কেউ চলে যায়।
যারা পড়ে থাকে,
তাদের সন্ত্রস্ত করে রাখে—
এই যাওয়া, এই চলে যাওয়া।
(চলে যায়, মানুষ বড়ো কাঁদছে)

তত্ত্বকথার অতিরিক্ত কোনও স্মরণীয় বাণী হয়ে উঠেছে এই কবিতা—এমন দাবি সম্ভবত করা চলে না। তবু এই অনতি-সার্থক কবিতাটি অন্তত শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে একটি মিথ ভাঙতে সাহায্য করে— তা হল কবির ভাবনা ও মাননিকতার স্তর তেমন সক্রিয় ছিল না। তিনি শিশুর মতো ভাবতেন — এমনতর কথাও যখন কোনও কোনও আলোচকের কলমে উঠে আসে — তখন এটুকু মনে রাখা ভাল যে তিনি প্রায় তাত্ত্বিকের মতো ভাবতেন আর শিল্পীর মতো লিখতেন।

মরণশীল মানুষকে বাউল-পথিকের চিত্রকল্পে শক্তি চট্টোপাধ্যায় দেখেছেন। তেমন একটি কবিতাংশ—

পিতল কিংবা সোনা
কাছে
যা ছিল তাই আছে
পকেট, তাও যে ফুটো
দুপাশে স্রেফ দুটো
সঙ্গী বলতে সাঁই
যাই।

এখানেও স্পষ্টতই তত্ত্বকথা। কিন্তু শিল্পরূপে সিদ্ধ হয়েছে অনেকখানি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মৃত্যুবোধ সম্পর্কে একটি কথা মনে হয়। জন্মান্তরের কল্পনাটি তাঁর লেখায় দেখি না। হিন্দু ধর্মের অন্যতম একটি ধারক তত্ত্ব হল জন্মান্তরবাদ। ধর্মতত্ত্বের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলা যায় — এই মায়াময় জীবনের মোহন



আকর্ষণে মানুষ বারবার 'শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে' 'মাটি-পৃথিবীর টানে' ফিরে আসবে এই ভুবন-ডাঙায় — এই কল্পনাটি কবির কাছে বড় সুন্দর মনে হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দ দুজনেই ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান হয়েও, হিন্দুর আচরণীয় শাস্ত্রে তাঁদের আস্থা রাখবার কথা না থাকলেও — কেবলই কবি-কল্পনার আয়তন রচনা করবার জন্য জন্মান্তরের প্রসঙ্গ রেখেছেন তাঁদের কবিতায়। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মৃত্যু সম্পর্কিত হিন্দু আচার-আচরণকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলেও পুনর্জন্ম-কল্পনা নেই। পূর্বজ দুই কবির তুলনায় জীবনবিদ্ধতা কিছু কম ছিল কি তাঁর ? হয়ত এমন মনে হতে পারে কোন কোন মুহূর্তে মৃতুকে প্রিয়-উপাস্য রূপে দেখলেও রবীন্দ্রনাথ উদাসী-স্বভাব ছিলেন না আদৌ। জাঁহাবাজ সভ্যতাকে যথেষ্ট ঘৃণা করেও সত্যিই জীবনানন্দ জীবনবিবিক্তি খোঁজেননি। তাই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার ভাবনাটি প্রাণের তাপে লালিত হয়েছে দুই কবিরই চিত্তে। আর, আপাতভাবে সচ্ছল মধ্যবিত্তের জীবনযাপনে জড়িয়ে থাকলেও 'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' — অভিধা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

মৃত্যুর রূপ যখনই কবি নির্মাণ করতে নেমেছেন তখনই দু'ধরনের বহিরাশ্রয় তাঁকে প্রায় সমভাবেই উপাদান জুগিয়েছে। প্রথমটি মৃত্যুকে ঘিরে হিন্দুর আচারসমূহ, দ্বিতীয়টি অন্য ধর্মের সমাধি দেবার রীতি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা অভিনিবেশ সহ দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হবে এই সব আচরণীয় অনুপুঙ্খের কাব্যরূপায়ণে। নদীতীরের শ্মশান, হরিধ্বনি, পেরেক পোঁতা, খই ছড়ানো, শব বহন, মৃতের পায়ের ছাপ তুলে নেওয়া, চিতা-আগুন-কাঠ, চিতা-ধোয়া জল — ইত্যাদির পৌনঃপুনিক প্রয়োগ লক্ষণীয়। পশ্চিম বাংলার এক গ্রামীণ মফঃস্বলে কৈশোর অতিবাহিত করবার অভিজ্ঞতা কিভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় শোষণ করে নিয়েছিলেন তার বহু নিদর্শন আছে তাঁর কবিতায়। মৃত্যু সম্পর্কিত আচারগুলিও সেখান থেকেই পাওয়া। বিশেষভাবে চিতা আর আগুন — এই দুটি প্রতীক তাঁর কবিতায় গাঢ় রক্তিম বর্ণে একাধিক চিত্রকল্প এঁকে দিয়েছে। প্রথম গ্রন্থটি (হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য) থেকেই তার দৃষ্টান্ত পাই। 'কাঠগুলো শ্মশানে পুড়লে চিতা। কবে আমায় পোড়াবে / অমন রুপোলি স্রোতে' (অন্তিম কৌতুক)— এখানে সহজ গদ্যে মৃত্যুবাসনা রোমান্টিক হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাষা ও নিরূপিত ছন্দের শিল্পিত আঙ্গিকে বাঁধা একটি কবিতায়— সহজ সুরে কিন্তু মৃত্যুশূন্যতার উদাস বেদনা-স্পর্শ মিশিয়ে— কবি এঁকেছেন সাগ্নিক শ্মশান-চিতার ছবি— যেখানে আগুনের পাশেই পড়ে থাকে পুঞ্জিত ছাই—

তোমায় কিছু দিয়েছিলাম প্রীতির ছায়াতলে
নীলাঞ্জন, ঝরিয়া গেলে রম্য চিতাপটে...
চমৎকার বারুণী গতি আছো তো সখা ভালো ?
বাতাসে তার চমৎকার ভস্মভার মরীচিকার শূন্য নদীতটে।
(ভ্রান্তি)

এই ধারায় আছে অনেক কবিতা। আরও বেশি উদাহরণে নতুন কিছু প্রমাণিত হবে না । এই মানসপথের শেষ গন্তব্যে পৌঁছেই কবি বলতে পারেন— 'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি আমাকে পোড়াও'। কিন্তু 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' সংকলনে গ্রন্থিত একটি ছোট কবিতায় আপাত-লঘু ছন্দে, মৃত্যুর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্রগাঢ় এক প্রাণ-ভালবাসার আলেখ্য কবি রচনা করেছিলেন। ভাবনা যখন সতেজ বেগে মাননিকতার স্তরগুলি নিমেষে অতিক্রম করে উপলব্ধির অতলতায় চলে যায় তখনই লেখা যায় এমন কবিতা— সম্পূর্ণই উদ্ধার করছি সাত পংক্তির কবিতাটি। জীবন-মৃত্যুর চির-বিবাহের অনন্ত সপ্তপদী। কবিতার নাম 'মৃত্যু'। তবু এই কবিতার মুখ জীবনের দিকে— রোমান্টিকতার অমর্ত্য-অতৃপ্তি নয়, এক পার্থিব-অতৃপ্তিই আছে এই কবিতার উৎসে—

পুড়ছিলো ঐ শ্মশান ভরে কাঠের রাশি
পুড়তে আমি ভালোবাসি, ভালোই বাসি।
পুড়তে আমি চাচ্ছি কোনো নদীর ধারে।

কারণ, একটা সময় আসে, আসতে পারে
যখন আগুন অসহ্য হয় নদীর ধারে।
এবং মড়া চাইতে পারে এক কুষি জল !
মৃত্যু তখন হয় না সফল, হয় না সফল !

শ্মশান-চিতার আগুন প্রতীক রূপে কবিচিত্তের যতটা গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ত ততটাই হতে পারেনি সমাধি-প্রতীকটি। তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কারণে সমাধি কবির কাছে বিশেষ তাৎপর্য পায়। শ্মশানের চিতায় নিঃশেষিত হয়ে ভস্মে পরিণত হয় মর্ত্য-অবশেষের সবটুকু। মানুষ একদিন অস্তিত্ববান ছিল তার অমেয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে— বহির্জগতে কোনও চিহ্ন আর থাকে না এই সত্যটির। কিন্তু সমাধি-ফলকে প্রায়ই উৎকীর্ণ থাকে দু-চারটি বাক্য— কখনও কখনও কবিতা বা কবিতার টুকরো। মৃত্যুর পরেও বর্ণমালা বাহিত হয়ে বেশ কিছু কালের জন্য স্থায়ী হয়ে যায় মানব-বাসনা-লিপি। কবি তাই নিজের জীবনব্যাপী সৃষ্টির সঙ্গে অমোঘ একাত্মতা অনুভব করেন ঐ সমাধি-লিখনের— ঐ এপিটাফ-এর। এপিটাফ — যেন কবির জীবনেরই একটি টুকরো। এপিটাফ-বিহীন সমাধির ছবিও অবশ্য আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। যেমন —

লোকটিকে জানায় এই গাছপালা বাংলোর সমাধি
এখন, কয়েকটি দাঁত খসে গেছে শীতে

বুকের খাঁচায় টান পড়ে আচম্বিতে
পাখি নেই পালক রয়েছে।
(এই পরিশ্রম, ভাত নেই পাথর রয়েছে)

সমাহিত মানুষটি নয়, সমাধি-প্রস্তর এখানে কবিকে (লোকটিকে) যে মৃত্যু-মননিকতা ও জীবনান্তের অনুভূতির দিকে চালিত করেছে— তারই ছবি এই কবিতায়।

কবি কল্পনায় দেখে নিয়েছেন নিজেরও সমাধি। ভেবে নিয়েছেন সেই বহমান জীবনের কথা — যার চলা অবিচ্ছেদ্য থাকবে তাঁর মৃত্যুর পরেও। মধুসূদনের মতো তিনি পথিককে থামতে অনুরোধ করেননি। সহমর্মীও হতে বলেননি কবির মৃত্যুশোকে। তিনি কেবল আধা বেদনা, আধা নিরাসক্তিতে পাঠককে বলে গেছেন কবির সমাধি চিনে রাখার কথা। কোনও স্পর্ধায় নয় কখনই, হয়ত সেই অনির্বাণ জীবনার্তিতে — সত্তার নিমজ্জিত জীবনব্যাকুলতা থেকে যেখানে তিনি পূর্বোদ্ধৃত 'মৃত্যু' কবিতায় চিতাশয্যায় শুয়ে এক কৃষি জল-প্রার্থনার সন্তাব্যতার কথা ভেবেছিলেন। কবিতাটি দেখি—

আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো— অনেকেই চেনে
অনেকে তো পথ দিয়ে যেতে-যেতে পিছনে তাকায়
... ... ...
এদেশে জেনেছে লোকে ওর কোলাহল
ওর মতো ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি....
চেয়েছিলো একদিন হারমোনিয়াম!
ঐখানে পড়ে আছে — চেনো নাকি?

আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো — অনেকেই চেনে!

এর পরে খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজের এপিটাফ লিখতে বসেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। নিজের চোখে নিজেকে দেখা, নিজের মন দিয়ে নিজেকে জানা— সেই সঙ্গে পাঠকের সামনে নিজের কাঙ্ক্ষিত রূপটি তুলে ধরার মর্মছেঁড়া তৃষ্ণা নিয়েই নিজের এপিটাফ লেখেন কবি। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' সংকলনের শেষ কবিতা 'এপিটাফ'—

কিছুকাল সুখভোগ করে হলো মানুষের মতো
মৃত্যু ওর, কবি ছিল, লোকটা কাঙালও ছিল খুব।
... ... ...
অথচ আগুনে পুড়ে গেল লোকটা—
কবি ও কাঙাল!

এপিটাফ-এর পরেই শেষ হতে পারত প্রবন্ধ। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমরা মৃত্যুর চেয়ে জীবনকে বেশি করে পাই। তাঁর মৃত্যুও যেন জীবনরসে অভিসিঞ্চিত। অথচ তিনি পুনর্জন্মের কথা বলেননি। মৃত্যুতে জীবনের অবসান— বলেছেন এই কথাই। মৃত্যুকে তিনি যেন জীবনেরই এক অপরূপ মহার্ঘ প্রান্তিক কারুকাজ বলে জেনেছিলেন। চিতার কাঠে, অগ্নিশিখায়, ভস্মে আর ভস্মধোয়া জলধারায় বহু যত্নে নির্মিত এক নক্‌শা যেন। এতবার মৃত্যুর রূপ ও বর্ণ উদ্ভাসিত করে তুললেও তাই পরিপূর্ণভাবে জীবনেরই কবি তিনি। মৃত্যুকে জানলে তবেই তো জীবনকে জানা। তাই, মনে হয়, 'যেতে পারি...কিন্তু কেন যাবো?' — এ-ই তাঁর যথার্থ অন্তিম উচ্চারণ। এই যাওয়া-না যাওয়ার দ্বন্দ্বটি উক্ত সংকলনের কিছু আগে থেকেই তাঁর মনে জেগেছিল। 'কবিতার তুলো ওড়ে' (১৯৭৭) সংকলনে আছে 'কেন যাবো?' নামের একটি কবিতা— যার শেষ দুই পঙক্তি—

সেই সুখ দুঃখ ছেড়ে চলে যাবো ভুবনে মাটিতে?
কিন্তু কোনভাবে যাবো? কেনই বা যাবো?

'পরশুরামের কুঠার' (১৯৭৮) সংকলনে আছে প্রায় একই সুরের কবিতা 'কেন যাবে?' যেখানে কবিতার উদ্বিষ্ট জন 'আমি'-র বদলে 'তুমি'। কিন্তু এই আমি, তুমি, সে-র মধ্যে তেমন কোনও অন্তর কবিতার রাজ্যে নেই — তা কবি ও পাঠক উভয়েই জানেন। এখানে কবি বলেন—

যা কিছু সঞ্চয় লোভ, গুরুতর জীবন পিপাসা—
তার মধ্যে পড়ে আছে, কী সে যাবে? কোন ভাবে
যাবে?
যেতে গেলে এইসব ছোটখাট ব্যথায় জড়াবে
কেন যাবে? কেন ছেড়ে যাবে?

কাকে বলেন এই কথা? নিজেকেই বলেন হয়ত বা— হয়ত বলেন বিশ্বভুবনকেই। যেমন রবীন্দ্রনাথের শিশু ফুলটি বিশ্বজগৎকে ডেকে বলেছিল 'আমি যতকাল থাকি তুমিও থাকিও'।

শেষ পর্যন্তও মনে হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আবহমান রোমান্টিক কল্পনার যে সবল উত্তরাধিকার প্রবাহিত হয়েছে— মৃত্যুভাবনা সেই কল্পনালোকে যোগ করেছে সত্তার অন্তস্তলের রহস্য আর শঙ্কা জড়ানো এক সুন্দরের হাতছানি—

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে: আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে: আয় আয়

তবু কিন্তু কবি জীবনের দিকেই দুহাত বাড়িয়ে দেন। হৃদয় চিরে ঘোষণা করেন — 'একাকী যাবো না অসময়ে'। কবি নিশ্চয়ই জানতেন শিল্পীর যাওয়া সব সময়েই হয় অসময়ের যাওয়া!

# কেউ নও

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

শূন্যতার সব বোধ আমার সম্পর্কে থেকে গেছে
যেভাবে মানুষ থাকে দেয়ালের উপরে দাঁড়িয়ে
কিছু দেখবে বলে নয়—এমনি, খেলার প্রতি প্রেমে
দেয়ালে দাঁড়ায় আর ছুটোছুটি করে, ভুল করে—
নিজের ছায়াকে ভাবে অন্যকেউ, অন্যবিধ কেউ
শূন্যতার সব বোধ আমার সম্পর্কে থেকে গেছে
এই থাকা, এই সর্বসমর্পণ, এই স্থায়ীভাব
দুঃখের মান প্রাণ স্পর্শ করে, গোলযোগ করে
পৃথিবীকে মনে হয় ভালোবাসা কষ্টসাধ্য নয়
প্রধান রাস্তায় ঘোরে, মানুষের উজ্জ্বল মহিমা
কখনো দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো বা ঘাসে বসে চলে:
তোমার মুখশ্রী কেন এতোদিনে পুরানো হলো না!
তুমি কি মানুষ নও? মানুষের অন্তর্গত নও?
পূর্ণ ও শূন্যের যেন কেউ নও—এতো স্বাভাবিক॥

---

প্রয়াত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক কবিতাই 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৭৯ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'কেউ নও' কবিতাটি এই উপলক্ষে বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।